বাছাই

চর্যাপদ

২০১৩

একটি স্পর্ধা নিয়ে প্রথম পা পড়েছিল আন্তর্জালের জগতে। উদ্দেশ্য - বাংলা ভাষায় মনের ভাবপ্রকাশ। গত দশকের সাহিত্য মোড় বদল করেছে নিজের; লিটল ম্যাগের যুগ ছেড়ে এখন আমরা ব্লগিং এর দুনিয়ায়। এসেছে তাড়া তাড়া বই ছাপিয়ে ঘরের কোণে ফেলে না রেখে সাহিত্যকে আন্তর্জালের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার স্লোগান... সেই শপথ নিয়েই আবির্ভাব 'চর্যাপদ' এর।

তারপর দিন কেটেছে, কেটেছে মাস, এইভাবেই একদিন শেষ হয়ে গেছে পৃথিবী নামক এই গ্রহটির একটি গোটা বার্ষিক গতি। হয়ত সময় হিসেবে খুবই সামান্য, কিন্তু এই স্বল্পকালে প্রত্যেকেই পুরনো হয়ে ওঠে একটি বছরের মত। এই পুরনো হয়ে ওঠার সঙ্গী হিসেবেই জন্ম হয় নতুন দায়বদ্ধতার। সে দায়বদ্ধতা যেমন থাকে প্রবীণকে সম্মান জানানোর, সেই রকমই থাকে নবীনকে বরণ করে নেওয়ার।

এই দায়িত্ব পূর্ণ করার পথে ফেলে আসা প্রথম বছরটিতে কতটা এগোলো কিংবা কি ভাবে এগোলো 'চর্যাপদ', তার এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস থেকেই বেছে নেওয়া হয়েছে তেরোটি বিভিন্ন বিভাগ থেকে মোট পঁয়ত্রিশটি লেখা।

সম্পাদক, চর্যাপদ
৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৩

ছড়া কবিতা

এ আমার সময়	নবকলম	১৫
বাড়িঘর, ট্রেন আর কিছু অদ্ভুত	সৌরভ	১৬
চার আঙুলে রূপকথা	সৈকত ঘোষ	৪৩
বল্কল	অনিমেষ	৪৪
জোছনা	সত্র্যজিত	৬৬

ছড়া

পাগল ভাবলে	নবকলম	৬৭

মুক্তগদ্য

আমি ও ব্যাটম্যান	উত্তরায়ন	৩১
এবং ঋতুপর্ণ	সৈকত ভট্টাচার্য	৩৪
অপূর্ব সে আলো	থাংকমনি	১৪৬
আসুন কষ্টকল্পনা করি	স্পন্দন চক্কোত্তি	১৫০
বারেবারে ভুলে যাই	মুক্তবিহঙ্গ	১৫২
রবীন্দ্রনাথের দাড়ি এবং...	কৌশিক মজুমদার	১৫৮

রম্যরচনা

একটি বিপ্লব প্রচেষ্টার অসময়ে দেহত্যাগ	হস্তিমূর্খ	১৭
বদ ওব্বেস	শঙ্খ	১০২
বিড়ি মাহাত্ম্য	ম্যাক্সিমাস	১৩৩

স্বর্গীয় নরক	প্রত্যয়	৬
বরফের গুলতি, কানিবুড়ি অথবা কতিপয় কল্পনার সারমর্ম	আহমেদ	১২
শঙ্কুমামা ও ফেসবুক	অশোক দেব	৬৮
অক্সিজেন	সত্র্যজিত	৭৭
উপোসী ইশ্বর	কিন্ডল হাতে কলির মানুষ	১০৪
হুতোম	অতনু	১০৬
অবলাকান্তের দপ্তর	উত্তরায়ন	৫০

বাঙ্গালী করেছে ভগবান রে	শাক্যমুনি	৮১
একাত্তর ও শাহবাগের বাংলাদেশ	ঘনাদা	৯৪
কাকাবাবু, সাবা কাব্বানি আর সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ	অতনু	১২১

থার্মোডায়নামিক্স, সিরাজদৌল্লা ও একটি তেরপল	শাক্যমুনি	১৯
পয়লা মে – এক অজানা কাহিনী	ঘনাদা	১৫৫

সুখ কারে কয়	তনুশ্রী	১০০

রূপকুন্ড	প্রোজ্জ্বল	১১২
হরিহরেশ্বর দিব্যাগড়	সন্ধ্যাতারা	১৫৬
অ্যাকিলিস কচ্ছপ ও ইনফিনিটি	অযান্ত্রিক	৪৫
আজব গুজবের রঙ্গিন কথা	অর্ক	১৪৮
‘মানুষের ঘরবাড়ি’ সংক্রান্ত কিছু সংশয়	হস্তিমূর্খ	১০৯
খেলা যাঁদের লড়াই করা	প্রত্যয়	৩৬
সোনাঝুরি	প্রোজ্জ্বল	১৩৬

স্বর্গীয় নরক

প্রত্যয়

নভেম্বর ২৩, ২০১২

গত পরশু রাত্রে আমি মারা গেলাম। এইডস হয়েছিল। বছর তিনেক টিকেছিলাম। তারপর আর শরীর নিতে পারলনা। শুনেছি আজকাল নাকি এমন সব চিকিৎসা বেরিয়েছে যাতে এইডস রুগীকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। আমার আর অত পয়সা কোথায়? তাই অগত্যা... চটজলদি মরতে হল। যাগগে সেসব... আসল ঘটনাটা হল মরার পর।

মুশকো জোয়ান একটা লোক এসে বলল "ভাই, আমার সঙ্গে যেতে হবে। উপর থেকে ডাক এসেছে।" কি আর করি, গেলুম ওর পিছন পিছন। কিছুক্ষণ পর এসে হাজির হলাম একটা বিরাট ফটকের সামনে। উপরে বড় বড় করে লেখা "স্বর্গ"। হেব্বি জাঁকজমক করে সাজানো গেট খানা। এইখেনে ঢোকাবে নাকি আমাকে? অবাক হলাম খুব। আমি নিশ্চিত ছিলাম আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে নরক। সারাজীবন তো পাপ-কাজ করে আর অপরের ক্ষতি করেই কাটিয়েছি। স্বর্গের দেখা পেয়ে তাই অপ্রত্যাশিত একটা আনন্দ হল। মৃদুস্বরে মুশকো লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম "দাদা নরকটা কোন দিকে?" বললে "নরক ফরক সব স্যারের গুপি, ওইরম কিস্যু নেই আসলে"। স্যারটা আবার কেডা? ভাবতেই আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় লোকটা বলল "চল তোমায় স্যারের কাছে নিয়ে যাই।"

গেট দিয়ে ঢুকে একটা বিরাট বড় লবি তে এসে উপস্থিত হলাম। খানদানি হোটেল টোটেলে গেছি অনেকবার, কিন্তু এরকম দেখিনি কোথাও। সে কি বাহার। সোনায় মুড়িয়েই দিয়েছে যেন। লবিটা থেকে এদিক ওদিক অনেকগুলো দরজা বেরিয়েছে। তারই একটা দিয়ে ঢুকে চলতে থাকলাম আমরা। যাওয়ার পথে অপ্সরা ফপ্সরা দেখতে পেলে ভালই লাগত, কিন্তু কোথায় কি। চারিদিক শুনশান। শেষপর্যন্ত এসে হাজির হলাম একটা ঘরের সামনে। ঘরে ঢুকতেই গম্ভীর গলায় কে যেন বলল "সুস্বাগতম!"

.....

জোব্বা পরা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি, পাশ থেকে মুশকো লোকটা কানে কানে বলল "দেখছ কি, স্যার কে প্রণাম কর"। ইনিই কি তাহলে ভগবান? ভাবতে ভাবতে দিলাম একখানা প্রণাম ঠুকে। মাথা তুলতেই শুনি সেই গম্ভীর গলা "হ্যাঁ আমিই।"

"ওহ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার...আমায় এই স্বর্গে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। আমি ভাবতেই পারিনি আমি...মানে কোনওদিন স্বর্গে..."

"ওরে গাধা, মরলে পরে সবাই এইখেনেই আসে, নরক বলে আসলে কিছু নেই। ওটা আমার অপপ্রচার।"

আড় চোখে পাশের লোকটার দিকে চেয়ে দেখি সে মিটিমিটি হাসছে। আমার মাথা টা কেমন ভনভন করছিল। মিনমিন করে বললাম "কিন্তু স্যার..."

"উফফ বড্ড বকিস তো তুই! সব বুঝবি ধীরে ধীরে। অত তাড়া কিসের? আজই তো তোকে ভাজছিনা। তোকে ভাজব সামনের মাসে। আজ যাদের কড়ায় ভাজছি তাদের মধ্যে আছে তোদের পাড়ার সেই হেঁপো বুড়োটা, যে গত মাসে মরেছিল। হিউম্যান মাঞ্চুরিয়ান বানানো হবে আজ। হে হে..."

"কিন্তু স্যার ওসব কড়ায় ভাজা টাজা তো নরকে..."

"আবার!" এক ধমকে আমায় থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন "কতবার করে এক কথা বলতে হবে তোকে? ওইসব প্রচার বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে। নইলে মাঝে মাঝে এত মারদাঙ্গা শুরু করে দিস তোরা পৃথিবীতে। ভয় হয় কোনদিন অ্যাটম বোমা মেরে কেউ গোটা পৃথিবীটাই যদি ধ্বংস করে দেয়। তার ওপর এমনিতেই রোজ এত পাবলিক আসছে, ভেজে শেষ করা চাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই মৃত্যুর রেট বেশি বাড়তে দিলে চলেনা।"

আমার মুখে কথা ফুটছেনা। কিন্তু সেটার বোধহয় দরকার নেই। উনি এমনিই সব বুঝে যাচ্ছেন আমি মনে মনে যা ভাবছি।

"কি ভাবছিস? আমার সম্পর্কে যা যা জানতিস সব ভুল বেরোচ্ছে? হবেই তো। লোককে আগেভাগেই জানতে দিলে চলবে যে আমি শেষমেশ ওদের কড়ায় ভাজব? তাই অনেক প্ল্যান করে এগোতে হয়। মাঝে মাঝে এজেন্ট পাঠাই পৃথিবীতে। ওই যীশু ফিশু...তারপর ওই যে...তোদের মহম্মদ, বুদ্ধ, সব তো এখান থেকেই পাঠানো। ওই ভোটের আগে যেমন তোদের নেতাগুলো মিথ্যা প্রচার করে না? আমরা এত ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি... ওইরকম প্রচার করাটাই উদ্দেশ্য। এজেন্টদের পাখি পড়া করে শিখিয়ে দিই কি বলতে হবে। ওরা সেরকম সেরকম বলে আসে, হিংসা হানাহানি কোরোনা, ভগবানকে ভক্তি কর, তাইলে ভাল হবে। সবই আসলে প্রি-প্ল্যানড।"

আমি বললাম "কিন্তু স্যার সবাই তো আপনাকে হেবি ভক্তি করে। আর লোকে তো বলে আপনি নাকি ভাল লোকেদের স্বর্গে আসতে দেন আর বাজে লোকেদের নরকে পাঠান? এরকম প্রচার করার কি মানে হয়?"

"আরে আসলে আমি দুশ্চরিত্র আর বদমায়েস লোকেদের বেশি ভালবাসি। আমি লোকটা জানিস তো একটু স্যাডিস্ট টাইপের। তাই পৃথিবীতে কেউ কষ্ট পাচ্ছে এইটে দেখতে আমার দারুণ লাগে। তাই তো পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট বানিয়েছি। নইলে আমার এত্ত পাওয়ার, চাইলে কি শুধু সুখময় ধরণী বানাতে পারতাম না? কিন্তু দেখলুম

শুধু হিংসা হানাহানি বাড়িয়ে দিলে এত বেশি লোক মরবে রোজ রোজ যে আমার কড়ায় আর ধরবেনা। আর তাছাড়া হয়তো মনুষ্যজাতিটাই ধ্বংস হয়ে যাবে মারামারি করে। তখন আবার কষ্ট করে মানুষ সৃষ্টি কর রে...অত খাটবে কে? তাই ওইসব স্বর্গ-নরকের থিওরি প্রচার করেছি"।

"আপনি স্যাডিস্ট?" অবাক হয়ে বললাম আমি।

"তা নয়তো কি? এই যেমন ধর পৃথিবীতে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক তৈরি করেছি। বেঁচে থাকতে চাও তো অন্য প্রাণ ধ্বংস কর... এটাই তো জীবজগতের প্রধান মোটো। তোর কখনও মনে হয়নি পরমকল্যাণময় ভগবান এরকম নিয়ম তৈরি করলেন কেন?"

"তা জোয়ান বয়সে মনে হত মাঝে মাঝে। ওই বিবেকানন্দ না কে একটা বলেছিলেন না যে আমি যদি জগত বানাতাম তাহলে এর থেকে ভালভাবে বানাতাম? ওইটে বেশ মনে ধরেছিল। কিন্তু তারপর মা পইপই করে বলল ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। তো সেইটেই মেনে নিলাম। ভাবলাম সত্যিই তো, এর'ম না করলে পৃথিবীতে এত জীবজন্তু হয়ে যেত যে আর ধরতই না। তো..."

"হাঃ হাঃ হাঃ" অট্টহাস্য করে উঠলেন ভদ্রলোক, "সত্যি তোরা পারিসও বটে। ওই কয়েকটা এজেন্টকে দিয়ে তোদের এমন ব্রেনওয়াশ করিয়েছি যে সবকিছুতেই আমার শুভবুদ্ধি দেখিস। মাঝে মাঝে ভাবলে বেশ তৃপ্তি হয় যে ওদের দিয়ে যা যা প্রচার করিয়েছি সেগুলো বেশ ভাল খেটে গেছে। কেবল ওই দুয়েকটা নাস্তিক শ্রেণীর লোক মাঝে মাঝে একটু ভুলভাল বকে লোককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু এখনও অব্দি সেরম কায়দা করতে পারেনি।"

"কিন্তু ধরুন আজ থেকে একশো বছর পর হয়তো বেশিরভাগ লোকই নাস্তিক হবে। তখন?"

"তখন আরেকটা এজেন্ট পাঠাবো, আর কি?" গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসলেন ভগবান।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম কি সাংঘাতিক প্ল্যানই না ফেঁদেছেন ভদ্রলোক। কোথায় লাগে অপপ্রচারকারী রাজনীতিবিদ, ইনি তো সব রাজনীতিবিদের বাপ! কেবল একটা জিনিস খটকা লাগল, যদ্দুর মনে হচ্ছে যে ইনি ইচ্ছে মত প্রতিটি লোকের প্রতিটি পদক্ষেপ কন্ট্রোল করতে পারেন। তাহলে এইসব কূটনীতি করে লোককে প্রভাবিত করে তাদের দিয়ে কিছু করানোর চেয়ে তাদের প্রতিটি অ্যাকশনকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করলেই তো মিটে যেত।

"ওরে ছাগল", আমার মনের কথা ধরে ফেলে উনি বললেন, "সেটা করতে তো আমি পারিই, কিন্তু পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক, সবার পিছনে অত এফর্ট দেব কোন দুঃখে, আমার কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, সারাদিন এই সবই করব? সারাদিন ফুর্তি করি, আমার কিছু অপ্সরা আছে তাদের সাথে সেক্স টেক্স করি, উঁহু উঁহু! উত্তেজিত

হোসনা, তোর কপালে ওসব জুটবেনা, ওগুলো আমার এক্সক্লুসিভ। মাঝে মাঝে তোরা যেমন ফিল্ম দেখিস, আমি সের'ম অবসর সময়ে বসি পৃথিবী অবসার্ভ করতে। একেকদিন একেকটা রিজিয়ন দেখি। একসাথে ৩-৪টের বেশি লোকের উপর কন্সেন্ট্রেট করিনা, বড্ড স্ট্রেস হয়ে যায়। একেকটা লোককে কিছুক্ষণ ফলো করে দেখি সে ব্যাটা আমায় কত ভক্তি করছে, ভক্তি করতে দেখলে হেব্বি মজা লাগে বোকাগুলোর পাঁঠামো দেখে। আর যদি এদের মধ্যে কেউ বদ লোক বেরিয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই, বদমায়েসি আর অন্য লোকের ক্ষতি করা দেখতে কি যে মজা লাগে!"

"আমার কেন জানি খটকা লাগছে...আপনি সত্যিই এরম স্যাডিস্ট সেটা মেনে নেওয়া..."

"হ্যাঁ প্রথম প্রথম ওরম মনে তো হবেই, ছোট থেকে পাখি-পড়া করে সবাই শিখিয়েছে, তার একটা এফেক্ট তো থাকবেই। অন্ধের মত ওদের কথা না মেনে কোনদিন যদি নিজে একটু ঘিলুটাকে ব্যবহার করে দেখতিস, তাহলে এই সম্ভাবনার কথা মাথায় ঠিকই আসত। পৃথিবীতে এত বদ লোক, এত নির্যাতন, এত ধর্ষণ, শিশুদের ওপর অত্যাচার, সব দেখেও তোরা তবু চোখ বন্ধ করে ভেবেই যাস 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য'। তোদের এই ছাগলপনা গুলো দেখতে দারুণ লাগে।"

"কিন্তু পৃথিবীতে তো কত সুখও আছে, কত আনন্দও আছে, কত সুন্দর সুন্দর..."

"এটা তো মহা এঁড়ে তর্ক করে কিছু না বুঝে! ওরে পাগলা, সুখ কি এমনি এমনি দিয়েছি? দেখ তুই কাউকে যদি সারাক্ষণই দুঃখে রাখিস সে ধীরে ধীরে সেটাতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে, কয়েকদিন পর আর ততটা খারাপ লাগবেনা তার। কিন্তু মাঝে মাঝে সুখের ঝিলিক দিয়ে আশা দেখিয়ে তারপর দুঃখ দিলে? ওহ! পুরো জমে ক্ষীর!" আনন্দে হাতে হাত ঘষতে লাগলেন ভগবান।

আমি ক্যাবলার মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম।

"যাগগে তুই এবার ভাগ। আরও অন্য লোকেরা আসছে এখানে, তাদের সাথে একটু বাতচিত করি, তোর সাথেই সারাদিন বকব নাকি? সবার সাথে আমি কথা বলিনা, যে লোকগুলো জীবৎকালে চরম হারামিগিরি করে আমার মনোরঞ্জন করেছে শুধু তাদের সাথেই কথা বলি।"

"এক মিনিট স্যার...আরেকটা প্রশ্ন ছিল..."

"আর কোনও প্রশ্ন নয়, স্যার তোমায় নিয়ে যেতে বলেছেন। এস আমার সাথে" হাঁক পাড়ল যমদূতমার্কা চেহারার লোকটা।
অগত্যা গুটি গুটি পায় বেরিয়ে আসতে হল ঘরটা থেকে।

.....

আমার জেলখানার মত খুদে ঘরটায় নিয়ে যাওয়ার পথেই পড়েছিল ওই রান্নাঘরটা। মা গো! কি বিশ্রীভাবে 'জ্যান্ত' ভাজছে মানুষগুলোকে! আর সবাই বাঁচাও বাঁচাও করে চীৎকার করছে। দেখেই কেমন একটা গা গুলোচ্ছিল। আমি একবার ফিসফিসিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলাম লোকটাকে – "আর তো কদিন পর ভাজবেই আমায়, তার আগে একবারটি ওই অপ্সরাদের সঙ্গে..." শুনেই এমন কড়া দৃষ্টিতে তাকালো আমি চুপ মেরে গেলাম। আবার গিয়ে যদি ভগবানের কাছে লাগিয়ে দেয় তাহলে না জানি আরও কি নৃশংসভাবে মারবে।

যে ঘরটায় আমায় রেখেছে সেটায় প্রায় কিছুই নেই, তাই কিছুই করার নেই বসে বসে ভাবা ছাড়া। সারাদিন বসে বসে ভাবছিলাম ভগবানের এই কুটিল স্যাডিস্টিক চরিত্রের কথা। সত্যি, স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি লোকটা এর'ম হতে পারে! ভাবতে ভাবতে রাগ হতে লাগল। শালা আমি বেঁচে থাকাকালীন যা যা করেছি সেই দেখে তো খুবই মজা লুটেছে, সেই আনন্দটা দু হাত ভরে নিয়েছে, এখন আমার কপালে জুটবে কড়ায় ভাজা ভাজা হওয়া। যত ভাবতে লাগলাম তত মনে হতে লাগল কিছু একটা করতেই হবে লোকটার বিরুদ্ধে। যতই ক্ষমতাশালী হোক, আমিও শয়তানিতে কম যাইনা সেটা দেখিয়ে দেব।ভেবেই মনে হল, এই রে, আমার মনের কথা সব বুঝে নিচ্ছেনা তো। তারপর এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে মালটা যেরকম অলস, আমার পিছনে এত এফর্ট দেবেনা। এখন নিশ্চয়ই অন্য কোন কুকীর্তিতে ব্যস্ত।

সারা রাত জেগে একটা চিঠি লিখে ফেললাম। ভগবানের সব কুকীর্তির কথা ডিটেলস-এ লিখেছি তাতে। অনেক হয়েছে, এবারে পৃথিবীর মানুষের জানা উচিত লোকটা আসলে কি। আমার ঘরে আসার সময়ই দেখেছি এখানে একটা ভ্যান আছে যেটায় করে রোববার রোববার পৃথিবীতে কিসব জিনিসপত্র ডেলিভারি যায়। সেটার মধ্যে ফেলে দেব কোনো এক ফাঁকে। ইংরেজিতে লেখা চিঠি, পৃথিবীর কারো হাতে পড়লে আশা করি আশেপাশে কেউ না কেউ বুঝে নেবে। একবার চিঠির মেসেজটা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, তারপর দেখছি ছাগলদাড়িওলা লোকটা কি করে!

.....

এক সপ্তাহ পর আমার ডাক পড়ল ভগবানের ঘর থেকে। নিশ্চয়ই আমার চিঠির ফল। খুশি খুশি মনেই গেলাম, নিজে চোখে দেখেছি ভ্যানটা আমার চিঠি সমেত পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। যা হওয়ার নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, আর ভগবান রাগে আগুন তেলে বেগুন হয়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। আমায় নিয়ে এখন যা করার করুক, আমি আর কিছুতে ডরাইনা।

ঘরে ঢোকার সাথে সাথে গম্ভীর গলায় অভ্যর্থনা করলেন আগের দিনের মতই। তারপর মুচকি হেসে বললেন "আয় বোস...একটা ফিলিম দেখছি, সেইটে তোকেও দেখাব বলে নিয়ে এলাম।" তাকিয়ে দেখি দেওয়ালে ঠিক একদম সিনেমার মতই কিসব দেখা যাচ্ছে। আগের দিনের আলোচনা থেকে আন্দাজ করলাম যে এটা পৃথিবীর কোন অঞ্চলের উপর ফোকাস করেছেন ভগবান। একটা রিমোট দিয়ে একটু জুম করলেন উনি। তাইতে দৃশ্যটা স্পষ্ট হল। একটা জনসমাগম। একজন লোক বক্তৃতা দিচ্ছে। আরেব্বাস! বাংলা ভাষা বলেই তো মনে হচ্ছে। লোকটা

বলছে... আরে, ওর হাতে ওটা কি? আমার লেখা সেই চিঠিটাই না? বেশ রোমাঞ্চ হতে লাগল। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম কি বলছে লোকটা...

"...এই যে চিঠি টা দেখছেন, এটাই সেই চিঠি। এটায় কি লেখা আছে সে তো এতক্ষণ বললাম। কিন্তু বন্ধুগণ, আমাদের বুঝতে হবে এই ষড়যন্ত্রের আসল স্বরূপটা। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এ আমার কোন নাস্তিক বন্ধুর লেখা। কিন্তু সেই সম্ভাবনা খুব একটা বাস্তবসম্মত নয়। প্রথমত চিঠিটা আমি ঘুম থেকে উঠে মাথার পাশে পেয়েছি, সেখানে রেখে যাওয়া কারও পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। আর তাছাড়া যে কাগজের উপর লেখা সেটাও বেশ অদ্ভুত। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কে দিয়ে আমরা পরীক্ষা করিয়েছি, তাঁরা সকলেই বলেছেন এটা এমন কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি যার হদিস বিজ্ঞানীরা এখনও পাননি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা, একটা অলৌকিকত্ব আছে চিঠিটার মধ্যে। এখন প্রশ্ন হল এরকম অলৌকিক কোন চরিত্র আছে যে ভগবানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবে? একটাই নাম মাথায় আসে...শয়তান! হ্যাঁ বন্ধুরা! এ শয়তানের কাজ। আমার ধারণা এটা শয়তানের একটা চাল। যে ব্যাক্তি চিঠিটা লিখেছেন তাঁকে আসলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নরকে। সেখানে তাঁর সাথে দেখা করে শয়তান স্বয়ং নিজেকে ভগবান বলে দাবি করে ভগবান সম্পর্কে এইসব জঘন্য কথা বলেছেন। এছাড়া আর কোনও বিশ্বাসযোগ্য সমাধান নেই এই চিঠির। সুতরাং আসুন, আমরা সবাই মিলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি! দিকে দিকে প্রচার করি এই নারকীয় ষড়যন্ত্রের কথা! যাতে আর কোনও ব্যক্তি ভবিষ্যতে এই ধরনের মিথ্যাচারের শিকার না হন। আসুন আমরা সবাই মিলে....."

আর কিছু কানে ঢুকছেনা আমার। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম ভগবান মৃদু হেসে আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন।

বরফের গুলতি, কানি বুড়ি অথবা কতিপয় কল্পনার সারমর্ম

আহমেদ

ফেব্রুয়ারী ১১, ২০১৩

আজ সন্ধ্যেবেলা থেকেই শরীরটা একদম বেঁকে বসে আছে, ঠিক সেরকম, যেমন মাঝে মাঝে তোমাকে আদর করার সময় বাঁকিয়ে নিতাম তোমার নিপুণ শরীরটিকে, আদরের ভঙ্গিমা পরিবর্তনের প্রয়োজনহেতু। আজ সেই সন্ধ্যেবেলা থেকে আমার শরীরও একইভাবে বেঁকে সেঁটে আছে বিছানায়, হয়তো ইচ্ছে করলেই খানিকটা সোজা হয়ে নিতে পারবো, কিন্তু তারপরও সোজা হতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে ক্ষুধাহীন, প্রকৃতির কোন ডাকে সাড়াহীন যদি এইভাবে অথর্ব হয়ে পড়ে থাকা যায় তাহলে বেশ হয়। কিন্তু সব তো আর আমার ইচ্ছে মতো হবেনা সুহাসিনী, খানিক বাদেই হয়তো মূত্রথলি ভারী হয়ে যাবে, টয়লেটে গিয়ে অনন্ত ঝরনা ঝরিয়ে তবেই না খালাস হওয়া যাবে, কিংবা কিছুক্ষণ পরেই হয়তো দু-চোয়াল চুলকাতে শুরু করবে সিগারেট ফুঁকার তৃষ্ণায়, কিছুই মনের মত হয়না আমার, যেমনটি তুমি হওনি আমার ক্ষেত্রে।

জানালা দিয়ে তাকালাম, বাইরে খুব তুষারপাত হচ্ছে, খোলা মাঠে ৪-৫ টা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বরফের গুলতি বানিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে মারছে, তুমি পাশে থাকলে এখন নিশ্চয়ই আমার সাথে অনেকক্ষণ বক্‌বক্‌ করতে, বলতে ছেলেমেয়েগুলির দুষ্টুমির কথা আর ঠোঁট বাঁকা করে নালিশ জানাতে ছেলেমেয়েগুলির বাবা-মার উদ্দেশ্যে। জানো, বেশ লাগতো ওইসব দিনগুলিতে আমার, আমি জানতাম তোমার এইসব বলার উদ্দেশ্য কি, জানতাম একটু বাদেই খুব পরিপাটি করে চুল আঁচড়াবে, ঠোঁটে খুব যত্ন করে লিপস্টিক ঘষবে আর সারা শরীরে মাখবে পুরো পৃথিবী ভুলে তোমাতে ডুবে থাকা যায় এমন জাদুমাখা এক সুগন্ধি, এইসব কোন কিছুই অজানা ছিল না আমার। আর ভাল লাগতো তোমার কপট রাগ, নাহ রাগ করলে কখনোই তোমার চেহারা লাল হয়ে যেতোনা, কেননা রাগ করলে চেহারা লাল হওয়ার জন্য গায়ের রঙ যতটুকু সাদা হতে হয় তার ধারের কাছেও ছিল না তোমার গায়ের রঙ। তোমার গায়ের রঙ ছিল অনেকটা কালোই বটে, অনেকে আদর করে যেটাকে বলে "উজ্জল শ্যামবর্ণ"। রাগ করলে তোমাকে অনেকটা অসহায়ই লাগতো আর পাতলা ঠোঁটগুলো কাঁপতে থাকতো হাওয়ার সাথে। তখন তোমাকে বেশ লাগতো দেখতে এবং আমার এইসব ভাল লাগা গুলো তুমি জানতে, আর জানতে বলেই আমাকে দিনে-রাতে অনেকবার তোমার এই কপট রাগ ভাঙাতে নানা ভঙ্গিমায় আদরের কৌশল আবিষ্কার করতে হতো।

আবার ইচ্ছে হচ্ছে জানালা দিয়ে চোখ গলিয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখে নিতে। ইশ্‌, ছেলেমেয়েগুলো এখনও আগের মতোই বরফের গুলতি বানিয়ে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। এরা আর কতক্ষণ এইভাবে বরফ ছুড়াছুড়ি খেলবে ভেবে কূল পেলাম না। এখনও তুষার পড়ছে, সাদা সাদা রঙয়ের ফোঁটা যেন ওইদূর আকাশ থেকে কেউ একজন অবিরত ছুঁড়ে দিচ্ছে এই দিগন্তের দিকে। আহা, তুষার কণাগুলো যদি আরেকটুকু বড় হয়ে ঠিক বরফের গুলতিগুলোর সমান হয়েই উপর থেকে ঝরে পড়তো, তাহলে বেশ হতো, শুধু শুধু বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে আর

কষ্ট করে এমন ঠাণ্ডায় হিম হয়ে বরফের গুলতি বানাতে হতো না। আমরাও ছোট বেলায় এমন একটা খেলা খেলতাম, কিন্তু তা এমন হিম তুষার কণাকে গুলতি বানিয়ে নয়, আমাদের দেশে তো তুষারের প্রশ্নই আসেনা, বর্ষাকাল শেষ হওয়ার কালে যখন পানি একেবারে যাবো যাবো শুরু করতো, মানে খেতের মধ্যে পানির গভীরতা প্রায় দু-এক হাতে নেমে আসতো তখন আমরা ন্যাংটো হয়ে সেই পানিতে নেমে খেতের তলা থেকে খামচিয়ে কাদা তুলতাম, তারপর দুই হাত দিয়ে কৌশল করে সেই কাদার গুলতি বানাতাম, এবার ছুঁড়ে মারো একজন আরেকজনের দিকে। কাদার গুলতি কারো চোখে মারা বারণ ছিল, গ্রামের কানি বুড়ি বলতো কাদার গুলতি চোখের মণিতে লাগলে নাকি চোখ কানা হয়ে যাবে। আমাদের মাঝে ছিল কানা হওয়ার ভয়, কেননা কানা ছেলেকে নাকি কোন মেয়ে বিয়ে করতে চায় না। আমার ছিল ভারী বিয়ের শখ, তাই পারতপক্ষে কেউ জোরাজোরি না করলে আমি ওই কানা হওয়ার কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি খেলতে যেতাম না। তারপরও অন্য সব ছেলেমেয়েরা যখন চলে যেতো, আমার তখন খুব একা বোধ হতো, কান্না পেতো, ছুটে যেতাম আমাদের বাড়ির উত্তরের বাড়ির কানি বুড়ির কাছে, খুব মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করতাম দিদা সত্যিই কানা হয়ে গেলে কেউ বিয়ে করতে পারেনা? কানি বুড়ি আমার কাতর দশা বুঝতো, তাই আমার ভয় দিতো আরো বাড়িয়ে। আমিও কম যেতাম না, বলতাম, বা রে দিদা, তোমারও তো এক চোখ কানা, তোমার বিয়ে হল কিভাবে? বুড়িটাও ছিল হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, সেও ফোড়ন কেটে বলতো - আমি তো মেয়ে মানুষ, আমার তো বিয়ে হবেই, আরে মেয়ে মানুষ যে মায়ের জাত! খুব কান্না পেতো কাদার গুলতি খেলতে না যাওয়ার জন্য, মনটা হু-হু করতো আর বুড়িকে মনে মনে দিতাম গাল। তোমাকে এইসব গল্প বলেছি অনেকবার, শুনে তুমিও অনেকবার আমাকে খেপিয়েছ, আবার মাঝে মাঝে বায়না ধরেছ বর্ষাকালে আমার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আমার সাথে কাদার গুলতি খেলার। তখন দাবার চাল্ টা আমার হাতেই চলে আসতো বেশ, আমিও ওই কানি বুড়ির মতই অনুরূপ ফোড়ন কেটে বলতাম, বা রে খেতের মাঝে এই দুই আঙ্গুল সমান একেকটা জোঁক, তোমার ওখান্টা যে নরম! একটা জোঁক ওখান দিয়েই ঢুকে যাবে নির্ঘাত। এইসব শুনে তোমার চোখ ভয়ে ভরে উঠতো, বেশ চিন্তিত মনে হতো তোমাকে, তারপর উদোম হয়ে আমার বুকে বুক পেতে তবেই না তোমার ভয় দূর হতো।

বেশ সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়েছে, সিগারেট নিয়ে কি বারান্দায় যাবো? নাহ! বাঁকা হয়ে থাকা শরীরটাকে আর জাগাতে ইচ্ছে করছে না, এটা এইভাবেই অথর্ব হয়ে পড়ে থাক। তুমি তো জানো সবকিছুই আমার সাথে প্রতারণা করে, যেমন করছে এই শরীর, একটুকু যে নিজের মত করে থাকবো সেই সামর্থ্যটুকুও নেই। যেমন সামর্থ্য ছিলনা তুমি যেদিন তোমার পাহাড়ের মত বন্ধুটার হাত ধরে, সব কিছু গুছিয়ে রেখে চলে গেলে। হ্যাঁ, ওইদিনও আমি এমন অথর্বের মতই পড়ে ছিলাম। জানো, কিছুদিন আগে বাংলাদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি সেমিনারে গিয়েছিলাম, দেখা হল একটি মেয়ের সাথে, ঠিক তোমারই মত অনেকটা, কথাবার্তা হল, বেশ কিছু দিনে ঘনিষ্ঠতাও হল, তারপর যা হওয়ার তাই হল, অনেকদিন পরে আবার কাউকে আদর করতে হল, কিন্তু উঁহু! কিছুতে নিজেকে ঠিক করতে পারছিলাম না, তখন আলো নিভিয়ে দিলাম, আর আমার সমগ্র কিছু জেগে উঠলো, মনে হল এটা আসলে তুমিই বটে! তুমিতো আমাকে জানোই তারপর যা হওয়ার তাই হল, ঠিক যেমনটি তোমার সাথে হতো। আচ্ছা, ওই পাহাড়ের মত লোকটার সাথে যখন তুমি শুতে যাও তখন তোমারও কি এমনই হয়, তুমিও কি বাতি

নিভিয়ে দাও? অন্তরের অন্তরে আমাকেই কল্পনা কর? নাকি তুমি শুধু শুয়েই থাকো একদম শব্দহীন,পাথরের মত। একটু কি পান করবো? ভেবোনা আমি মাতাল হবো, ক্ষুধার্ত রবাহূতের মতো আমি জেগে থাকবো, আর পশ্চিম থেকে পুব আকাশে তল্লাশি চালিয়ে যাবো, দেখবো আমাকে চাঁদ ভেবে তুমি অন্য কারো সাথে উলঙ্গ সঙ্গমে মেতেছ কিনা!

এখনো জানালা দিয়ে বেশ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে ছেলেমেয়েগুলোকে, এইসব ছেলেমেয়েগুলো আজ মনে হয় আর ঘরে ফিরবে না, সারারাত তুষারের কণা দিয়ে গুলতি বানাবে, আর একে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে দেবে। আচ্ছা, এদের কি আমার মত কোন কানি দিদা বুড়ী নেই, যে এদের মিথ্যে মিথ্যে বলতে পারতো - বরফের গুলতি চোখে লাগলে চোখ কানা হয়ে যাবে আর কানা লোক কখনো বিয়ে করতে পারেনা!

এ আমার সময়

নবকলম

ফেব্রুয়ারী ১৯, ২০১৩

ভালোবাসার, ভালো লাগার জায়গাটুকু ছেড়ে
বাকিটা ক্রপ করে বাদ দিয়ে বেশ আছি।
স্মৃতির পুরনো ফ্রেমও বাড়তি ধুলো ঝেড়ে ফেলে
আজ বোঝাহীন।
নির্ভার মন ঝাঁপ ফেলে বন্ধ করেছে সব বোঝাবুঝির দোকান,
গুটিয়ে নিয়েছে তার সুন্দর পুরুষ্টু ডানা।
ইতিউতি খোঁজাখুঁজির পালা যতো, সাঙ্গ হয়ে
এখন শুধু সুটকেসের ডালা খোলা-বন্ধের শব্দ শোনা যায়।
ঘড়ি না বলুক, জানি এ সময় আমার,
এ সময় 'খুব একা'-র, গুছিয়ে নেবার;
ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেটুকু ছিল বা পড়ে,
উঠিয়ে নিয়ে গাঁটরিতে বেঁধে বিদায়।।

বাড়িঘর, ট্রেন আর কিছু অদ্ভুত

সৌরভ

জুন ২৪, ২০১৩

আমার বাড়ির ঠিক পাশ দিয়েই
আশ্চর্য এক রেললাইন চলে গেছে,
যার লাইনগুলো চলমান, আর ট্রেনগুলো -
আপেক্ষিকতা বোঝানোর দায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

তবুও কি আমায় তুমি অসাধারণ বলে ভাববে না?
এই যে অদ্ভুত কিছু কবিতা লিখছি, নিঃস্পৃহ জীবন কাটাচ্ছি,
আরও কতো কি করেও আসলে কিছুই করছি না।

অবাক হবে জানো
এই জীবনেরও কারোর কারোর কাছে
প্রচণ্ড দাম আছে,
তারা এমনই এক জীবনের কথা
পিরিয়ডিক টেবিলের মতো দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে,
বারবার ভুলে যাওয়ার মুহূর্তে আড়চোখে দেখে নেয়।

লোকাল ট্রেনে অফিসফেরত ভিড় যখন তাস খেলে, বাদাম চেবায়,
তখন মনে হয়
মানুষ বাড়ি নামে নিজেদেরই
তৃতীয় এক প্রজাতি তৈরি করে গেছে।

একটি বিপ্লব প্রচেষ্টার অসময়ে দেহত্যাগ

হস্তিমূর্খ

এপ্রিল ৬, ২০১৩

দরকার পড়ল সে বছর স্কুলে গরমের ছুটি শেষ হতে। ছুটির মধ্যে বাসা বদল হয়েছে। এতদিন স্কুলে যেতাম হেঁটে, এবার উঠতে শুরু করলাম ছয় চাকায় আরও অনেক বন্ধুর সঙ্গে। গত শতাব্দীর আশির দশকের প্রথমভাগে সরকার যে শুধু দরিদ্র ছিল তা নয়, অমানবিকও ছিল। কম ভাড়ার বেসরকারি বাস চোখে পড়তে পড়তে স্কুল অর্ধেক গড়িয়ে যেত। অতএব, সকাল বেলা বাবা হাতে গুঁজে দেন চল্লিশ পয়সা, সরকারি বাসের ভাড়া আর বেলা সাড়ে দশটা-এগারটা নাগাদ বাড়ি ফিরি মায়ের সাথে বেসরকারি বাসের ছাত্র কুপনে। কুপন ছিল পনের পয়সার, আসল ভাড়ার চেয়ে দশ পয়সা কম। সারা মাসের কুপন একসাথে কিনতে হত বাস সিন্ডিকেটের অফিস থেকে। আগেই বলেছি সরকারি বাসের ভাড়াটা বেশি ছিল ফলে অন্তত বাসের ভাড়াটা না দেওয়া পর্যন্ত পকেট বেশ ভারী থাকত। দেওয়া হয়ে গেলে অবশ্যই কপর্দকহীন। বাকি স্কুল থেকে পাওয়া টিফিনের খরচা বাবদ প্রতিমাসে তিন টাকা, পরীক্ষার মাসে একটু বেশি, সেটা মা বা বাবা কেউ একজন স্কুলে জমা করে দিতেন। এখনকার মত বিনামূল্যে কোনও পরিষেবাই সেকালে পাওয়া যেত না।

কথায় কথায় অন্য দিকে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসি মূল বিষয়ে। সেই সময় অর্থাৎ সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার কোনও আর্থিক সম্বল ছিল না বাসভাড়ার ওই দৈনিক চল্লিশ পয়সা ছাড়া। তাও বা কতক্ষণ? ওই যতক্ষণ না টিকিট কাটা হয় ততক্ষণ। বড্ড অপমানজনক ছিল সেই সব দিন। কুলের আচার, আইসক্রিম, ম্যাজিক ছবি এই জাতীয় আরও নানা দেবভোগ্যপণ্য সবই অধরা। কাঁহাতক আর অন্যের কাছে হাত পাতা যায়। আর রোজ হাত পাতলে সবাই হাত উল্টায়, সে এমনকি নিজের মা-বাবা হলেও। এই সত্যটা আমি ওই বয়সেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আর আমার মায়ের ছিল অমোঘ যুক্তি – 'এসবের কোনও দরকার নেই'। তর্কে পেরে না উঠলে এই সব কুযুক্তির অবতারনা সবাই করে থাকে। দরকার-অদরকার এগুলি যে ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য, সেটা আর কে কাকে বোঝাবে? যাই হোক আমি নিঃসম্বল, আমাকে মেনে নিতেই হত। 'ক্যা করে বাবু, গরিব আদমি হ্যায়'।

এর মধ্যেই একটা রুপোলী রেখা দেখা গেল। ওই সরকারি বাসেই দেখা গেল। সরকারি ডিউটি একদম সময় মেনে। অতএব, আমাদের চোখে পড়ল বাসে রোজ একই ভদ্রলোক আমাদের টিকিট কাটেন। ধীরে ধীরে তিনি কাকু-তে পরিণত হলেন। তারপরেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের এক বিচিত্র আবদারের সম্মুখীন হতে শুরু করতেন – 'কাকু আজ টিকিট কাটব না'। কন্ডাকটর কাকুও বোধ হয় ছোটবেলায় আমাদের মতই পরনির্ভরশীল ছিলেন, দুঃখটা বুঝতেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের সবাইকেই তিনি টিকিট না কাটার সুযোগ দিতেন। কখনও যদি ওনার জায়গায় অন্য কাউকে দেখতাম তাহলে আমাদের বেশ কষ্ট হত। কতটা ওনার কথা ভেবে আর কতটা

নিজের কথা ভেবে সেটা আর আজ মনে নেই। তবে এই ঘটনা প্রায় ঘটত না বললেই চলে। আমি প্রায় আড়াই বছর যাতায়াত করেছি কিন্তু অধিকাংশ সময় ওনাকেই পেয়েছি।

প্রথম যেদিন আমার টিকিট না-কাটার আবেদন মঞ্জুর হল সেদিন আমি পড়লাম অন্য এক ফাঁপরে। শুধু খেয়ে চল্লিশ পয়সা শেষ করার ক্ষমতা আমার ছিল না। কত খাবো? কাঠি দেওয়া বরফ আইসক্রিম পাঁচ পয়সা, কুলের আচার খুব বেশি হলে দশ পয়সার খাওয়া চলে, কারণ পেট খারাপ হলেই তো আবার যত আপত্তিই থাক না কেন জিভে যুধিষ্ঠির ভর করতে বাধ্য। পুরো পয়সার ভগ্নাংশ আমার কাছে অবশিষ্ট এটা বলা আমার পক্ষে কঠিন ছিল, আবার এমন কোনও জিনিস কেনা চলে না যার অস্তিত্ব মায়ের চোখে পড়ে। কারণ এই দুটি ঘটনার যে কোন একটি ঘটিয়ে ফেলার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সারাদিন ধরে একবার মায়ের কাছে আবার সন্ধ্যেবেলায় বাবার কাছে তাঁদের একটিমাত্র পুত্রের অসময়ে লায়েক হয়ে ওঠার চর্বিতচর্বন শোনার আগ্রহ আমার একেবারেই ছিল না তা বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব আমি দ্বিতীয় দিন আর বাসের ভাড়া পেলাম না। আগের দিনেরটা দিয়েই চালাতে হল। মানুষের বয়স বাড়ে, বুদ্ধিও একইসঙ্গে। ফলে একটা এইরকম রফায় আসা গেল, যারা টিকিটের পয়সা বাঁচাতে পারবে তারা অন্যদের খাওয়াবে। এতে একটা স্বাধীনতাবোধও জেগে ওঠে আর নিজের শখও পূরণ হয়। এই ব্যবস্থাটা বেশ কিছুদিন চলার পর আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে সেই সময় আমার মধ্যে একদিন আকস্মিক ভাবে খানিকক্ষণের জন্য বিপ্লবী চেতনা জেগে উঠল। আমি খেয়ে এবং খাইয়ে খরচ করলাম পনের পয়সা, বাকি পঁচিশ পয়সা কাজে লাগালাম একটা ছোট প্লাস্টিকের বন্দুক কিনে। বন্দুক ছোট্ট, ব্যাগের এক কোণে পড়ে থাকবে কারও চোখে পড়বে না। আর বাড়িতে ওটার কোনও দরকারও নেই, শুধু স্কুলে টিফিনের সময়তেই দরকার পড়বে। খালি বাড়িতে ব্যাগটাকে একটু চোখে চোখে রাখতে হবে। কিন্তু সে দিনের জন্য অন্তত আমার ব্যাগটাকে চোখে চোখে রাখার দরকার পড়ল না। আমার এক বন্ধু একদিনের জন্য বন্দুকটা চেয়ে তার বাড়িতে নিয়ে গেল, আমিও নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে স্কুলে গিয়ে বসেছি, এমন সময় আমার কাছে এলেন সেই বন্ধুটির বাবা। সটান প্রশ্ন –'তোমার কাছ থেকে কি কাল ও একটা বন্দুক নিয়ে গিয়েছিল?' গলা শুকিয়ে এল আমার। কাকু আমার মাকে চেনেন শুধু না, ছুটির পর মায়ের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আঠেরো আনা। কারন উনিই আসেন ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে। যথাসম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রেখে স্বীকার করতেই উনি জিজ্ঞেস করলেন – 'ওটার দাম কত ছিল?'। ঢোঁক গিলে দাম জানালাম। ভদ্রলোক পকেট থেকে পঁচিশ পয়সা বের করে আমায় বললেন –'এটা রাখো। ওটা হারিয়ে গেছে। তুমি আরেকটা কিনে নিও।' আমার মনে হল আমি আর বেঞ্চে বসে নেই, যেন সিলিং-এ ঝুলছি। উফফ্, বন্দুকটা নেই! কোনও দিন মা আর আমার ব্যাগে খুঁজে পাবে না!! পয়সা নেওয়ার আমার কোনও ইচ্ছেই ছিল না, জিনিসটা যে নেই, ওটা যে আমার ওপর আর কোনও চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না, এটাই আমার তখন সবচেয়ে বড় শান্তি। কিন্তু আমার সেই আন্তরিক অনিচ্ছে ভদ্রলোকের বিনয় বলে ধরে নিলেন এবং আমার হাতে ওই পঁচিশ পয়সা গুঁজে দিলেন। আমি আর বিপ্লবী দলে নাম লেখালাম না, টিফিনের সময় একাই খেলাম একটু বেশি দামের কুঁচো বরফে রঙিন জল মেশানো আইসক্রিম।

থার্মোডায়নামিকস্, সিরাজদৌল্লা ও একটি তেরপল

শাক্য মুনি

মার্চ ২১, ২০১৩

ইতিহাসের আজীব মাইফেলে গড়পড়তা আম্রজনতার খুব একটা ভ্রূক্ষেপ নেই। সে চলে তার মত বাদুড়ঝোলা ধ্বস্তাধস্তি টালমাটাল, আর ইতিহাস চলে ইতিহাসের মত, সাজানো পরিপাটি রূপকথা। কখনো কদাচিৎ যদি বা মুখোমুখি, আইদার সে চিনতেই পারেনা, নতুবা ইয়া পেল্লায় লাফে একদম পগার পার। সেই জন্যেই দেখবেন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই পাবলিকে ও তার ইতিহাসে যাকে বলে এক্কেরে গঙ্গা গঙ্গা ফাঁক। আমাদের দেশেও এই ট্র্যাডিশানের কোন ব্যত্যয় নেই। ছাত্রাবস্থা থেকেই যে ইতিহাস পড়ানোর নাম করে অপাপবিদ্ধ কচি মনগুলির উপর নারকীয় টেররিসম্ চালানো হয় তার অধিকাংশটাই আসলে গপ্পকথা, যার সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার কোন যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। বা থাকলেও সেই সত্যের পারসেন্টেজ এতই কম যে তার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় মহাভারতের "অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ" এপিসোডের।

তো এহ্যানো সিচুয়েশানে আজ আমারা চর্চা করবো ভারতবর্ষের কলোনিয়াল যুগের একদম গোড়ার দিকের বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ইভেন্ট নিয়ে। যেসব অলিখিত ইতিহাস বাঙলা তথা ভারতবর্ষ সহ সমগ্র পৃথিবীর মানবেতিহাসের ধারাকে এক ঝটকায় অনেকটা বদলে দিয়ে গেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দী হল ভারতীয় সাবকন্টিনেন্টের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অন্ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা শতক। কারণ এই সেই সময় যখন বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে আমাদের দেশের অফুরন্ত স্বর্ণ ভাণ্ডারের সিংহদুয়ার আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে এবং তারাও সাত সমুদ্দুর ত্যারো নদী পেরিয়ে এই পোড়া দেশের উপকূলে এসে একে একে জাহাজ ভেড়াতে শুরু করছে। এর আগে হুন শক পাঠান মুঘলরা এসে প্রায় সাত-আটশ বছর ধরে লুঠপাট করে, চেটে চুষে চিবিয়ে গিলেও যে বিপুল ঐশ্বর্য পুরোপুরি হজম করে উঠতে পারেনি এবং আগামী মাত্র দু'শ বছরের মধ্যেই তার যাবতীয় সুলুক সন্ধানের ঠিকানা লাগিয়ে দেবে যারা সেই প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (তৎকালীন নাম '*Governor and Company of Merchants of London trading with the East Indies*') ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল বাদশাহ নুরউদ্দিন সেলিম জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করবার সনদ নিয়ে এসে হাজির হলেন ভারত মহাসাগরের উপকূলে। প্রথম কয়েকটা বছর নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। সুরাট (১৬১২) ও মাদ্রাজে (১৬৩৯) গড়ে উঠলো দু'টি ট্রেড সেন্টার এবং ধুরন্ধর বেনিয়া বুদ্ধিবলেই হোক বা মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবেই হোক, তাঁদের ব্যাবসা ক্রমে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। আর অচিরেই তাঁদের নজর গিয়ে পড়লো বঙ্গভূমির উপর।

গাঙ্গেয় দক্ষিণ বঙ্গের হুগলি তখন সমস্ত বিদেশীদের কাছে যাকে বলে একেবারে মেল্টিং পট। ব্যান্ডেল থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত বাঙালী ছাড়াও সাতটি বিদেশি জাত (পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ব্রিটিশ, ডেনিশ, আর্মানিয়ান ও মুঘল) একসঙ্গে ওঠবোস করছে এবং একই ঘাটের জল খাচ্ছে। যদিও সে সময় বাংলায় একচেটিয়া ব্যাবসাকারী প্রধান ইউরোপীয় শক্তি ছিল পর্তুগীজ। তাদের তখন রমরমা অবস্থা। সপ্তগ্রাম আর কাশিমবাজারের দুই ট্রেড সেন্টার থেকে হুলিয়ে ব্যাবসা করে আর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল থেকে মুঘল হারেমের জন্যে দেদার মাগী সাপ্লাই করে তাদের গতরে তখন কিলো কিলো চর্বি জমেছে। তার সঙ্গে আছে ব্যান্ডেল থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জলপথ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল জুড়ে ব্যাপক লুঠতরাজ ও জলদস্যুবৃত্তি। সবমিলিয়ে তারাই তখন বাংলার শের। কিন্তু বাপেরও যে বাপ থাকে এই সহজ সত্য টা তাদের বোধহয় জানা ছিলনা। তাই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মোঘলের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে গিয়ে অচিরেই তাদের সোনার তরী সখাত সলিলে সমাধিপ্রাপ্ত হল। আসল গপ্পোটা কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এতই মজাদার যে না বলে পারছিনা।

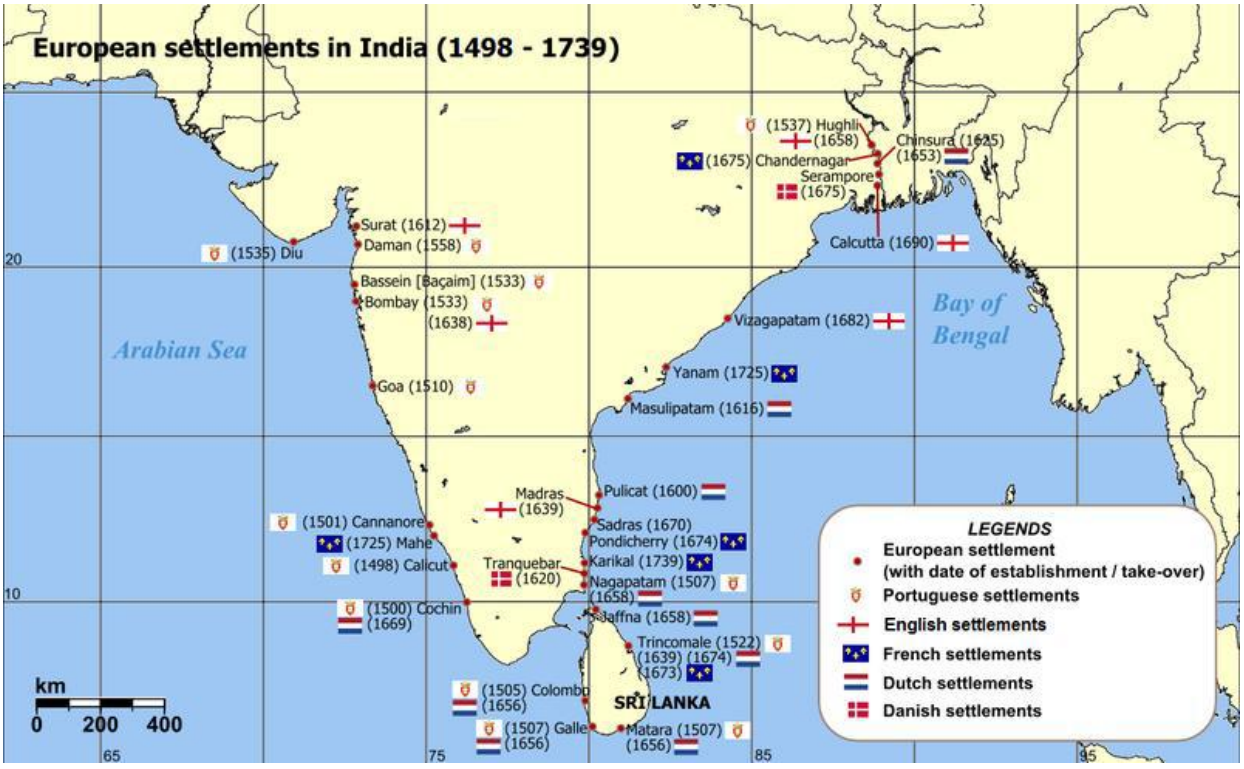

মুঘলাই ট্র্যাডিশান মাফিক বিদ্রোহী যুবরাজ খুররম্ তখন নিজের বাপ জাহাঙ্গীর কে খেদিয়ে দিল্লীর মসনদ দখল করবার তালে হন্নে হয়ে ঘুরছেন। বিভিন্ন অ্যান্টি-স্টেট রেজিম গুলোতে ঘুরে ঘুরে শক্তি সঞ্চয় করতে করতে যখন তাঁর জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে যাওয়ার যোগাড় সেই সময় ১৬২১ সালের কোনও এক সন্ধায় হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হল হুগলীর তৎকালীন পর্তুগীজ গভর্নর মাইকেল রডরিগেজ-এর। এবং তিনি এই পর্তুগীজ রাজপুরুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু গভর্নর রডরিগেজ এই ত্রিশ বর্ষীয় মুঘল যুবরাজকে একটু বেশীই আন্ডার-এস্টিমেট করেছিলেন। তাই তিনি সাহায্য তো করলেনই না, উপরন্তু পাবলিক প্লেসে খুররম্ কে নিয়ে বেদম খিল্লি-বটকেরা

করে যাচ্ছেতাই কান্ড ঘটালেন। যুবরাজ খুররম্ পুরো অপমানটা চুপচাপ হজম করে নিয়ে দিল্লী ফিরে এলেন, এবং সাত বছর পরে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ১৬২৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি 'শাহ জাহান' নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু সাত বছর আগের সেই অপমানের দগদগে ঘা তাঁর মন থেকে তখনো শুকোয়নি। ফলে যা হওয়ার তাই হল। শাহজাহান দিল্লীর মসনদে বসেই কাশিম খান নামে এক খতরনাক যুদ্ধবাগীশকে হুগলীর গভর্নর মনোনীত করে পাঠালেন এবং তিনি হুগলীতে পদার্পণ করে মাত্র চার বছরের মধ্যেই পর্তুগীজদের কেলিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিলেন। ১৬৩২ সালে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে এক লপ্তে প্রায় এক হাজার পর্তুগীজ মারা পড়লো এবং আরও প্রায় সাড়ে চার হাজার কে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হল, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল শতবর্ষ প্রাচীন পর্তুগীজ দুর্গ ও ব্যান্ডেল-হুগলী সন্নিকটস্থ যাবতীয় পর্তুগীজ ট্রেড সেন্টারগুলি। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সাড়ে চার হাজার যুদ্ধবন্দীর মধ্যে অসংখ্য নারী ছিলেন যাঁদের কে পরম দয়াশীল শাহজাহান নিজ গুণে ক্ষমা করে দিলেন এবং আশ্রয় দিলেন নিজস্ব বাদশাহি হারেমে।)

আর ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকা ধূর্ত ইংরেজ এসে পর্তুগীজদের সাজানো বাগানে গেঁড়ে বসলেন। শাহজাহানের কাছ থেকে ১৬৩৮ সালে তাঁরা বাগিয়ে নিলেন বাংলায় ব্যাবসা করবার সনদ এবং ১৬৫১

সালের জানুয়ারি মাসে বাংলার বুকে প্রথম ব্রিটিশ কুঠি গড়ে উঠলো হুগলীর ঘোলা ঘাটের কাছে (বর্তমান হুগলী জিলা সংশোধনাগার ও পুরনো হুগলীঘাট রেল ষ্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল), ঠিক যেখানে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ছিল পর্তুগীজদের দুর্গ (গুগল ম্যাপে জায়গাটা দেখুন)। পৃথিবীতে কলকাতা বলে তখনো কিছু এক্সিস্ট করেনা। সুতানুটি গোবিন্দপুর ইত্যাদি কয়েকটা পুঁচকে পুঁচকে অখ্যাত গ্রাম যদিও আছে, তবে সে থাকা না থাকায় কারুরই কিছু যায় আসে না।

কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে আর ইজ্জৎ যায়না ধুলে।' তাই বাইরে শান্ত শিষ্ট ভদ্দোরলোক সেজে থাকলেও সুবিধাবাদী ইংরেজের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেতে খুব বেশী দিন লাগলো না। অচিরেই ব্যাবসায়ীর বেনিয়ান ছুঁড়ে ফেলে তার অঙ্গে উঠে এলো সেনানায়কের খাঁকি উর্দি। উদ্ধত ইংরেজ সমগ্র মুঘল ভারত জুড়ে বাণিজ্য করবার জন্য একটি সনদ চেয়ে ১৬৮২ সালে বাংলার দেওয়ান শায়েস্তা খাঁ-এর কাছে বায়না জুড়লেন। কিন্তু এই সনদের পক্ষে তৎকালীন বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সায় না থাকায় সেই বায়নায় সীলমোহর পড়ল না। ফলে লন্ডনে ভারতবর্ষের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল স্যার জোসিয়া চাইল্ড খচে গিয়ে একটি চাইল্ডিশ ডিশিসান নিয়ে বসলেন। তিনি মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ Child's war নামে খ্যাত।

১৬৮৫ সাল নাগাদ প্রায় ২০০ টি কামান এবং ৬০০ সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে ব্রিটিশ বাহিনী হুগলীর রয়্যাল পোর্ট ও তৎসংলগ্ন মুঘল দুর্গ ঘেরাও করলো। ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে অতিশয় খচ্চর, মাতাল এবং ভয়ানক মাগিবাজ এক ব্রিটিশ কম্যান্ডার এই যুদ্ধে একদম সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর নাম জোব চার্নক। এর কয়েক বছর আগেই ভদ্রলোক চট্টগ্রামে একটি হিন্দু (মতান্তরে মুসলমান) বিধবা মহিলা কে বিয়ে করতে গিয়ে বামাল ধরা পড়েন এবং কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচেন। বিপর্যস্ত ইংরেজ হাইকম্যান্ড তাঁকে একচোট ধমক ধামক দিয়ে হুগলীতে পাঠিয়ে দিলেন, এবং তিনিও প্রভুদের সামনে নিজের ইমেজ ভালো করবার লক্ষে মুঘলের সঙ্গে তুমুল ঝাড়পিটে লিপ্ত হলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঔরঙ্গজেবের মোটেই পছন্দ হলনা।

ফলে অচিরেই ফুল মুঘল ব্যাটেলিয়ন হুগলীর উপকণ্ঠে এসে হাজির হল এবং হোগলা বনের ধারে ('হুগলী' নামকরণের একটি সম্ভাব্য কারণ) তাঁবু ফেলবার ফলে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্রিটিশ বাহিনীর পেছন খলখলে করে ছেড়ে দিল। মোগলের গোলায় জোবের জোব্বা ফুটো হয়ে গেল। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটের তাড়া খাওয়া জেব্রা-শাবকের মত তিনি হুগলী থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার ভাঁটিতে গঙ্গার পুব পাড়ের একটি ছোট্ট গ্রাম সুতানুটিতে পালিয়ে গিয়ে কোনোমতে প্রাণ বাঁচালেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাগ এত সহজে কমবার নয়। কোথাকার কোন বিটকেল গায়ে-গন্ধ লালমুখোদের এত সাহস হয় কি করে যে তারা মুঘল বাদশার কথার অমান্যি করে? আগুনের চুল্লিতে একতাল গব্যঘৃত ফেলে দিলে যেমন

আগুন দপ্ করে জ্বলে ওঠে তেমনি এক পেল্লায় হুঙ্কারে তিনি হুগলীর ইংরেজ কুঠি দখল করবার পর বোম্বের কুঠিও দখল করে নিলেন এবং ক্লান্ত হতোদ্যম ইংরেজকে নাকে খত দিইয়ে, নগদ ছ'লক্ষ টাকা জরিমানা নিয়ে, তাকে দিয়ে সৎ পথে ব্যাবসা করবার ও তাদের ওই নোংরা লাল নাকটি অন্যের কারবারে না গলাবার চুক্তিতে দস্তখৎ করিয়ে তবে ছাড়লেন।

কিন্তু ইংরেজ ইংরেজই। তাই ১৭০৬ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁরা কি করলেন? তাঁরা সিম্প্লি সেই চুক্তি লঙ্ঘন করলেন।

[ব্রিটিশ জেনারেল ঔরংজেবের সামনে নাকখত দিচ্ছেন]

ভারতবর্ষীয় পাবলিকের চরিত্র বোঝবার জন্য ধুরন্ধর ইংরেজ কে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। (বস্তুত, ১৭ শতকের গোড়ার দিকে তাঁরা ইংল্যান্ড থেকে রীতিমত লোকজন আনিয়ে গন্ডা গন্ডা পাউন্ড খরচা করে এদেশি জনগণের মানসিক ও চারিত্রিক গঠনের ওপর একাধিক সার্ভে করান। এইসব সার্ভের অজস্র মজাদার এবং অব্যর্থ

রিপোর্ট নিয়ে পরে কখনো কিছু লেখবার ইচ্ছে রইল।) তাই বিবিধ ছল-চাতুরির দ্বারা ছোট ছোট রাজা বাদশাদের একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ক্রমে তাঁরা নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো, এবং ইঙ্গ-ফ্রেঞ্চ কলহের আঁচ এসে লাগলো এদেশের রাজনীতিতেও। ভারতে ব্যাবসাকারী দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ ইংরেজ ও ফ্রেঞ্চ শিবিরের দলাদলিতে এবার যুক্ত হল বিভিন্ন ভারতীয় আঞ্চলিক শক্তিগুলিও। আর যুক্ত না হয়ে উপায়ও ছিলোনা। কারণ দিল্লীর বাদশাহি রাশ যত দিন যাচ্ছিল ক্রমে আলগা হয়ে আসছিল, এবং ইংরেজের মানদণ্ডও ক্রমে পুলিশের ডান্ডায় রূপান্তরিত হতে যাচ্ছিল।

বাংলা হয়ত এই জটিল পলিটিক্স থেকে নিস্তার পেতে পারতো। কিন্তু কিছুর মধ্যে কিছু নেই, ঠিক সেই সময়তেই কোত্থেকে একপাল বর্গি এসে সারা বাঙলা জুড়ে ব্যাপক ম্যাসাকার আরম্ভ করলো। আর এই ম্যাসাকার চলল একটানা প্রায় দশ বছর ধরে। ফলে বাংলার তৎকালীন মোঘল নবাব আলিবর্দি খান কে একরকম বাধ্য হয়েই ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলাতে হল। বদলে সেয়ানা ইংরেজ সমগ্র বাংলা জুড়ে ব্যাবসা করবার এবং কোলকাতায় পাকাপাকি ভাবে একটি কুঠি নির্মাণ করবার অধিকার লাভ করল। তবে আলিবর্দি সমঝদার আদমি ছিলেন। তিনি জানতেন যে ব্রিটিশরা সুযোগ পেলেই তাঁকেও তাদের ফ্রেঞ্চ বিরোধী যুদ্ধে শামিল করবার চেষ্টা করবে। তাই তিনি ইংরেজ ও ফ্রেঞ্চ উভয়পক্ষের থেকেই যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন এবং কখনোই তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাখামাখি করেননি।

কিন্তু ১৭৫৬ সালে আলিবর্দি খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই সমঝদারি সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে চলে গেল। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে বসলেন আলিবর্দিরই উনিশ বছর বয়েসি চূড়ান্ত বদমেজাজি ও আখাম্বা গাম্বাট নাতি সিরাজদৌল্লা। ঠিক এই সময়তেই ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসি বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। যদিও এদেশে তখনো তা প্রকৃত যুদ্ধের রূপ নেয়নি। কিন্তু নাকের ডগায় ফরাসডাঙ্গার বিটলে ফ্রেঞ্চগুলো যে কি সলতে পাকাচ্ছে কেউ জানেনা। তাই সাবধানের মার নেই এই ভেবে সতর্ক ইংরেজ কোলকাতায় একটা পেল্লায় দুর্গ (অধুনা কলকাতা জিপিও ভবন) নির্মাণ করতে শুরু করলেন। আর এদিকে বিনা অনুমতিতে ইংরেজের দুর্গ নির্মানের এই খবর কানে যাওয়া মাত্র নব্যাভিষিক্ত নবাব একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই দুর্গ নির্মানের কাজ থামাবার হুকুম জারি করে আদেশনামা পাঠালেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ইংরেজ সেই হুকুম কে পাত্তাই দিলেন না। ফলস্বরূপ, একজন উনিশ বর্ষীয় উঠতি গাম্বাটের হাতে একটা সত্যিকারের সৈন্যবাহিনী ও বিপুল পরিমাণে গোলা বারুদ থাকলে সে যা করতে পারে, সিরাজও ঠিক তাই করলেন।

তিনি সশরীরে কলকাতা আক্রমণ করলেন।

এবং সিরাজের বিশাল বাহিনীর কাছে কলকাতাস্থিত ছোট্ট ইংরেজ সেনাবাহিনী একেবারে ন্যাজে-গোবরে হয়ে গেল। মোট ১৪৬ জন ব্রিটিশ সৈন্য ও নাগরিক নবাবি সেপাইদের হাতে বন্দী হলেন। ব্যাপারটায় সিরাজ ভারী আমোদ পেলেন। আর এই আমোদের চোটে তিনি যে কাজটি করলেন সেটি কে নিঃসন্দেহে ভারতীয় ইতিহাসের একটি গাঁড়লতম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

উনিশ বছরের চ্যাংড়া ছোঁড়ার পক্ষে এই জয়ের আনন্দ হজম করা এতোটাই ডিফিকাল্ট ছিল যে তিনি আনন্দে সব ক'টা বন্দী কে ইংরেজ দুর্গের একটা ছোট্ট ঘুপচি অন্ধকার কামরার মধ্যে বন্দী করে রেখে মদ-মেয়েছেলে নিয়ে সারা রাত্তির দেদার মস্তি লুটলেন। ফলে ১৪ ফুট বাই ১৮ ফুটের একটি দরজা-জানলাহীন ছোট্ট কামরা, যেখানে কোনোক্রমে ৩-৪ জন বসতে পারে এমন একটি অন্ধকূপের মধ্যে ১৪৬ জন কে সারারাত্রি আটকে রেখে দিলে যা হতে পারে তাই হল! পরের দিন সেই অন্ধকূপের দরজা খুলে ১২৭ টি মৃত ও ১৯ টি অর্ধমৃত ইংরেজ কে পাওয়া গেল। ইতিহাসে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা 'কলকাতার অন্ধকূপ' নামে পরিচিত।

বলা বাহুল্য, এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজের ঝাঁট জ্বলে মাঠ হয়ে গেল।

ফলত এই উনিশ বর্ষীয় ছোঁড়াকে যোগ্য দাওয়াই দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৬০০ গোরা সৈন্য ও আড়াই হাজার নেটিভ সেপাই বাহিনী নিয়ে রবার্ট ক্লাইভ নামে এক দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ জেনারেল সুদূর মাদ্রাজ থেকে বাংলায় এসে ল্যান্ড করলেন। এবং কলকাতা পৌঁছেই তিনি প্রথমে কলকাতার দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেন। ইতিমধ্যে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে একটি আফগান আক্রমণের খবর পেয়ে বিচলিত ও বিভ্রান্ত সিরাজ তাড়াহুড়োয় কলকাতার ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করে ফিরে গেলেন।

এর আগে কলকাতা আক্রমণ করতে যাওয়ার পথে সিরাজ চুঁচুড়ার ওলন্দাজ এবং চন্দননগরের ফরাসিদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। উত্তরে ডাচরা মৌনী ধারণ করলেও ফ্রেঞ্চরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন ও ২৫০ ব্যারেল বারুদ উপহার পাঠান। ফলে ফিরতি পথে সিরাজ চন্দননগরে নেমে ফরাসীদের সঙ্গে দু'পাত্তর রেড ওয়াইন খেয়ে এবং প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা কর ছাড় দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন দৃঢ় করলেন এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কুঠি থেকে কর এবং জরিমানা বাবদ সর্বসাকুল্যে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা আদায় করে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ফিরে গেলেন।

কিন্তু সিরাজ পেছন ফিরতে না ফিরতেই ক্লাইভ আবার রণং দেহি মূর্তি ধারণ করলেন এবং চন্দননগরের ফ্রেঞ্চ সেট্‌লমেন্ট আক্রমণ করে ফরাসীদের ফোর্ট অঁরল্যা গুঁড়িয়ে দিলেন। ফলে নব-অঙ্কুরিত ফরাসী পীরিতির পরম আবেগ ধরে রাখতে না পেরে সিরাজ পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এবং ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন কলকাতা থেকে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার দূরে পলাশী নামক একটি অখ্যাত গ্রামের একটি বিশাল আমবাগানের মধ্যে তিনি ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হলেন।

৩৫ হাজার পদাতিক সৈন্য, সাত হাজার অশ্বারোহী এবং ৫৩ টি কামান (যার মধ্যে ৮ টির নীচে 'Made in France' লেখা) নিয়ে সিরাজদৌল্লা পলাশীর ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। আর এই বিশাল সেনাবাহিনীর বিপক্ষে ছিল ৭৫০ মত গোরা সৈন্য, ২১০০ নেটিভ সেপাই, ৮ টি কামান এবং একজন রবার্ট ক্লাইভ! দৃশ্যটা কল্পনা করলে অনেকটা নিচের এই ছবির মতো লাগতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে ক্লাইভের হাতে একটা লুকোনো টেক্কা ছিল। নিশ্চয়ই ভাবছেন 'মীরজাফর'? কিন্তু না, মীরজাফর নয়, এমনকি কোনও জীবিত প্রাণীই নয়। ক্লাইভের অস্তিনের নীচে যে মোক্ষম অস্তরটি সেদিন লুকোনো ছিল তা হল একটা নিতান্ত মামুলী ক্যাম্বিসের তেরপল!

আগেই বলা হয়েছে যে ব্রিটিশরা তাঁদের এই ভাবী কলোনিটি কে নিয়ে যথেষ্ট সিরিয়াস ছিলেন, এবং এদেশের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তাঁরা বিস্তর রিসার্চ করেছিলেন। ফলে তাঁরা জানতেন যে জুন মাসের মাঝামাঝি সময়টিতে ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত বাংলায়, বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। তাই প্রকৃতির এই অমোঘ নির্দেশটি কে উপলব্ধি করে বিচক্ষণ ক্লাইভ কলকাতা থেকে আসবার পথে একটি তেরপল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, এবং বলা বাহুল্য, সিরাজদৌল্লার মোটা মাথায় এই সাধারণ বুদ্ধি টা গজায়নি। এবং সেদিন দুপুরের দিকে প্রায় ঘন্টা দুয়েকের জন্যে আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছিল।

ফলে সিরাজ সারা দুপুর বসে বসে মোহম্মদ রসুল আল্লার গুষ্টির ষষ্টিপুজো করলেন। আর ওদিকে বৃষ্টি নামবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশরা তাঁদের সমস্ত গোলা-বারুদ তেরপল চাপা দিয়ে রাখলেন এবং সিরাজের আশু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কল্পনা করে ফুর্তিতে আমবাগানে গড়াগড়ি খেলেন।

যাইহোক, বৃষ্টি থামবার পর তেড়ে ক্যালাকেলি শুরু হল এবং সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীর মদনের প্রবল বিক্রমে ইংরেজের প্যান্টালুন ইয়োলো হয়ে যাওয়ার যোগার হল। অতঃপর নাস্তানাবুদ ব্রিটিশ বাঁচবার আর কোনও

রাস্তা না দেখে মীর মদনের দিকে কামান তাক করলেন এবং প্রথম বলেই ওভার বাউন্ডারি! শত্রুর কামানের গোলায় মীর মদন কে ভূপতিত হতে দেখে ক্রুদ্ধ সিরাজ নিজের গোলন্দাজ বাহিনীকে আক্রমণের আদেশ দিলেন।

এ প্রসঙ্গে নবীন চন্দ্র সেন মশাই তাঁর বিখ্যাত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে লিখেছেন-

"অকস্মাত একেবারে শতেক কামান

করিল অনলবৃষ্টি

ভীষণ সংহার দৃষ্টি।

কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হল তিরোধান।"

কিন্তু অগ্রজ নবীন চন্দ্রের কাছে বোধহয় এই বৃষ্টি এবং তেরপল সংক্রান্ত তামাশাটির ইনফরমেশানটি ছিলোনা। অথবা হতে পারে যে তিনি সব জেনে শুনেই মুসলমানদের সঙ্গে এট্টু কাব্যিক মশকরা করে তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারেননি।

কিন্তু কেস যাই হোক না কেন, সিরাজের গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক আক্রমণের আদেশ পেয়েই কামান দাগতে গেলেন এবং গিয়ে দেখেলেন হা হতোস্মি! কামান যে জগদ্দল পাথরের মত, এক্কেরে স্পিকটি নট। দুপুরের দু'ঘন্টা বৃষ্টিতে বারুদ ফারুদ সব ভিজে একেবারে গোবর হয়ে গেছে। আর ভিজে জ্যাবজ্যাবে বারুদ যে মানুষের কোনও কাজেই লাগেনা সেটা যখন সিরাজ রিয়ালাইজ করলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মাঝমাঠ অলরেডি বেদখল হয়ে গেছে, প্রধান সেনাপতি মীর মদন নিহত হয়েছেন, এবং শত্রুপক্ষ প্রায় ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। এমত অবস্থায় তিনি তাঁর শেষ অস্ত্র অর্থাৎ সামরিক পরিভাষায় তাঁর right flank -টি কে অ্যাকটিভেট করলেন এবং আমবাগানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সীমান্তে ১০০০০ সৈন্যসহ অপেক্ষমাণ দ্বিতীয় সেনা-প্রধান মীরজাফর কে আক্রমণের আদেশ দিলেন।

এবং ঠিক এই মুহূর্তে হারামখোর মীরজাফর সিরাজকে নিজের তিন ইঞ্চি দীর্ঘ মধ্যমা অঙ্গুলি টি প্রদর্শন করে সসৈন্যে ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দিলেন।

অতঃপর পলাশীর যুদ্ধ শেষ হল। বিজিত হতোদ্যম সিরাজদৌল্লা পালিয়ে গেলেন এবং মীর জাফর বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হলেন। এবং পদাভিষিক্ত হয়েই তিনি ইংরেজ কে বাঙলা থেকে কর আদায়ের ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন এবং গতবছরে সিরাজের কলকাতা আক্রমণের খেসারত স্বরূপ ইংরেজকে সবমিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেন। এছাড়াও তিনি ক্লাইভ এবং ওয়াটস্ সাহেব কে এককালীন চার লক্ষাধিক টাকা ঘুষ দিলেন এবং তাঁদের জন্য নিষ্কর জমি এবং মোটা টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করেলন। কিন্তু এতো কিছু করেও তিনি অর্থগৃধ্ন ব্রিটিশের জঠরানল নির্বাপণে সমর্থ হলেন না।

অতএব তিনি চুঁচুড়ার ডাচদের সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং দু'বছরের মধ্যেই ঘটি বাটি চাঁটি হয়ে পথে বসলেন। ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে গ্যালন গ্যালন জল। প্রথমে মীরজাফর, তারপর মীরকাশেম এবং পুনরায় মীরজাফর কে বাংলার গদি তে বসিয়ে এবং আলটিমেটলি ১৭৬৪ সালে মুঘল সম্রাট শাহ আলম এবং সুজাদৌল্লার যৌথ বাহিনী কে বক্সার যুদ্ধে পরাস্ত করে ইংরেজ বাহিনী বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক শাসক হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং বিপুল ক্ষমতা ও অর্থবলে বলীয়ান হয়ে ফাইনালি ভারত বর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। বাকিটা ইতিহাস।

পরিশিষ্ট

আচ্ছা ধরুন যদি মাথা-পাগলা সিরাজের মাথায় পলাশীর যুদ্ধের আগেরদিন হঠাৎ একটা বাল্ব জ্বলে উঠতো এবং তিনি এই তেরপল মাহাত্ম্য টি বুঝতে পারতেন। কিম্বা ধরুন তাঁর পরলোকগত স্নেহশীল পিতামহ আলীবর্দি খাঁ সিরাজ কে স্বপ্ন দিয়ে বলতেন যে, "বেটা, আঙ্গরেজো কি জঙ্গ কে ম্যয়দান মে যানে সে পহেলে একঠো তিরপল লে যানা মত ভুলনা।" সেক্ষেত্রে? কি ঘটতে পারতো সে ক্ষেত্রে? বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে কি এমন আকস্মিক পরিবর্তনটি আসতে পারতো যদি সিরাজ সেদিনের সেই সিলি মিসটেকটি না করতেন?

না, তফাৎ বিশেষ কিছুই হত না, কেবল ব্রিটিশের বদলে আজ আমাদের দেশ একটি ফ্রেঞ্চ কলোনি হিসাবে গড়ে উঠত মাত্র। ইকুয়েশানটা ধরা গেলনা তো? না, এই সামান্য রহস্যটি বোঝবার জন্য ব্যোমকেশ বা শার্লক হবার প্রয়োজন নেই। একটু চোখ-কান খোলা রাখলে সহজেই ব্যাপারটা বোধগম্য হবে। পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের সেই ৫৩ টি কামানের মধ্যে ৮ টি 'মেড ইন ফ্রান্স' লেখা কামানের কথা মনে আছে? হ্যাঁ, ওর মধ্যেই এই রহস্যের সূত্রটি লুকিয়ে আছে।

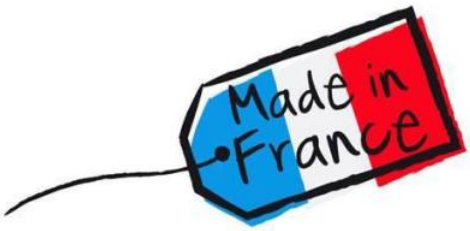

ইংরেজের বিরুদ্ধে সিরাজের পলাশীর যুদ্ধে নামবার অন্যতম প্রধান কারণ ছিলেন ফ্রেঞ্চরা, কারণ সিরাজ এবং চন্দননগরের ফরাসী গভর্নর জোসেফ ফ্রান্সিস ডুপ্লের মধ্যে একটি গোপন মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ডুপ্লে সাহেব সিরাজ কে ওই ৮ টি কামান পাঠিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জলের মত পরিষ্কার। পলাশীর যুদ্ধে নবাব বাহিনীর কাছে ইংরেজ বাহিনী পর্যুদস্ত হওয়া মাত্রই তিনি চন্দননগর থেকে কলকাতা আক্রমণ করবার তালে ছিলেন। এবং বলা বাহুল্য পলাশিতে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয় হলে ফরাসী বাহিনীর পক্ষে কলকাতা দখল করা ছিল জাস্ট ছেলের হাতের মোয়া। এবং এই নাটকের পরবর্তী অঙ্কগুলি মোটামুটি সবই আমাদের জানা, শুধু এর কুশীলবদের বদলে দিয়ে ইংরেজের পরিবর্তে সেই স্থানে ফরাসীদের ভেবে নিলেই হয়। অতএব অচিরেই ভারতবর্ষ একটি ফরাসী কলোনিতে পরিণত হত। অষ্টাদশ শতকীয় ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি হতেন ফরাসীরা। ইংল্যান্ডের বদলে শিল্পবিপ্লব হত ফ্রান্সে। কারণ ভারতবর্ষ থেকে কোটি কোটি টাকা ড্রেইনেজ হয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে না পৌঁছলে থার্মোডায়নামিক্সও হত না, আর কাঁড়ি কাঁড়ি কলকব্জা বানিয়ে নিত্য নতুন গবেষণার যে বিপুল ব্যায়ভার তাও বহন করা সম্ভব হতনা।

কথাটা একটু অত্যুক্তি মনে হলেও পরিসংখ্যান কিন্তু তাই বলে। উইলিয়াম ডিগবি সাহেবের হিসাব অনুযায়ী পলাশী যুদ্ধ থেকে ওয়াটারলু যুদ্ধের মধ্যবর্তী (১৭৫৭ থেকে ১৮১৫) এই ৫৮ বছরে ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ডে কম করে একশ কোটি টাকা ড্রেইনেজ হয়ে গেছে। ১৮৮১ সালে কার্ল মার্ক্স দেখিয়েছিলেন কীভাবে ব্রিটিশ ভারতের কৃষি ও শিল্প-শ্রমিকদের ন্যায্য আয়ের একটা মোটা অংশ (প্রায় ৬ কোটি টাকা) তাঁদের হাতের ফাঁক গলে ইংল্যান্ডে চলে যেত। এই হাত গলে চলে যাওয়া অর্থের পরিমাণ যে কি বিপুল ছিল একটা ছোট্ট নমুনা দিলেই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। ১৭৮৩-৮৪ থেকে ১৭৯২-৯৩ সালের মধ্যে ভারত থেকে ড্রেইন হয়ে চলে যাওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল ইংল্যান্ডের গ্রস ন্যাশানাল প্রোডাক্টের (GNP) প্রায় ৯ শতাংশ, অর্থাৎ যা কিনা ইংল্যান্ডের সামগ্রিক জাতীয় আয়ের ২ শতাংশেরও বেশী, যার আর্থিক মূল্য ১৮০১ সালে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ২৩২ মিলিয়ান পাউন্ড!

এবং আপনি যদি উইকিপিডিয়াতে 'ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব', 'থার্মোডায়নামিকস্', 'কোয়ান্টাম মেকানিকস' প্রভৃতি পেজ গুলি খুলে চোখ বোলান এবং এগুলির ইতিহাস সংক্রান্ত সাল গুলির দিকে নজর রাখেন তাহলে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে আপনাকে খুব বেশী বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু কি আর করা যাবে। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন আর চুল ছিঁড়ে লাভ নেই। আর তাছাড়া ইতিহাসের এইসব আজীব গপ্পো কথা শুনে আমাদের কিইবা হবে? আমরা চলি আমাদের মত বাদুড়ঝোলা ধ্বস্তাধস্তি টালমাটাল, আর ইতিহাস চলে ইতিহাসের মত, সাজানো পরিপাটি রূপকথা। তাই এই রূপকথার দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবের চৌকাঠে আছাড় খাওয়া ছাড়া আমাদের আর গতি কি বলুন? তৃতীয় বিশ্বের বাদামী জনগণের পক্ষে এসব দুঃখবিলাসিতা মানায় না। তাই আমরা ভান করবো যেন আমরা ওদের উন্নতির ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানিনা। ন্যাকা বোকা সেজে মাল্টি-ন্যাশানালের বড়বাবুদের পায়ে তৈল মর্দন করে যাবো সারা জীবন আর ক্রিকেট বিশ্বকাপ ও মিস্ ওয়ার্ল্ড কম্পিটিসান দেখে আমাদের উথলে ওঠা দেশপ্রেমের মাছের তেলে মাছ ভাজতে দেবো ওদেরকে। কিন্তু তবু আমরা মুখ ফুটে রা কাড়বো না। আমরা কেবল মনে মনে, চুপিচুপি এই সত্যিটা জানবো যে, ইংল্যান্ডের আজ এই অগাধ প্রতিপত্তিও হতো না, ইউরোপের শিল্পবিপ্লবও হতো না, আর বিজ্ঞানের এই রমরমা আগ্রগতিও হতো না, আমাদের ঘরের ছেলে মুর্শিদাবাদের সিরাজদৌল্লা যদি একটু মাথা খাটিয়ে পলাশীর যুদ্ধে একটা তেরপল নিয়ে যেত।

তথ্যসূত্রঃ

১) **"Brief History of Hugli"** By Dirom Gray Crawford [BENGAL SECRETARIAT PRESS, 1903]

২) **"A Miscellany Of Mutinies And Massacres In India"** By Terence R. Blackburn [APH Pub. Corp., 2007]

৩) **"Modern World System and Indian Proto-Industrialization: Bengal 1650-1800, Volume 1** By Abhay Kumar Singh [Northern Book Centre, 2006]

৪) **Imperial Gazetteer of India- The Indian Empire Vol 1 Descriptive [Oxford Clarendon Press, 1909]**

৫) **হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ-** সুধীর কুমার মিত্র [মিত্রানী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬২-৬৩]

৬) www.wikipedia.org

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় এবং কাইপুল্লাই ভেট্টি

আমি ও ব্যাটম্যান

উত্তরায়ন

ডিসেম্বর ২৩, ২০১২

আমার আকাশ ঘুড়ি, তোমার পাড়ার নীলে; ব্যাটম্যান লুকোচুরি, নোলানের সিনে-রিলে...

তোফা নাটুকে ক্যারিশমা। ফিরে আসা কাপুর কন্যা নয়, উত্তরবঙ্গের বন্যা নয়। সিনেমার পর্দা জুড়ে বাদুড়-মানুষের দুদ্দাড় হুংকার। ঝাড়া ঘণ্টা আড়াই গোথামের বনে, পপকর্ন অনুপানে অ্যাড্রিনালিন মিকচার। উত্তেজনার লোডে অসভ্য মোবাইলগুলো সটাসট লুমিয়ের মোডে। গ্যাজেট ফ্রিকরা এবং সিনেমা-টিকরা নিজস্ব মতামত গুলোর নোট নিতে মিস করছেন অবিরত। বাতাসখেকো বিদেশী মোগ্যাম্বো "বেন" গোথামের দখল নেবেন নেবেন করছেন। দর্শক কুংফু সম্রাট "ব্রুস লি"র "ইন" মার্কা দৃঢ়তায় স্থির। সিট-এর ককপিট আঁকড়ে ধরছে আঙুল। পার্ক খ্যাদানো প্রেম-কারকরাও ফিসফিস ছেড়ে নির্বিষ। কন্টাক্ট-চোখের ছাউনি মাইনাসে ফ্রিজ। তখনি ফিরে আসে "ইয়ং"।

বাঁধ ভাঙে ধৈর্যের মন্ত্র। তুমুল ঝাড়পিটের পর মহাকাব্যিক অন্ত। সমুদ্রে থেমে যায় ফিউশন বোমা। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নাচে এয়ারক্রাফট। সবাই ভাবছে নায়ক বুঝি ড্রাফ্‌ট হল স্বর্গে। এদিকে হঠাৎ কখন ব্যাটমোবাইলের সঙ্গে পায়ে পায়ে পাল্লা না দিতে পেরে, সময় থমকে গেছে। মনের ভেতর অন্য কেউ একটা প্রবল শক্তির উৎসে আত্মসমর্পণে মগ্ন। চিন্তার গ্যালাক্সি একের পর এক সুপারনোভার বিস্ফোরণে দাহ। মস্তিষ্কে গলে যাচ্ছে জমাট হিমবাহ। পর্দা থেকে লাফিয়ে নেমে আসে আরও একটা "আমি"র ক্লোন। আমিও পারি। এই ভাঙচুর, এই দর্শন, এই প্রতিবাদের মোড়কে যেন আমরা বেগুনী মুখোশ ছাড়াই আস্ত এক একটা সাইক্লোন।

রাইজের শেষে হাসিখুশি ব্রুস ওয়েনের মানুষের সাইজে রেজারেক্সন হলে নিভে যায় প্রোজেক্টর। আবার সেই পুরনো ঘর, চার দেওয়ালের কংক্রিট খাঁচা। কল্পনার নখের আঁচড়ে, ক্যালেন্ডারের লাল কালিতে ধুঁকতে ধুঁকতে বাঁচা। কোকা কোলার অন্তরাল থেকে এমিল জোলার জার্মিনাল। বাস্তবের সাথে সহবাস। খুব অসহায় লাগে টলস্টয়ের সেই বৃদ্ধ কবির মত, শুধু বাঁচার মন্ত্র লিখতে চেয়ে যার কারাগার-বাস। একলা চাপা রাগের কলমে "ব্রেসোনিয়ান" যান্ত্রিক উচ্ছাস।

ফুটপাথে পা বাঁচিয়ে হাঁটতে থাকি প্রাণপণে। ফুসফুসে ধুলোর মেঘে সয়ে থাকা পাপ; নারসিসিস্ট ঘোরে একা একা জীবিত হয় সংলাপ। নিকোটিনে কাঁপা কাঁপা হলদে হাতের তর্জনী তুলি। ওই তো ভণ্ডামি। অ্যানটিম্যাটার নই; নই কল্পনা দ্রুতগামী। সাদাকালো আয়নায় নিখুঁত আমি।

আমি সেই নির্ভীক চিত্রসাংবাদিক। হায়নার দলের মাঝে এক অসহায়কে দেখি জঘন্য তীব্রতায় বারবার ক্ষতবিক্ষত হতে। তবু ভিড়ের মাঝে আমি কেমন নিভৃতে। পুরুষ হয়ে নিজের ছায়ারও লজ্জা আসে, তবে গ্লানি ঝেড়ে ফেলি অক্লেশে। তার চেয়ে বরং ওয়েট করি, দেখি কি হয় শেষে। বেশ দেখল আমার ডিজিটাল ক্যামেরা। আমি শুধু হাততালি দিয়ে অথর্ব সাজতে পারি, ভাঁজতে পারি কোন মোডে দিলে আসবে বেটার রেজোলিউশন। নাকি

এক্সপোজারে অদল বদল! জুম করলে কি হবে স্পষ্ট আরও...? গোল্লায় যাক সেই মেয়ে, এবার দেখবে পুরো দুনিয়া চেয়ে চেয়ে। ধেয়ে আসি বাড়িতে। সাংবাদিক লেভেলে আমি এখন প্রথম সারিতে। এ টু জেড নামাই ল্যাপটপে বসে। ইয়ার-দোস্ত দের পাঠাই উল্লাসে। ঘুমনোর আগে কনসোল সাজিয়ে খেলতে বসি কিছুক্ষণ। বাগিয়ে ধরি জমানার নতুন খেলনা অ্যামুনিশন। ঝরুক রক্ত; আমার তো আর লাগছে না খোঁচা।

ধসছে পীলার,বাড়ছে খিদে অন্ধকারের খাতা। গভীর রাতে জাবর কাটে হেরিটেজ কলকাতা...

আমার গোপন শিরায় শিরায় অতৃপ্ত লালসার নেশা। গভীর রাতে পার্ক সার্কাসের কোনো নির্জন প্ল্যাটফর্ম, রাজারহাটের শীতল অজগর রাস্তা, বারাসাতের চেনা গলির আঁধার ঘুরে, কত কিই তো হয়ে যায় চট করে। সত্যিই কি কেউ কিছুই দেখতে পায় না? সত্যিই কেউ কি কিছু দ্যাখে নি? আমি কিন্তু দেখেছি ওই আড়াল রেখে। কিভাবে নেকড়ের দল ছিঁড়ে খুঁড়ে খায় মৃত খরগোস চেখে। অসহ্য দৃশ্যপাত। হাইপার টেনশনের বড়ি গিলে নি আনমনে। পায়ে পায়ে মন্দনে পিছু ফেরা মুনওয়াক। কিছু পরে ধীরে ধীরে চিৎকারের ডেসিবেল প্রায় নিভু নিভু। একটা গোঙ্গানি বাতাসে ভাসছে তবু। ফ্ল্যাটে ফিরে স্নান সারি। ডিসকাউন্টে কেনা নতুন সাদা পাঞ্জাবি গায়ে, তীরন্দাজের লক্ষ্যে চোখ রেখেছি টিভি পর্দায়। পরদিন সকালে গরম চায়ের ধোঁয়ায় অপেক্ষা করে থেকেছি খবরের কাগজটার। লটারির রেসাল্টের মত কোন কলামে কত পাতায় আমার দ্যাখা মুহূর্ত ছাপা হয়ে এলো সেটাই খেলা। মিলিয়ে দেখি। আপসোস করি। ব্যাটা সাংবাদিক কোথাকার। না জেনেই দিয়েছে মেরে। আমি লিখলে হত বেস্টসেলার, নয়ত মিলত বুকার। আমি কিন্তু পারি না আমার ভেতরের ধর্ষকটাকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে ধুলোর মাটিতে নামাতে। নিজের হাতে কেটে দিতে একে একে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দাঁড়িয়ে দেখতে, যতক্ষণ না সবটুকু রক্ত মেঝের রঙ বদলে দেয়। ইজিচেয়ার থেকে উঠে হেঁটে যাই। বুকশেলফ থেকে টেনে বের করি প্রিয় কবির রোম্যান্টিক বই। তেলেভাজা খেতে খেতে ঝেড়েঝুড়ে পাতা উল্টে দেখি বইমেলা-চকচকে লেখকের সই।

নাড়তে ভালো লাগে আমার, চাড়তে ভালো লাগে; হাট্টিমাটিমটিম, ডিম পাড়তে ভালো লাগে...

খাকি হোক বা সাদা; উর্দি আমার ভীষণ প্রিয়, দাদা। রাস্তার মোড়ে হাত পেতে ছিঁচকেমি, ট্র্যাফিক লাইটে ঘুষ, মগজধোলাই, চোর-পুলিসে ভাই ভাই... এসব তো ইতিহাস। বর্তমানে স্পেশাল কেস গুরু। কাজটাকে শিল্পিত করলে আমি "লিঙ্গ খোঁজারু"। বড়কত্তারা যেভাবে ভজান, মহামান্য হাইকোর্ট যেভাবে আদেশে মজান, তত্ত্বতালাশ সেই ইস্তক। সঙ্গে থাকেন কিছু বিশেষ-অজ্ঞ চিকিৎসক। কেন জানিনা বারবার, সত্যিটাকে জেনেও আশ মেটে না মোটেও। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার আর্তি কি কেবল কবিদের বা হোবোদের? নাকি বিটলস, লোবো দের? ওয়ান সাটার ঝুলিয়ে, দাঁত কেলিয়ে আমরাও থাকি লালবাজারি। একটা জঘন্য, বন্য তাগিদে আদিম দরজায় করাঘাত করি। সাধারণের কয়েক মুহূর্তের গপ্পো হলেও আমার প্রাইডের খনি, আমার ইচ্ছের "অবনী" মাসখানেক না হলে ড্রিমি ড্রিমি চোখে দরজা খোলেন না। এতদিন চলেছে রোজ রোজ টিভিতে মুখ, নতুন জমানো গোঁফ, ইন্টার্ভিউ ছোঁকছোঁক। গিন্নীর আদর আর আজকাল ঝাঁটায় বা পাখাপেটায় নয়; রিভিউ করি বাৎস্যায়নের নোটবুক। নজরিয়া বদলে গেছে, বদলে গেছে লুক। এখন আমি দাবাং, আর নই বুড়ো ভাম। সেলেবের সাথে থেকে পাই সেলেবিয়ানার দাম...

নিজেকে না জানার যে এত আনন্দ কে জানত। পায়ের খাঁজে খাঁজে, নেশাতুর শরীরে পোড়া ঘাস। আঙুল রাখি মাটিতে। বৃষ্টির যুবভারতীর মত ডুবে যায় হাত। আমি দার্শনিক নই, স্পুটনিকও নই; নাসার লুকোনো এলিয়েন নই, পোয়ারো-ধূসর ব্রেইন নই , জমাট বরফে তাজানো সফেন শ্যাম্পেনও নই। আমি তো আসলে কেউ নই, যাকে আপনি চেনেন। সেই অফিস নই, কালো ছাতা নই। সেই লেজার খাতাও নই যেগুলো আপনি চিনতেন অক্লেশে। আমি তো আসলে কোন কোচিং ক্লাস নই, স্কুল বাস নই, রঙচটা হলদে পড়ার টেবিলটাও নই, যাকে সবাই চিনতো একসময়। ফোটো-শুটে নেই কোনো, ম্যাগাজিনের লাল-নীল প্রচ্ছদ মুখে মাখিনি কখনো। যাকে তুমি ভালোবাসো, যাকে তুমি ভালবাসতে।

আমি অমৃত হতে পারি, বিষ হতে পারি। আমি নরম বালিশ হতে পারি, অথবা ধারালো নখ। আমি তো আসলে নিছক একটা... প্র্যাকটিক্যাল জোক।

এবং ঋতুপর্ণ

সৈকত ভট্টাচার্য্য

জুন ১২, ২০১৩

তখন ক্লাশ থ্রি কিংবা ফোর। বাড়িতে জমা হয়ে থাকা পুরোনো সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে থেকে টেনে বের করা কোন এক আনন্দমেলার পাতায় পড়েছিলাম 'হীরের আংটি'। শীর্ষেন্দুর গল্প পড়তে শেখা ওই সময় থেকেই। গল্পের এক অদ্ভুতুড়ে মেজাজ না-পাকা কিশোর মনকে টেনে নিয়ে ফেলত ওই সব আজগুবি চরিত্রের মধ্যে। শীর্ষেন্দুর সেই অদ্ভুতুড়ে মেজাজের একটু বাইরে ছিল 'হীরের আংটি'। এক ধনী পরিবারে হঠাৎ তৈরী হওয়া এক ক্রাইসিসকে ঘিরে এক গল্প। সেবার গরমের ছুটিতে টিভিতে এক দুপুরে দেখলাম সেই গল্পটাই ছবি হয়ে এসেছে। ছুটি-ছুটিতে 'হীরের আংটি' দেখাবে। সত্যি বলতে গল্প পড়ে যতটা মজা পেয়েছিলাম, সেই মজাটা ছবি দেখে পেলাম না। ছবির সাথে গল্পের অমিল অনেকটাই। পরিচালকের নাম দেখলাম, ঋতুপর্ণ ঘোষ, নতুন। একদিন মা আর বাবা আমায় বাড়িতে রেখে 'বড়দের ছবি' দেখে এল। ছবির নাম 'ঊনিশে এপ্রিল'। এরকম তারিখ দিয়ে নাম, কি অদ্ভুত লাগল। মা বলল এত ভালো ছবি নাকি অনেকদিন পর হল বাংলায়। কি জানি, হবেও বা! তারপর আসতে আসতে বড় হওয়ার সাথে সাথে খবরের কাগজ, টিভির সাথে কানে আসতে থাকে কত টুকরো খবর। সদ্য টিন এজার তকমা পাওয়া একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠা মন কৌতূহল জাগায় 'দহন' ঘিরে। কি এমন দৃশ্য আছে! সে কথা অনেক বড় হয়ে ওঠে অব্ধিও কৌতূহল হিসাবেই থেকে গেছিল মনের ভিতর। এর মধ্যে যখন ক্লাশ এইটে পড়ি বাড়িতে কেব্‌ল্ লাইন নেওয়া হল। হঠাতই এক বিকেলে এক নতুন চ্যানেলের (আকাশ বাংলা) উদ্বোধনী ছবি হিসাবে দেখানো হল 'উৎসব'। অপরিণত মনে এটা বড়দের ছবি – এই বোধটা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু একটা ভালোলাগা তৈরী হল ছবি ঘিরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকার পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই চলচ্চিত্র নিয়ে আগ্রহটা বিস্তৃত হল। অনেক দেশ-বিদেশের ছবি হাতে এল। রাতের বেলা হেডফোন কানে দিয়ে দেখে ফেললাম 'অটাম সোনাটা'। বন্ধু বলল এটাই নাকি 'ঊনিশে এপ্রিলের' প্রেরণা। পাড়ার সিডির দোকানে বন্ধুর মেম্বারশিপ কার্ডে নিয়ে এলাম 'ঊনিশে এপ্রিল', 'রেইন কোট'। সিনেমা দেখা শিখতে শুরু করেছি ততদিনে। সাংঘাতিক ভালো লাগল 'ঊনিশে এপ্রিল'এর ডায়লগ, বারবার ঘুরে ফিরে শুনলাম শুভা মুদ্‌গলের গলায় 'রেইন্‌কোট'এর টাইটেল সং। কি অসাধারণ সব লিরিক্স! এমন ব্রজবুলি ভাষায় লিখেছেন এই ভদ্রলোক! কি আশ্চর্য প্রতিভা তাঁর! এর অনেকদিন পরে আই আই টিতে এক রাতের আড্ডায় আমার কাছে পরিস্কার হয়েছে 'ঊনিশে এপ্রিল'এর নামকরণের কারণ। ভদ্রলোকের রবীন্দ্রজ্ঞান ততদিনে আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তারিখ ঊনিশে এপ্রিল ছিল, এটা জানার পর থেকে সেই শ্রদ্ধার পরিমাণ আরো অনেকখানি বেড়ে গেল। কলেজে ফেরতা এক বৃষ্টির বিকেলে 'পূরবী' হলে দেখলাম চলছে সদ্য রিলিজ হওয়া 'দোসর'। একলা টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। প্রসেনজিতের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলাম। সাদা-কালোতে ফোটোগ্রাফি, সংলাপ, সব মুগ্ধ করে দিল সদ্য বড়দের সিনেমা দেখার অনুমতি পাওয়া মনকে। পাড়ার সিডির দোকান থেকে সিডি ভাড়া করে দেখে ফেললাম 'বাড়িওয়ালি', 'শুভ মহরত', 'অন্তরমহল'। শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনেছি সংলাপ, রবীন্দ্রসংগীতের আশ্চর্য ব্যবহার। দিনের পর দিন গুন্‌গুনিয়েছি 'চোখের বালি'র

অসাধারণ মিউজিক। বি এস সি পাশ করার পর প্রথম বার ডেটে যাব সদ্য প্রেমিকার সাথে। অনেক ভাবনার পর গন্তব্য ঠিক হল নন্দন। চলছে 'খেলা'। ঋতুপর্ণ ঘোষের। তাঁর অন্যান্য ছবির তুলনায় অনেক দুর্বল হলেও আমার জীবনের একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল 'খেলা', এক সাথে হাতে হাতে হাত ছুঁইয়ে দিয়েছিল। এরপর অনেক ছবি বারবার দেখেছি। ফিরে দেখেছি 'হীরের আংটি'। মোহিত হয়ে গেছি ডায়ালগ শুনে, মিউজিক শুনে। ছোটবেলার নির্বোধ না-ভালোলাগাটাকে করুণা করেছি মনে মনে। এইসব ভালোলাগা গুলো জীবনের সাথে জড়িয়ে গিয়ে ঋতুপর্ণকে আমার জীবনের একটা অংশ করে দিয়েছিল নিজের অজান্তে। প্রেসিডেন্সির বারান্দায় প্রথমবার সামনা-সামনি দেখে কোন কথা বলার সাহস না দেখিয়ে চুপচাপ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম অটোগ্রাফ খাতা। আমার সিনেমা প্রীতির অংশ হিসাবে একবার পরিচালক হওয়ার ভূত ঘাড়ে নিয়ে দেখা করেছিলাম 'অনিন্দ্য'দার সাথে। প্রতিদিন কাগজের অফিসে কথার ফাঁকে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, "পড়াশোনাটা আগে শেষ করে নেবে, তারপর এদিকে আসবে, নাকি, এখনই করতে চাও? তাহলে ঋতুদার সাথে অবসার্ভিং ডিরেক্টরের কাজ করতে পারো। আমি কথা বলে দেখতে পারি।" সেদিন এক অনিশ্চয়তায় দুলে পড়াশোনাটাকেই বেছে নিয়ে বলেছিলাম, "ঠিক আছে, আগে মাস্টার্স কমপ্লিট করি, তারপর।" জীবনের একএকটা ইচ্ছে থাকে – আকাশকুসুম। খুব ইচ্ছে ছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের সেটে থাকব, চুপচাপ দেখব কিভাবে ভদ্রলোক এমন সব অসাধারণ সৃষ্টি করেন, কিভাবে লেখেন এমন সব সংলাপ! সে আর এ জীবনে হলনা। সকালের মুখ ভার করা আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এমন কত কথা মনে এল। মানুষের সাথে আত্মার সম্বন্ধ না থাকলেও যে প্রাণের সম্বন্ধ গড়ে তোলা যায়, টের পাচ্ছিলাম। আমার মত এক নিতান্ত সাধারণ সিনেমাপ্রেমী যুবকের কাছে তাঁর ছবি যে কতভাবে আসতে পারে, ভালোবাসাতে পারে, জন্ম দিতে পারে নতুন বোধের, তা অবর্ণনীয়। অনেক চ্যাট শোতে তাঁর মুখের রবীন্দ্রকথা শুনে মনে মনে টুকে রেখেছি, তাঁর ছবির আবহসংগীত গুনগুন করেছি, অনুপ্রেরণা পেয়েছি নতুন ভাবে রবীন্দ্রনাথ পড়ার। এই সব শেখা অপূর্ণ থেকে গেল। এক আকাশ কালো মেঘ সাথে দিয়ে কালপারের অজানায় সাঁতরালেন তিনি। আমাদের ভাঙা নৌকা আধ ডোবা হয়ে থেকে গেল ঘাটের কোণে। এক বুক ব্যাথা আর অপরিপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় ঋতুপর্ণ।

খেলা যাঁদের লড়াই করা

প্রত্যয়

নভেম্বর ৯, ২০১২

১৯৭৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। স্থান: আমেরিকার হিউস্টন শহরের অ্যাস্ট্রোডোম স্টেডিয়াম। ৩০০০০ মানুষ জড়ো হয়েছেন সেখানে একটা খেলা দেখতে। টেলিভিশনের সামনে উপস্থিত আরো কয়েক কোটি মানুষ। তাঁদের মধ্যেই একজন ক্যাথেরিন সুইটজার... দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বসে আছে টিভি-এর সামনে। কে এই ক্যাথেরিন? ওর কথায় পরে আসছি। তার আগে দেখে নিই ওই লিজা জনসন কে। সে-ও আজ খুব উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন। বরের সাথে বাজি ধরেছে সে, ওই খেলার ফলাফল নিয়ে। ডাক্তারীর ছাত্রী হলেও লিজা খেলাধুলার দারুন ভক্ত। তার স্বামী ফ্রেডের আবার এসব ঢং একদম পছন্দ না। কোথায় ভাল করে সংসারে মন দেবে মেয়েরা, তা নয় হাজারটা অন্য কাজে আগ্রহ। ওর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াকেও সে ভালো চোখে দেখে না। লিজা চেয়েছিল এই ডিগ্রিটা হয়ে গেলে সার্জারি তে আরো স্পেশালাইজ করবে। সোজা না করে দিয়েছে ফ্রেড। আজকালকার মেয়েগুলো বড্ড পাকামো করে।

ক্রিস্তিন ব্রেনান নামের মেয়েটার কথাই ভাবুন না। শখ হয়েছিল খেলোয়াড় হবে। চারপাশ থেকে সব্বাই মিলে চোখ রাঙিয়েছিল, বলেছিল "মেয়েদের পেশাদার খেলোয়াড় হওয়া সাজে না।" তাই রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে ক্রিস্তিনকে। এখন আবার সে নতুন বায়না ধরেছে সাংবাদিক হবে। ১৫ বছর মোটে বয়স, এদিকে শখের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই! এ হেন ক্রিস্তিনও আজ অধীর আগ্রহে টেলিভিশনের সামনে বসেছে খেলা দেখতে। কিংবা ভাবুন বিলির কথা। মেয়েটা ছোট থেকেই ডানপিটে, খেলাধুলো করে বেড়াত ওর বয়সী ছেলেদের সাথে। যখন বাচ্চা ছিল বাবা মা পাত্তা দেন নি, একটু বড় হতেই তাঁরা একদিন বললেন - "পাড়ার ছেলেগুলোর সাথে তোর আর এভাবে খেলা উচিত না বিলি, বয়স হচ্ছে, এবার মেয়েদের মত আচরণ কর।" কিন্তু ডানপিটে মেয়েটা কিছুতেই রাজি না "মেয়েদের মত" আচরণ করতে। খেলোয়াড় সে হবেই! শেষে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বাবা বললেন ঠিক আছে, ও এমন কিছু খেলুক যা মেয়েরা অল্প স্বল্প খেলে থাকে। বাবার পরামর্শেই বিলি হাতে তুলে নিল টেনিস র‍্যাকেট।

আজকের দিনে সেই মেয়েটা কি করছে? সে-ও কি বসে পড়েছে টিভি-র সামনে? নাহ, টিভি-র সামনে বসে শুধু দেখার পাত্রী নয় সে, ওই বিশাল অ্যাস্ট্রোডোমে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু আজ সে-ই...বিলি জীন কিং...খেলা থেকে অবসর নিয়ে র‍্যাকেট তুলে রাখার দিন যার পকেটে থাকবে ২০টা উইম্বলডন সহ ৩৯টা গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব।

.....

আসুন ফিরে আসা যাক সেদিনের সন্ধ্যায় ওই অ্যাস্ট্রোডোমে। বিলি জীন মাঠে ঢুকছেন ক্লিওপেট্রার ঢং-এ সোনার সিংহাসনে চেপে, সেটা বয়ে আনছে ৫টি সুপুরুষ যুবক। বিলির প্রতিপক্ষ ববি রিগ্‌স-কে নাটকীয় ভাবে একটা রথে চাপিয়ে টেনে আনছে সুসজ্জিত কয়েকজন নারী। ২৯ বছরের বিলির থেকে প্রৌঢ় ববি ২৬ বছরের বড়! ওরা মুখোমুখি হবেন এই বহুচর্চিত টেনিস ম্যাচে, যা ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়ে গেছে "Battle of the sexes" নামে...কারো কারো মতে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ওভারহাইপড ম্যাচ।

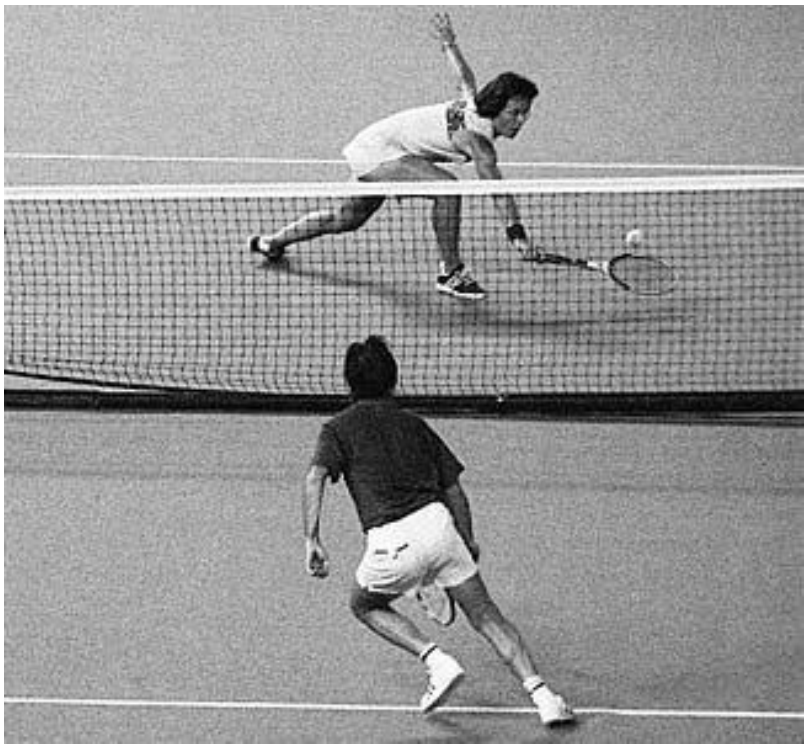

সত্যিই কি ওভারহাইপড? ৫৫ বছর বয়সী প্রায়-বৃদ্ধ একজন পুরুষ খেলোয়াড় এবং ২৯ বছর বয়সী সদ্য উইম্বিলডন চ্যাম্পিয়ন মেয়ের মধ্যে এ হেন ম্যাচের মানেই বা কি? সবদিক থেকে অসম এরকম এক দ্বৈরথ পৃথিবীর খেলার ইতিহাসে স্থান পাওয়ার দাবি আদৌ রাখবেই বা কেন? প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে আগে বুঝে নিতে হবে সেই সময়টাকে। ৭০-এর দশকের গোড়ার দিক অর্থনৈতিক ভাঙনে বিদ্ধস্ত আমেরিকা। তার মধ্যেও স্বমহিমায় বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূরা। তাই বিবাহিত জীবনে চরম অখুশি হওয়া সত্বেও সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ডিভোর্সের কথা ভাবতেও পারেনা লিসা জনসনরা। খেলাধুলার জগতেও তার প্রভাব বিস্তর। একবিংশ শতকের প্রথম দশক পার হয়ে এসে আজ যখন মেয়েরাও ছেলেদের মত সব খেলায় প্রবলভাবে অংশগ্রহণ করছে, এই জায়গা থেকে আমরা ভাবতেও পারবনা কি ভীষণ লড়াই করে এই জায়গায় এসেছে তারা, কি ভীষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে ৪০-৫০ বছর আগেও। ৬০-এর দশক থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নারী আন্দোলন, যা পূর্ণতা পায় ৭০-এর দশকে গিয়ে। Women's liberation movement নামে খ্যাত এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে খেলাধুলার রাজ্যেও। যে দিনটির কথা আমরা বলছি, তার আগের বছরই (১৯৭২) লিট্‌ল লীগ বেসবল মেয়েদের গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সে বছরই পাশ হয়েছে নারী-

পুরুষ বৈষম্যবিরোধী আইন Title IX, তবে খেলাধুলো তখনও তার আওতায় আসেনি। আর ওই ১৯৭২ সালেই আমেরিকার ঐতিহ্যশালী বস্টন ম্যারাথন অফিশিয়ালি মেয়েদের অনুমতি দিয়েছে ম্যারাথনে দৌড়োবার। এই প্রসঙ্গে বলি ক্যাথেরিনের কথা। মনে আছে তো ক্যাথেরিন সুইটজার কে? ১৯৭৩ এর ২০শে সেপ্টেম্বর যে মেয়েটা চিন্তিতভাবে বসে ছিল টিভি-র সামনে? এই ক্যাথেরিনই ১৯৬৭ সালে বস্টন ম্যারাথনে নাম দেয় প্রথম কোন মেয়ে হিসেবে। ২৬ মাইলের দৌড়টা শেষ করেছিল সে, যদিও বস্টন অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন তাকে সে স্বীকৃতি দেয়নি, বরং নিয়ম করে বন্ধ করে দিয়েছিল মেয়েদের অংশগ্রহণ। দৌড় চলাকালীন ক্যাথেরিনকে ধাক্কা দিয়ে দৌড় থেকে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অফিশিয়াল-রা। আন্দাজ করতে পারেন কোন অপরাধে?...ক্যাথেরিন ছিল একজন মেয়ে, শুধুমাত্র এই কারণই যথেষ্ট ছিল তাকে ধাক্কা মেরে বার করে দেওয়ার জন্য।

খেলার জগতে মেয়েদের এই বঞ্চনা নিয়ে গোড়া থেকেই সরব ছিল বিলি জীন। সে সময় মেয়ে খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস করতে চাইলে তাদের সময় দেওয়া হত ভোর ৫টা বা রাত ১০টায়, কারণ অন্য সময় ছেলেদের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। একই খেলায় ছেলেরা যা উপার্জন করত মেয়েরা তার সিকিভাগও পেত না। কারণ মেয়েদের কাছেও খেলাটা জীবিকা হতে পারে এটা ভাবতেই পারতনা কেউ। বিলি জীন বলল, মেয়েদেরও সমান অধিকার আছে উপার্জন করার। প্যাসিফিক সাউথওয়েস্ট ওপেন সে বছর পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়নকে দিচ্ছিল ১২৫০০ ডলার, আর মেয়েদের চ্যাম্পিয়নকে মাত্র ১৫০০ ডলার। বিলি ও আরো কিছু মেয়ে বিদ্রোহ করল, বলল এরকম খেতাবের জন্য লড়ার দরকার নেই আমাদের, ওরা হিউস্টনে Virginia Slims Tennis Tour নামে নিজেদের একটা টুর্নামেন্ট চালু করল। এখান থেকেই পরে WTA (Women's Tennis Association)এর উদ্ভব হয়। বলাই বাহুল্য বিলির এইরকম বাড়াবাড়ি ভাল চোখে দেখেনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ,তারা সুযোগ খুজতে লাগল ওকে হেনস্থা করার।

এমতাবস্থায় মঞ্চে আবির্ভূত হলেন ববি রিগ্‌স। ৪০-এর দশকের বিশ্বসেরা খেলোয়াড়। কিন্তু তাঁর আরো বড় পরিচয় ছিল তিনি একজন হাস্‌লার (Hustler)। অল্প বয়সেই জুয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে ববি বিভিন্ন জায়গায় বাজি ধরে এক্সিবিশন ম্যাচ খেলে বেড়াতেন। কখনও হাতে ছাতা, কখনও সুটকেস, কখনও বা কুকুরের লেস ধরে অন্য হাতে টেনিস খেলে হারিয়েছেন বিপক্ষকে, বাজি ধরে। এভাবে বাজি জেতা আর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল ববির। চরম নারীবিরোধী না হলেও তৎকালীন সমাজের বেশিরভাগ পুরুষের মত তিনিও মনে করতেন খেলাধুলা মেয়েদের জন্য নয়। বিলির বাড়াবাড়ি দেখে তিনি পরিকল্পনা ফাঁদলেন বিলির সাথে বাজি ধরে ম্যাচ খেলবেন। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন "যা টাকা পায় তার অর্ধেকও পাওয়ার যোগ্য ও নয় যদি এই বুড়োটাকে হারাতে না পারে।" বুদ্ধিমতী বিলি বুঝতে পারল এই খেলা থেকে তার পাওয়ার কিছু নেই, ও জিতলে লোকে বলবে একটা বুড়োর সাথে জেতায় কোন কৃতিত্ব নেই, অথচ হারলে ছিছিকার পড়ে যাবে, প্রশ্ন উঠে যাবে মেয়েদের টেনিস আর ওদের সমানাধিকার দাবি করা নিয়েও। খেলতে রাজি হল না বিলি। তখন ববি লোভ দেখালেন তৎকালীন বিশ্বের এক নম্বর মেয়ে খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট কোর্ট-কে। যে জিতবে সে পাবে ১০০০০ ডলার পুরস্কার। মার্গারেট টোপটা গিলল, শুনলনা বিলির বারণ। তার কাছে এটা স্রেফ আরেকটা এক্সিবিশন ম্যাচ। বিনা প্রস্তুতিতেই সে নেমে পড়ল খেলতে। অপরপক্ষে ববি নিজের বাজি জেতার ব্যাপারে খুব

সিরিয়াস। তিনি ব্যায়াম করে মেদ ঝরালেন, নেশা ছেড়ে দিলেন, নিয়মিত ভিটামিন পিল নিলেন এবং প্রস্তুত হলেন ম্যাচের জন্য।

মাদার্স ডের দিন ম্যাচের আয়োজন করা হল। প্রচুর দর্শকের সামনে ঘাবড়ে গেল মার্গারেট, এমনিতেই সে ছিল অপ্রস্তুত, তার ওপর চতুর ববি তার দুর্বলতা ধরে ফেলে বেকায়দায় ফেললেন তাকে। রিগ্‌স ম্যাচটা জিতলেন ৬-২ ৬-১। খেলার জগতের পুরুষতান্ত্রিক গোষ্ঠী তক্কে তক্কেই ছিল, তারা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল দেখো, বিশ্বের এক নম্বর মেয়েও গোহারান হয় ৫৫ বছরের বুড়োর কাছে। এরপর কোন লজ্জায় তোমরা সমান টাকা চাও? Sports Illustrated পত্রিকা ম্যাচটা সম্পর্কে লিখল "Mother's day massacre"। আরও জ্বলে উঠলেন ববি রিগ্‌স। বললেন "এবার আমার উইমেন্স লিবের প্রতিভূ কিং কে চাই। আমি ওকে ক্লে, ঘাস, কাঠ, সিমেন্ট, যেকোন সারফেসে হারাব, চাই কি মার্বেলের ওপর রোলার স্কেটস পরেও। আমি এখন একজন নারী-বিশারদ!" বিলি বুঝল এবার চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করলে সেটা ভীরুতার পরিচয় হবে। মেয়েদের সাথে ছেলেদের ম্যাচ খেলে তুলনা করার কোন যৌক্তকতা নেই বটে, কিন্তু ওই "Mother's day massacre" সেই অন্যায্য তুলনাকেই সামনে এনে দিয়েছে। এখন তাকে খেলতেই হবে। এবার আয়োজন হল আরো বড় করে। বিশাল অ্যাস্ট্রোডোম ভাড়া করা হল। ৭৫০০০০ ডলারে টিভি সম্প্রচারের স্বত্ব কিনে নিল ABC (যেখানে গোটা উইম্বলডন রেডিও সম্প্রচারের স্বত্ব তারা কিনেছিল ৫০০০০ ডলারে)।

বিলি জানত ম্যাচটার গুরুত্ব কতখানি, পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করল সে। ওদিকে ম্যাচের একমাস আগে থেকেই চলতে লাগল নানারকম জল্পনা কল্পনা। মিডিয়ার হাইপ, ববির সাজানো নানারকম নাটক, সবেতেই অংশগ্রহণ করল সে, কিন্তু প্রস্তুতিতে ঢিলে দিল না। অন্যদিকে মার্গারেটকে বিধ্বস্ত করে ববি এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তিনি আর প্রস্তুতির ধার ধারলেন না। প্রচার নিয়েই ব্যাস্ত থাকলেন, আর ক্ষণে ক্ষণে কটাক্ষ করতে লাগলেন মেয়েদেরকে। বললেন "মেয়েদের উচিত প্রথমত শোবার ঘর আর দ্বিতীয়ত রান্নাঘর...এই দুটো জায়গাতেই আবদ্ধ থাকা, টেনিস খেলা ওদের জন্য নয়"।

.....

সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। ২০শে সেপ্টেম্বরের সন্ধে। দুই খেলোয়াড় মাঠে ঢুকলেন নাটকীয় ভাবে। ৩০০০০ দর্শকে স্টেডিয়াম পুরো ভর্তি। টিভি-র সামনে আরো চার কোটি দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ম্যাচটার। "Mother's day massacre" এর পর বেশিরভাগ লোকই বাজি ধরেছে ববির পক্ষে। সবাই অবাক হয়ে দেখল বিলি শুরু থেকেই কিভাবে নিজের স্বভাবসিদ্ধ নেট প্লে ছেড়ে বিভিন্ন কায়দায় লম্বা র‍্যালি চালিয়ে ক্লান্ত করে দিচ্ছে ববি কে। সবাই বুঝল মার্গারেটের মত অপ্রস্তুত হয়ে নামেনি বিলি। শুধু প্রথম সেটেই সে ৩৪টা উইনার মারল। দু ঘন্টা পর যখন ববির একটা ব্যাকহ্যান্ড আছড়ে পড়ল নেটে, তখন খেলার ফলাফল : গেম, সেট, ম্যাচ বিলি জীন কিং...৬-৪ ৬-৩ ৬-৩...ও হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি, বিলি ম্যাচটা খেলেছিল ছেলেদের ম্যাচের মত বেস্ট অফ ফাইভ সেটস, মেয়েদের খেলার মত বেস্ট অফ থ্রী নয়, মেয়ে হওয়ার জন্য কোন বাড়তি সুবিধে নিতে চায়নি সে।

পরে যতবার বিলি জীন কিং কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে "Battle of the sexes" তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ কিনা, প্রতিবারই তিনি বলেছেন "খেলা হিসেবে একেবারেই না, কিন্তু সামাজিক দিক থেকে দেখলে অবশ্যই হ্যাঁ"। এই ম্যাচের পর মেয়েদের খেলা নিয়ে কটাক্ষ কমে যায় অনেকটাই। শুধু খেলা নয়, এর প্রভাব পড়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। এমন হয়ত নয় যে বিলি সেদিন না জিতলে women's lib movement ভেঙ্গে পড়ত, কিন্তু যেসব মেয়েগুলো সেদিন বিলির মুখ চেয়ে বসেছিল তাদের আত্মবিশ্বাসে একটা বিরাট আঘাত লাগত। বিলির নিজের ভাষায় "আমার মনে হয়েছিল আমি যদি জিততে না পারি তাহলে আমাদের লড়াইটা পিছিয়ে যাবে আরো পঞ্চাশ বছর। শুধু মেয়ে খেলোয়াড়দেরই নয়, সমস্ত মেয়ের আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে। তাই তাদের সবার জন্য জিততেই হত আমায়।"

সেদিন বিলি দেখিয়ে দিলেন মেয়েদের খেলাকে যে অপমান করা হয় তা কতটা মিথ্যে। কোটি কোটি দর্শকের সামনে সমস্ত চাপ সহ্য করে খেলার ক্ষমতা যে মেয়েদের আছে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তিনি। এককথায় সেদিন বিলি জীন কিং ঝামা ঘষে দিলেন ক্রীড়াজগতের পুরুষতান্ত্রিকদের মুখে, ক্যাথেরিন সুইটজার ৬ বছর আগে যে লড়াই শুরু করেছিলেন তা পূর্ণতা পেল বিলির জয়ে। ম্যাচটা দেখার পর আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন ক্যাথেরিন। আর সেই ভীতু মেয়ে লিসা? সে বুঝল সে সত্যিই বৃথাই ভয় পাচ্ছিল এদ্দিন। তার মুখে ডিভোর্সের সিদ্ধান্তটা শোনার পর স্বামী ফ্রেডের মুখটা দেখার মত হয়েছিল। আরো বছর দশেক পর লিসা জনসন হয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার একজন নামকরা ব্রেইন সার্জন। ১৫ বছরের সেই ক্রিস্তিন ব্রেনান সেদিনটা সম্পর্কে বলেছিল "আমরা জিতেছি! আমরা মেয়েরা...পেরেছি!" ক্রিস্তিন ব্রেনান এ জুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক। তাঁর লেখা বেস্ট সেলার বই "Best seat in the house" যে কোন ক্রীড়াপ্রেমীর অবশ্যপাঠ্য।

শুধু লিসা বা ক্রিস্তিনই না, আরো কতজন যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বিলির এই জয়ে তার শেষ নেই। নিউ ইয়র্ক টাইমস পরে লিখেছিল "শুধু একটা টেনিস ম্যাচে বিলি জীন কিং যা করেছেন, বহু নারীবাদী সারাজীবনেও তা করে উঠতে পারেন না।" ১৯৭৫ সালে অনেকগুলি পত্রিকা একসাথে পোল করেছিল তাদের পাঠকেরা বিশ্বের কোন মহিলার প্রতি সবচেয়ে শ্রদ্ধাশীল। বিপুল ভোটে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন বিলি জীন কিং। পরবর্তীকালে মেয়েদের খেলার জন্য আরো অনেক কাজ করেন বিলি। Women's Sports Foundation এবং Women's Sports Magazine এর প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৬ সালে USTA National Tennis Centre যখন বিলির নামে নামাঙ্কিত হয় তখন তার উদ্বোধন করতে এসে জন ম্যাকেনরো বলেন "মেয়েদের খেলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের নাম বিলি জীন কিং"। ৬৯ বছর বয়সে এখনও এইরকম কাজ করে যাচ্ছেন বিলি...তাঁর লড়াই আজও অব্যাহত।

এ সমস্তই কেবল আমেরিকার ক্রীড়াজগত ও সেখানের সমাজের সাথেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তবু বিলির এই যুদ্ধজয়ের গল্প কি আমাদের দেশেও প্রাসঙ্গিক নয়? আজও? আজও বহু জায়গায় মেয়েরা সমান অধিকার তো দূরের কথা, বেঁচে থাকার প্রাথমিক অধিকারগুলোও পায়না। এই গল্পের মর‍্যাল এই যে সবাইকে পথে নেমে মিছিল-আন্দোলন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে যেখানে কাজ করেন, নিজের কাজের মাধ্যম ব্যাবহার করেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্ভব। যতই সামান্য হোক সে প্রতিবাদ, কে বলত পারে, সেটাই হয়ত আরো পাঁচজনকে প্রতিবাদের ভাষা জোগাবে!

[স্বীকারোক্তি: কিছুদিন আগে "When Billie beat Bobby" একটা ফিল্ম দেখে এই নিয়ে আগ্রহী হয়েছিলাম। লেখার কোন পরিকল্পনা ছিলনা, অনেকগুলো বই লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়তে পড়তে আরও ডুবে গেলাম খেলার ইতিহাসের মধ্যে। এই বিখ্যাত ম্যাচ নিয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে,কিন্তু বাংলায় কোনও লেখা দেখিনি, কতজন জানেন সেই নিয়েও সংশয় আছে। সেই থেকেই লেখার প্রেরণা পাই। আপনাদের ভাল লাগলে পরের পর্বে আরো এই ধরনের লেখার চেষ্টা করব।

লিসা জনসন চরিত্রটির নামধাম আমার কল্পনাপ্রসূত, তবে চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, বিলি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন এরকম একটি মেয়ের কথা, যে পরে বিলি কে তার কাহিনী বলে ধন্যবাদ দিয়ে গেছিল। এছাড়া উদ্ধৃতিগুলো দেওয়ার সময় আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করেছি,সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে।]

তথ্যসূত্র :

1. The Autobiography of Billie Jean King **B.J.King**

2. We have come a long way: The story of women's tennis **B.J.King and Cynthia Starr**

3. Game, set, match: Billie Jean King and the revolution in women's sports **Susan Ware**

4. Girls rule! The glory and spirit of women in sports **Rappoport Ken**

5. Sports Illustrated, May 21, 1973

6. The battle of the sexes **Gail Collins**

7. Battle of the sexes **Anthony Holden**

8. Wikipedia

***ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।

চার আঙুলে রূপকথা

সৈকত ঘোষ

আগস্ট ২৬, ২০১৩

(১)

স্বপ্ন দেখা মূলত একটি গবেষণা
ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে বহুল প্রতিষ্ঠিত মতবাদ
ক্যানভাস জুড়ে স্পেস নিয়ে খেলতে গেলে
জাপটে ধরে টুকরো ঘটনাপঞ্জি। মোহভঙ্গ
বড় অপরাধ!

ভাষার শরীরে অনেকরকম খাঁজ থাকে
প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে

চর্যাপদ বৃষ্টির সাথে মিশলে
কবিতা আধুনিক হয়
ইরোটিক টাচে কি সাংঘাতিক নৈসর্গ

(২)

তোমাকে গোপন করার কিছু নেই, সত্যিই কিছু নেই
ফেসবুক বা টেলিফোনিক কথোপকথন।
যা গোপন করতে পারি সেটা ওই দৃষ্টি, দৃষ্টি মানুষ বিশেষে বদলায়
আয়নায় নিজেকে দেখলে মাঝে মাঝে ক্ষুধার্ত লাগে
এ এক অগ্নিপরীক্ষা – বড় ভয়!
শরীরের আঁশটে গন্ধ, সমস্ত বদ রক্ত কোথাও যেন উধাও হচ্ছে
সিগারেটের ধোঁয়া ছায়াপথ বরাবর...

হতেই পারে
মানসিক বিপর্যয় ঘূর্ণাবর্ত বহুব্রীহি সমাস...

বল্কল

অনিমেষ

আগস্ট ৩১, ২০১৩

বল্কল
এবং শূন্যতা ...
হিসেব মেলেনি যদিও
চাঁদ নামে মোবাইল টাওয়ারের গায়
আর তিনকোনা পিরামিড ছায়ায় আমি পুরোপুরি কামুক হয়ে উঠি!
অস্পৃশ্য অবয়বগুলো বেনীচুল
চোখে চোখে আসে যায়
একে একে
খালি পায়ে
খুলে ফেলে নীল নীল পুচ্ছ ও বেনারসী
ফুল ছিঁড়ি
আর অপেক্ষা...
দুহাতে তরল ঢেলে দেবেন
ভদ্রমহিলা,
তাঁর পেটের ফাটা দাগগুলো
আস্তে আস্তে নদী হবে
রাস্তা হবে
ট্রাম লাইন হবে!
আমি শূন্যতা ভুলে গার্লফ্রেন্ডের বুকে মাথা রেখে
আবার পায়ে পায়ে অরণ্যে ঢুকে যাব
সেই আলোর রেখা বরাবর।
শূন্যতার বল্কল খুলে প্রেম পরব চানের পরে
অথবা মাঝরাতে
আর একটু অন্ধকার করে নেব হেঁতালের ভেলা।

অ্যাকিলিস, কচ্ছপ এবং ইনফিনিটি

অযান্ত্রিক

ফেব্রুয়ারী ১৭, ২০১৩

অ্যাকিলিসকে চেনেন তো? হ্যাঁ, ইলিয়াডের অ্যাকিলিসের কথাই বলছি। ট্রয়ের যুদ্ধের সেই গ্রীক বীর।

প্রশ্ন হল তার সাথে কচ্ছপের কী সম্পর্ক!

খোলসা করা যাক। আমরা আলোচনা করতে চলেছি "অসীম" সংক্রান্ত কিছু প্যারাডক্স নিয়ে। গণিতের জগতে অসীম বা ইনফিনিটি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক গোলযোগ ছিল এককালে। এককালে বলতে বোঝাচ্ছি ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। তখন অসীম ব্যাপারটা নিয়ে নানা গণিতজ্ঞের নানা মত ছিল। অসীম জিনিসটার সংজ্ঞাও তখন স্পষ্ট ছিল না।

ট্রিস্ট্রম শ্যান্ডির প্যারাডক্স:

বার্ট্রান্ড রাসেলের আলোচনায় ট্রিস্ট্রম শ্যান্ডির প্যারাডক্স বিখ্যাত হয়ে ওঠে।[১] ট্রিস্ট্রম শ্যান্ডি হলেন অষ্টাদশ শতকের এক ঔপন্যাসিক লরেন্স স্টার্ন[২] এর "ট্রিস্ট্রম শ্যান্ডি" উপন্যাসের নায়ক। তাঁর জীবন এতোটাই ঘটনাবহুল ছিল যে তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর একদিনের সব ঘটনা লেখার জন্য এক বছর সময় লাগতো! ভেবে দেখুন!

তো ধরে নিলাম, আমাদের এই নায়কের জীবনে অসীম সময় আছে। তাহলে? তাঁর সমগ্র জীবনকালে বেশ কিছু বছর আছে। তার মানেই বেশ কিছু দিন আছে।

ধরে নিলাম কোনও ব্যক্তি মোট ৮০ বছর বাঁচলেন। তাহলে তাঁর জীবনে-

মোট বছর = ৮০

মোট দিন = ৮০ x ৩৬৫ (প্রায়)

সুতরাং একথা আর বলার অপেক্ষা থাকেনা, যে কোনও ব্যক্তির জীবনকালের মোট বছরের চেয়ে অবশ্যই মোট দিনের পরিমাণ বেশী হবে।

এবার আসুন, ফিরে যাই আমাদের নায়ক ট্রিস্ট্রম শ্যান্ডির কাছে, যে কিনা অসীম জীবনের অধিকারী বলে আমরা ধরে নিয়েছি। সে প্রতি বছরে তার একদিনের জীবনী লিপিবদ্ধ করতে থাকলো। তার একদিনের জীবনী লিখতে একবছর গেলো, দ্বিতীয়দিনের জীবনী লিখতে গেলো দ্বিতীয় বছরটি, এমনভাবে চলতে থাকলে, তাঁর জীবনের n -তম দিনটির জীবনী তিনি লিখবেন n -তম বছরে। আর আমাদের নায়কতো অমর! সুতরাং এভাবে চলতেই থাকবে। ট্রিস্ট্রম শ্যান্ডির জীবনের প্রতিটি দিনের জীবনীই লেখা হবে।

বুদ্ধিমান পাঠক কী অনুমান করতে পারছেন ব্যাপারটা কোনদিকে গড়াচ্ছে? এই ঘটনার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে, তা হল – ট্রিস্ট্রম শ্যান্ডির অনন্ত জীবনের

মোট বছর সংখ্যা = মোট দিন সংখ্যা

এ জিনিস তো আমাদের সাধারণ চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত! একেই বলে স্ববিরোধ বা প্যারাডক্স।

সুতরাং "অসীম" কনসেপ্ট নিয়ে মোটেই ছেলেখেলা করা যাবেনা। "অসীম"কে দেখতে গেলে "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে" দাঁড়াতে হবে, নূতন ধরণের চিন্তা করতে হবে, নূতন ধরণের চিন্তা গ্রহণ করতে হবে।

অ্যাকিলিস এবং কচ্ছপ:

আসা যাক অ্যাকিলিসের কথায়। আরেকটি প্যারাডক্স। এবার অসীমতার দৌড়ে সামিল দৌড়বীর অ্যাকিলিস এবং এক কচ্ছপ। তবে, বেচারা কচ্ছপকে কিছুটা সুযোগ দিতে অ্যাকিলিস তার খানিকটা পিছন থেকে দৌড় শুরু করেছে। কচ্ছপের স্টার্টিং পয়েন্টকে $T1$ এবং অ্যাকিলিসের স্টার্টিং পয়েন্ট কে $A1$ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

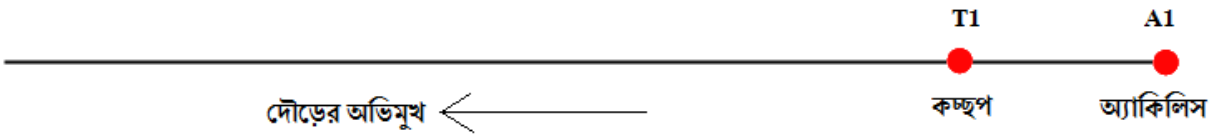

এবার দৌড় শুরুর পর, স্বাভাবিক চিন্তায় মনে হয়, যে অ্যাকিলিসের যেহেতু বেগ অনেক বেশী, তাই তার পক্ষে কচ্ছপকে অতিক্রম করে যাওয়া অত্যন্ত সহজ। কিন্তু গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno)[৩] দেখালেন আরেকরকম চিন্তাপদ্ধতি[৪], যেভাবে ভাবলে অ্যাকিলিসের পক্ষে কখনোই কচ্ছপকে অতিক্রম করা সম্ভব না। আসুন, একবার জেনোর মতন করে ভেবে দেখা যাক।

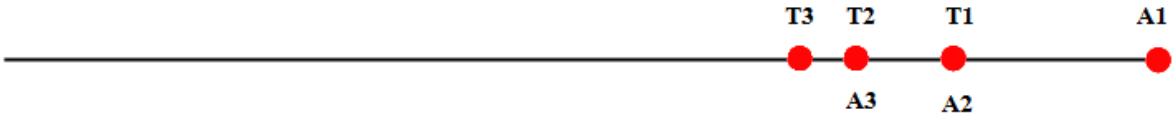

অ্যাকিলিস যে সময়ে তার নিজের স্টার্টিং পয়েন্ট A1 থেকে কচ্ছপের স্টার্টিং পয়েন্ট (T1) এ এসে পৌঁছলো, তখন তার ঐ অবস্থান কে A2 নাম দেওয়া হল। কিন্তু যেহেতু অ্যাকিলিস যতই জোরে দৌড়াক না কেন, A1 থেকে A2 (T1) পয়েন্টে আসতে তার কিছুটা সময় লাগছেই, এবং কচ্ছপ যতই আস্তে দৌড়াক না কেন, ঐ সময়টুকুতে সে কিছুটা পথ অতিক্রম করছেই, তাই অ্যাকিলিস যখন A2 তে এসে পৌঁছাচ্ছে, তখন কচ্ছপ এগিয়ে গিয়ে T2 বিন্দুতে রয়েছে।

একইভাবে, অ্যাকিলিস যতক্ষণে A2 থেকে A3 (T2) পয়েন্টে এসে পৌছাচ্ছে, সেইটুকু সময়ও কচ্ছপ থেমে থাকছেনা, সামান্য হলেও এগোচ্ছে, চলে যাচ্ছে T3 পয়েন্টে।

এভাবে সবসময়েই কচ্ছপটি অ্যাকিলিসের থেকে এগিয়ে থাকছে। যত সময় যাচ্ছে, অ্যাকিলিস এবং কচ্ছপের মধ্যবর্তী দূরত্ব তত কমছে, কিন্তু কখনোই অ্যাকিলিস কচ্ছপকে ধরতে পারছেনা।

গ্যালিলিওর প্যারাডক্স:

এবার আমরা বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-কথিত একটি অসীমতা সংক্রান্ত প্যারাডক্স দেখবো।

প্রথমেই আমাদের জানতে হবে স্বাভাবিক সংখ্যা কী? স্বাভাবিক সংখ্যা হল ১, ২, ৩, ইত্যাদি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাগুলি। স্বাভাবিক সংখ্যার মোট সংখ্যা অসীম। কারণ কেউ যদি বলে সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক সংখ্যা p, তাহলে সেই p এর সাথে ১ যোগ করলে এমন একটা স্বাভাবিক সংখ্যা পাওয়া যায় যা কিনা p এর চেয়েও বড়। সুতরাং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ... এভাবে এগিয়ে স্বাভাবিক সংখ্যার কোনও শেষ পাওয়া যাবেনা।

এবার জানা প্রয়োজন পূর্ণবর্গ সংখ্যার সম্পর্কে। পূর্ণবর্গ সংখ্যারা হল কোনও একটা স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে সেই সংখ্যাটিকেই গুণ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন, ১ এর সাথে ১ কেই গুণ করে পাওয়া যায় ১, সুতরাং ১ একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা। একই ভাবে ২ এর সাথে ২ কেই গুণ করলে ৪ পাওয়া যায়, সুতরাং ৪ ও একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা। পূর্ণবর্গ সংখ্যাগুলিকে পরপর সাজালে তাদের যে তালিকা পাওয়া যায় তা হল ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫, ৩৬, ৪৯, ৬৪ ... একথা বলাই বাহুল্য যে, যেহেতু স্বাভাবিক সংখ্যার কোনও শেষ নেই, তাই পূর্ণবর্গ সংখ্যারও কোনও শেষ নেই।

একটা ব্যাপার এতোক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তা হল – পূর্ণবর্গ সংখ্যারাও প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক সংখ্যা। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বাভাবিক সংখ্যার জগতের একটা অংশ হল পূর্ণবর্গ সংখ্যাসমূহ। স্বাভাবিক সংখ্যার দুনিয়া, অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ... ইত্যাদি থেকে আমরা বেছে বেছে ১, ৪, ৯ ... ইত্যাদিকে তুলে এনে তাদের নাম দিয়েছি পূর্ণবর্গ সংখ্যা। ব্যাপারটা নীচের ছবির মতো -

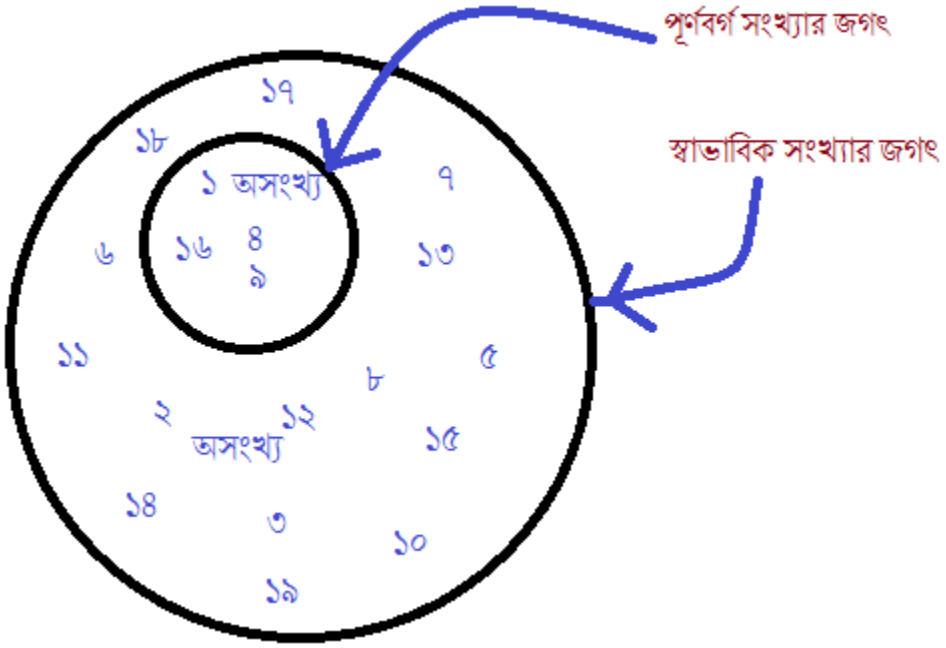

"The whole is greater that the part."[৫] অর্থাৎ সম্পূর্ণ কিছু সবসময়েই তার একটা অংশের চেয়ে বড় হয়। উদাহরণ হিসাবে দেখা যায়, আমরা দশটা পেয়ারা কয়েকজনকে ভাগ করে দিলে তাদের যে কারও পাওয়া পেয়ারার সংখ্যার চেয়ে অবশ্যই "দশ" সংখ্যাটি বেশী হবে। সুতরাং এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমাণ অবশ্যই পূর্ণবর্গ সংখ্যার পরিমাণ থেকে বেশী হতে হবে।

কিন্তু এইখানেই গ্যালিলিও এক বিষম সমস্যা হাজির করলেন, তিনি দেখিয়ে দিলেন যে স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমাণ পূর্ণবর্গ সংখ্যার পরিমাণের সাথে সমান। এ জিনিসটা যে পদ্ধতিতে গ্যালিলিও দেখালেন, তার নাম হল ওয়ান-টু-ওয়ান করেসপন্ডেন্স (One-to-one correspondence) অথবা বাইজেকশান (Bijection)[৬]।

বাইজেকশান তখন কাজে লাগে, যখন কিনা কোনও কিছুর সংখ্যা সরাসরি গুনে ওঠা কষ্টকর। অন্য কোনও কিছুর সঙ্গে একটার-সাথে-একটা মিলিয়ে মিলিয়ে তখন তার সংখ্যা বোঝা যায়। যেমন, ধরা যাক কোনও গোয়ালে একদল গোরু আছে। যে রাখাল গোরু চরাতে নিয়ে যায়, তার পক্ষে গোরুর সংখ্যা গোনা সম্ভব হয়না। সে খুঁটির সংখ্যা মনে রেখেছে। গোয়ালঘরে প্রতিটি গোরু একটা করে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা থাকে। সুতরাং খুঁটির সংখ্যা এবং গোরুর সংখ্যা সমান। রাখাল সারাদিন ধরে গোরু চরিয়ে বিকেলে যখন গোয়ালে ফিরে গোরুগুলোকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধে, তখন যদি কয়েকটা খুঁটি ফাঁকা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোরু হারিয়ে গেছে, আবার যদি সবগুলো

খুঁটির সঙ্গে গোরু বাঁধার পরেও কিছু গোরু বাঁধা বাকি থাকে, তবে বুঝতে হবে অন্য কারও গোরু ভুলবশতঃ পালে এসে ঢুকেছে।

গ্যালিলিও – গোরু, অর্থাৎ পূর্ণবর্গ সংখ্যাগুলিকে খুঁটি, অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে বেঁধে ফেললেন।

স্বাভাবিক সংখ্যা: ১ ২ ৩ ৪ ৫ . . . চলছে

পূর্ণবর্গ সংখ্যা : ১ ৪ ৯ ১৬ ২৫ . . . চলছে

এইভাবে ওয়ান-টু-ওয়ান করেসপন্ডেন্স দিয়ে গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন যে স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমাণ, তারই একটা অংশ, পূর্ণবর্গ সংখ্যার পরিমাণের সাথে সমান।

এই প্যারাডক্সগুলি আমাদের একটা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়, সেটা হল – আমাদের চিন্তায় কোথাও না কোথাও গলদ আছে। আমরা এমন এক উল্টো রাজার দেশে ঢুকে পড়েছি, যেখানে আমাদের চিরপরিচিত নিয়ম অচল। আমাদের ভুল কী হয়েছিল? একটা বিরাট গাণিতিক ধারণায় ভুল হয়েছিল। আমরা অসীমকে একটা সীমার মধ্যে বাঁধতে গেছিলাম। বৃত্তের মধ্যে আটকাতে গেছিলাম। বাস্তবিক, অসীমের ধারণা করা কষ্টকর, অসীমকে ভাবা কষ্টকর, মানুষের মন সবসময় সেটাকে একটা সীমারেখায় আটকাতে চায়। তাই ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অসীমের সংজ্ঞা গণিত দিতে পারেনি, অসীমকে কোনও গাণিতিক নিয়মের বেড়াজালে বাঁধতে পারেনি। অবশ্য তারপরের ইতিহাস পুরো গণিতবিশ্বকেই পাল্টে দেয়, অসীমের সামনাসামনি হন প্রবাদপ্রতিম গণিতজ্ঞ জর্জ ক্যান্টর। অসীমকে তার সকল দুর্বোধ্যতা সমেত পাকড়াও করেন তিনি। সে গল্প পরে কখনো হবে।

তথ্যসূত্র:

১) ট্রিস্ট্রম শ্যান্ডির প্যারাডক্স এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্য

২) উইকিপিডিয়ায় লরেন্স স্টার্ন সংক্রান্ত আর্টিকেল

৩) Zeno of Elea

৪) Zeno's paradoxes

৫) ইউক্লিড রচিত জ্যামিতি বিষয়ক বই "The Elements" এর প্রথম খণ্ডে (Book I) বর্ণিত fifth axiom

৬) উইকিপিডিয়ার বাইজেকশান সংক্রান্ত আর্টিকেল।

অবলাকান্তর দপ্তর

উত্তরায়ন

ফেব্রুয়ারী ৯, ২০১৩

প্রথম পর্ব

গ্রাম গঞ্জে শীত একটু বেশিই পড়ে। চারিদিক ফাঁকা ফাঁকা। বাতাস আসা যাওয়ার অঢেল রাস্তা। নীল আকাশটা সবসময় ঝকঝকে পরিষ্কার থাকে। আর সূর্যের আলো যখন ঝিকিয়ে পড়ে, পুকুরের জল যেন স্বচ্ছ আয়নার মত দ্যাখায়। তার সাথে গায়ে আলপিন ফোটানো হাওয়া তো আছেই। দাড়িটা একদফা চুলকে নিয়ে একটা ছুঁচে সুতো পরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল অবলাকান্ত। সে বড় আপনভোলা মানুষ। চার দেওয়ালে মন টেকে না। তাই থেকে থেকেই জানালার বাইরে চোখ চলে যাচ্ছিলো আর সুতো ঢোকাতে ভুল হয়ে যাচ্ছিলো। এই নিয়ে গত পরশু থেকে সাত বারের বার এই আলোয়ানটাই সেলাই করতে বসেছে সে। কিন্তু কোন এক দুর্জ্ঞেয় কারণে কখনই কাজটা করে ওঠা হয় নি। যে গ্রামের কথা আমি বলছি তেমন গ্রাম আমাদের বাংলায় অনেক রয়েছে। বসতি বলতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাত্র গোটা পঞ্চাশেক ঘর। সভ্যতার ছোঁয়াচ বলতে কিছু পাকা দেওয়াল আর খান দুই সাদা কালো টেলিভিশন। বেশীর ভাগ ঘরই মাটির। খুব বেশি হলে টালির ছাউনি দেওয়া। কাজ চলে যাওয়ার মত দোকান পাট। রবিবার দিন করে নাম কা ওয়াস্তে একটা হাট বসে। আশেপাশের গাঁয়ের লোকজন আসে। সামান্য বিক্রি-বাট্টাও হয়-টয়। আসলে চলাচলের মধ্যে বড়লোকি ধাঁচটা এখনো ঢোকেনি। কাছাকাছি যাতায়াতের মাধ্যম বলতে পনেরো কিলোমিটার দূরে একটা অখ্যাত রেল ষ্টেশন। সেখানকার টিকিটঘরটাও সাধারনত বন্ধই থাকে, কারণ গ্রামের লোক খুব একটা বাইরে যায় না বা বাইরে থেকেও লোকজন প্রায় আসে না বললেই চলে। গ্রামের লোক নিজের নিজের ক্ষেতেই সবজি ফলায়। আসে পাশের অনেক পুকুর থাকায় অন্তত ছোট মাছের অভাব নেই।

এবার বরং নামটা বলি। গ্রামের নাম হিজলগঞ্জ। এহেন হিজলগঞ্জে ক্লাবও আছে একটা। নাম আকাশবাণী সঙ্ঘ। এই আকাশবাণী নামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর-প্রাপ্ত নয়। আসলে ক্লাবের আদৌ কোন নামই নেই। ক্লাবে সারাদিন তারস্বরে রেডিও বাজে বলেই গ্রামের লোক এই নাম দিয়ে রেখেছে। আকাশবাণী ক্লাবের ছেলেরাই মাঝে মাঝে শহর থেকে প্রোজেক্টর ভাড়া করে সিনেমা দ্যাখায় বা যাত্রা টাত্রা নিয়ে আসে। বাকি সময় তাস খেলে, ক্যারাম পেটায় আর গ্রামময় দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়। তবে অবলাকান্তর এসব তুচ্ছ ব্যাপার স্যাপার নিয়ে মাথাব্যথা বড় একটা নেই। তার পূর্বপুরুষ এককালে হিজলগঞ্জ এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলোর জমিদার ছিলেন। সে রাজাও নেই, সে রাজ্যও নেই। পড়ে আছে একখানা বিশাল ভিটে বাড়ি আর লাগোয়া বেশ কিছু জমি পুকুর ইত্যাদি। খাজনার প্রথা তো সেই কোন কোম্পানির আমলেই উঠে গিয়েছে। তাই বাড়িটার বেশীর ভাগই এখন ধ্বংসস্তূপ বললে ভুল বলা হবে না। পুকুর ব্যবহার না হলে বা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে শীতকালে ঘাস জন্মায়, বর্ষায় কচুরিপানায় ছেয়ে যায়। তাই একখানা পুকুর ছাড়া বাকিগুলো পানায় মজে গিয়ে এখন পাঁকালমাছের থাকারও

উপযুক্ত নয়। সেই বাড়ির কয়েকটা ঘর সাফ সুতরো করে আছে অবলাকান্ত। সে লেখাপড়া ছেড়েছিল এগারো ক্লাস পড়ে। জন্ম থেকে শরীর দুর্বল। তাই অভাবের মধ্যেও আদর যত্নে মানুষ হয়েছে আর ছোট থেকেই গুচ্ছের গল্প বই গিলেছে। এখন অবশ্য মুখে ঝুপো ঝুপো দাড়ি গোঁফ। চুলও কালে ভদ্রে আঁচড়ায়। তবু জমিদার রক্ত। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের মাঝে মনটা এখনো শিশুর মত। পুরনো জমিদারীর দেমাক নেই বলে গ্রামের লোকজনও বেশ ভালবাসে তাকে। পিতা মাতা গত হয়েছেন সেই বছর দশেক হল। তারপর থেকে তার চাকর কাম অভিভাবক কাম বন্ধু দাশু তাকে আগলে রেখেছে। দাশু নামটা অবশ্য অবলাকান্তরই দেওয়া। অবলার থেকে খানিক ছোটই হবে বয়েসে। কিন্তু টুকটাক রান্না বান্না আর ঘরের কাজে বেশ চৌকস। নেশা বলতে একখানা বাঁশের বাঁশি বাজানো। তায় আবার সে সাধারণত বাজায় না। যখন তখন একলা নির্জনে চলে যায় বাজাতে। অবসর সময় দুজনে মিলে একটা পুরনো রেডিও শোনে। কখনো সখনো অবলা দাশুকে গল্প উপন্যাস পড়ে শোনায়। অবলাকান্তর সখ গোয়েন্দা গল্পের দিকে। ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কিরীটী ইত্যাদি হজম করে নিজেকেই পুরোদস্তুর গোয়েন্দা ভাবে সে। গোয়েন্দা হতে গেলে আবার একজন সহকারী ভীষণ জরুরি। তাই দাশুকেই মাঝে মাঝে সহকারী বানিয়ে বোলচাল ঝাড়ে অবলাকান্ত। দাশুও সেয়ানা ছেলে। জানে বাবু খেয়ালখুশি মত চলেন। চাইলে কামড়েও দিতে পারেন। তাই বেশি না ঘাঁটিয়ে চুপচাপ দেখে যায়। গল্প শুনে শুনে গোয়েন্দাগিরিতে তার বিদ্যাও নেহাত কম নয়। অবলাকান্ত একশো হলে দাশু পঞ্চাশ তো বটেই। তবে গ্রামে আর গোয়েন্দাগিরির উপযুক্ত ঘটনা কটা ঘটে ! এলাকায় ঝাল না থাকলেও হাল ছাড়ে না অবলাকান্ত। এ কাজে তার হাতেখড়ি অবশ্য হয়েই গেছে। রাধু পাকড়াশীর নস্যির ডিবে খুঁজে দেওয়া। গ্রামের হিসেবে স্মরণীয় ঘটনা তো বটেই।

গত শীতকালের কথা। পাকড়াশী মশাই বাড়ির উঠোনে মাদুর পেতে আদুর গায়ে রোদে পিঠ দিয়ে দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। মাদুরের একপাশেই রাখা ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী নস্যির ডিবেটি। দুষ্টু লোকে বলে ওই ডিবেটি নাকি রাধুবাবুর কাছে নিজের স্ত্রীর থেকেও বেশি প্রিয়। তা সেটাই যখন ভর দুপুরবেলায় নিমেষে বেপাত্তা হয়ে যায় তখন সেটা রহস্যজনক তো বটেই। নাওয়া খাওয়া এমনকি দুপুরের প্রিয় দিবানিদ্রার অলসতাটুকুও ত্যাগ করলেন তিনি। আবির্ভাব হল অবলাকান্তর। আশেপাশের অনেকের অনেকরকম জবানবন্দী নিয়েও অপরাধীর এই তুচ্ছ ডিবেটা নিয়ে মাথাব্যথার কারণ খুঁজে পায় নি সে। পাকড়াশী গিন্নী তো ঝাঁটা নিয়ে তাড়াও করেছিলেন। সব প্রতিবন্ধকতা টপকে শেষে দাশুর পরামর্শেই খুঁজে দিতে পেরেছিল সেটা। সামনের গাছের একটা ফিঙ্গেপাখীকে ঠোঁটে করে খড়কুটো পোকামাকড় নিয়ে যেতে দেখে জানায় তাকে দাশু আর তৎক্ষণাৎ আসামীকে চিহ্নিত করে অবলাকান্ত। শুধু সেটা উদ্ধার করতে পুরনো ছাতিম গাছটায় হ্যাঁচড় প্যাঁচড় করে উঠতে হয়েছিলো এবং আসামী ফিঙ্গে পাখীর বেশ কিছু ঠোক্কর বেমালুম হজম করতে হয়েছিলো। খানিকটা পাঞ্জাবী গাছের ডালে এবং গাছের গুঁড়ির শরীরে রেখে এসে বিজয়ীর মত যখন ডিবে নিয়ে নেমেছে তখন গাছের নীচে সারা গ্রামের ভিড় জমে গেছে। কেসটার ফয়সালা করেছিল সে কিন্তু তাকে ওই নাজেহাল অবস্থায় দেখে আকাশবাণী ক্লাবের ছেলেরা নাম দিয়েছিল ক্যাবলাকান্ত। আড়ালে আবডালে তার সেই নাম বহাল তবিয়তেই বজায় আছে।

দ্বিতীয় পর্ব

কাঁসার গ্লাসে করে পেল্লায় এক গ্লাস ছাতুর ঘোল খেয়ে এক টুকরো পাটালী গুড় চুষতে চুষতে অবলাকান্ত কালো দীঘির দিকে এগোল। কালো দীঘি বলবার কারণ জলের রঙটা। গ্রামের পুকুরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আর বড় মাছ এখানেই পাওয়া যায়। তবে একটাও নেওয়ার জো নেই কারো। কারণ এটার মালিক মুখুজ্জেরা। এককালের অভিজাত বাড়ি। এখনকার ঝরতি পড়তি অবস্থায় কিছু ফলের বাগান আর এই দীঘিটা ভাড়া দিয়েই তাদের চলে। তাছাড়া নগেন মুখুজ্জের কৃপণ আর ঝগড়ুটে বলে দুর্নাম আছে। তাই সামনে মাছ ঘাই মারছে দেখলেও কেউ ধরবার সাহস করে না।

অবলাকান্ত দূর থেকে দেখল কেউ একজন দীঘির ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনে আসতেই চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে এলো। বটকেষ্ট হালদার। এ অঞ্চলের নামকরা সাঁতারু ছিলেন। পাঁচটা গায়ের লোক একডাকে বটু সাঁতারুর নাম জানত। তার সাথে ডুব সাঁতারে বা চিত সাঁতারে পাল্লা দেওয়ার মত সাহসী কেউ ছিল না ত্রিসীমানায়। এখন বয়েস হয়েছে সত্তরখানেক। তাই খিটখিটে হয়েছেন। মাঝে মাঝে মাথা বিগড়ে গিয়ে একটু আধটু পাগলামোও করে ফেলেন। বটকেষ্টর সবচেয়ে পেয়ারের ছিল এই কালোদীঘি। সাঁতারের বয়েস চলে গেছে। কিন্তু নিয়মিত হাজিরা দেওয়ার অভ্যাসটা যায় নি। প্রায় রোজই বুড়োকে দেখা যায় দীঘির জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে। কিন্তু কি খুঁজছেন বটু সাঁতারু এই বিকেলে? একটু পরেই তো দিনের আলো মরে যাবে; ভাবে অবলাকান্ত। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বুড়োর সামনে এসে একটা গলা খাঁকারি দেয়। বটকেষ্ট তার দিকে এক পলক তাকিয়ে নাক দিয়ে একটা ফুত করে শব্দ করে আবার ছড়ি দিয়ে পাড়ের গাছপালাগুলো একমনে নাড়তে থাকেন। বেগতিক দেখে অবলাকান্ত মরিয়া হয়ে গেলো। এমনিতেই পেশাদার গোয়েন্দাদের নাক গলানোর স্বভাব মজ্জাগত। কিছু খুঁজছেন জ্যাঠামশাই? জবাবে বটকেষ্ট মুখ হাঁ করতেই এক ঝলক বাতাস বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফোকলা মাড়িটা দেখতে পেলো অবলাকান্ত। তারপর অস্পষ্ট শব্দের মিছিল থেকে সার কথাটুকু উদ্ধার করা গেলো। বটকেষ্ট রোজকার অভ্যাস মতই দীঘির ধারে বসে পা দোলাচ্ছিলেন। ছোট ছোট মাছ এসে পায়ে ঠুকরে যায়। ওতে নাকি তার ভারি আমোদ হয়। এমনই এক মোলায়েম মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে মুখ থেকে বাঁধানো দাঁতের একটা পাটি খুলে মাড়িটা একটু খেলাচ্ছিলেন। ডাক্তার বলে দিয়েছিল মাঝে মাঝে খুলে রাখতে। এমন সময় একখানা ঘোড়েল মাছ... বটকেষ্টর আন্দাজমত সিঙ্গি জাতীয় একটা ধেড়ে কেউ পায়ে জোরদার খোঁচা দিয়ে যায় এবং হাত থেকে তার সাধের দাঁতের পাটিখানি জলে পড়ে যায়।

অবলাকান্ত মন দিয়ে শুনতে শুনতে দাড়ি থেকে একটা জংলি পোকা খুঁজে বের করে দীঘির জলেই ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর চোখ থেকে চুলের গোছাটা সরিয়ে নিয়ে বলল তাহলে পাড়ে খুঁজছেন যে বড়। পড়েছে তো জলে। দাঁত হারানোর শকে বট কেষ্টর পাগলামো তা চাগাড় দিয়েছে মনে হল। খিঁচিয়ে উঠলেন। আমার ইচ্ছে আমি যেখানে খুশি খুঁজব। এখন কি আর জলে নেমে খোঁজার বয়েস আছে আমার? কত বয়েস তোর? জল নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এয়েছিস? বুড়োর ধরন ধারন দেখে আর বেশি ঘাঁটানো সমীচীন মনে করল না অবলাকান্ত। কথার প্যাঁচেই আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করল যেন। হ্যাঁ। যা হাওয়ার তোড়। ঢেউ পাড়ে এনে ফেলতেই পারে। জানেন তো জ্যাঠামশাই, জল সব কিছু ফিরিয়ে দেয়। মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে অথবা

অবলার যুক্তিতে খুশি হয়েই বটকেষ্ট ছড়িটা তুলে দেখালেন। এই ইশারাটুকুই যথেষ্ট। বটকেষ্টর ছড়িকে ভয় পায় না এমন কুকুরও বোধহয় হিজলগঞ্জে নেই। অবলাকান্ত পিছু হটে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে ফিরল। কিন্তু মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেলো। বুড়ো মানুষ। এই দাঁতের পাটিই তাঁর গর্ব ছিল। ছেলে গড়িয়ে দিয়েছিল কলকাতার কোন নামকরা দোকান থেকে। যাই হোক। ফোকলা বুড়োর জন্য কষ্ট হলেও তার তো কিছু করার নেই। গ্রামে বড় হলেও এই ইস্তক জলে তার ভীষণ ভয়। তাছাড়া কালোদীঘিতে জাল ফেলাতেও মুখুজ্জেদের বারণ আছে। একটু দূরের ঘাসগুলো মরা আলোতে কালো কালো ঠেকছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো গোধূলির শেষ আলোতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে হাঁটা একটা নুয়ে পড়া বৃদ্ধের শরীর...।

তৃতীয় পর্ব

পরদিন সকালে উঠে রেডিওতে খান দুই পুরাতনী আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়ল অবলাকান্ত। তার বাড়ির বিশাল বাগানটা যেখানে ছিল যেখানে সেখানে এখন আগাছা এবং বিশাল বিশাল গাছ ভর্তি। দু'খানা সাদা পাথরের পরীর মূর্তি ছিল; তারা এখন মাটিতে ধরাশায়ী। গরমের সময় সাপের উপদ্রবে চলাই মুশকিল। দাশু এদিক ওদিক কিছু শাকপাতা লাগিয়েছে বটে, কিন্তু বিশেষ খোলতাই হয় নি। অবলাকান্ত বাগানের নিমের গাছ থেকে একটা জুতসই ডাল ভেঙ্গে দাঁতন করতে করতে ভাঙা পাঁচিলের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরল। এ সময়টা খুব মজা লাগে তার। ফুরফুরে হাওয়া বয়। সূর্যটাও নিজেকে উত্তাপ দেওয়া থেকে গুটিয়ে রাখে। দূর থেকে কুয়াশা ফিকে হয়ে আসতে থাকে। চোখের সামনে অন্য একটা পৃথিবী খুলে যায় যেন। গ্রামের মানুষ ভোরেই উঠে পড়ে ঘুম থেকে। তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কুশল বিনিময় হয়। এই তো কটা ঘর। সবাই সবাইকে চেনে। ওই যে দূরে নিবারণ সামন্ত আসছেন। বিচিত্র মানুষ। যৌবনে ইনি নাকি ভারি অলস ছিলেন। কুটোটি নাড়তেন না। বৌ ছেলে মেয়েদের হাড় মাস এক করে দিয়েছিলেন বলতে গেলে। মেয়েদের বিয়ে হল। বৌ মারা গেলো। ছেলেরাও কাজকম্ম নিয়ে অনেকদিন দূর দেশে থাকে। গ্রামে আসে না বড় একটা। একা থাকতে থাকতে কেমন একটা হয়ে গিয়েছিলেন যেন। কয়েক বছর আগে একদিন হঠাৎ সকালে উঠেই তাঁর মনে হয়েছিলো সারা জীবনটা শুয়ে বসে কাটিয়ে এসেছেন। এখন আর সময় নষ্ট না করে কিছু কাজ করা তাঁর কর্তব্য। তারপর থেকেই সক্কাল সক্কাল লোকের উপকার করবেন বলে বেরিয়ে পড়েন গ্রামে। কাজকর্ম করবেন কি, কোনদিন তো কিছু করতে শেখেন নি। ফলে রঙ্গটাই হয় বেশি। গ্রামের লোক তাঁকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে অথবা তামাশা দেখে। দূর থেকে তাঁকে একটা গেঁটে লাঠি হাতে হনহন করে আসতে দেখে অবলাকান্ত একটা গাছের গুঁড়ির পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

ক্লাবের ছেলেগুলো এই সকালেই বটতলার রোয়াকে বসে তাস পিটতে লেগেছে । বেশ উত্তেজনা। মনে হয় বাজি টাজি চলছে। কে যেন পাশ থেকেই 'ক্যাবলাকান্ত' বলে ডেকে সুট করে সরে গেলো। অবলাকান্ত জানে এসব কাদের কাজ। কিন্তু প্রমাণ নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ব্যাজার মুখে হাঁটা দিলো। পেছনে তখন হাসির জোয়ার। সে চলার গতিটা একটু বাড়াল সেটা বলাই বাহুল্য। জোরে জোরে হাঁটবার পর একটু জিরোবার জন্য দাঁড়ালো। দেখল সামনের পুকুরের পাড়ে একখানা ছাতার চাঁদোয়া বানিয়ে ছিপ ফেলে বসেছেন

ইন্দ্রকুমার। ইন্দ্রকুমারের আসল নাম গণেশ সাপুই। যাত্রাপালার হিরো হওয়ার পর থেকে ইন্দ্রকুমার নামটা বোম্বের কোন এক হিরোর থেকে ঝেপেছিলেন। লম্বা লম্বা কেয়ারী চুল। ত্বকের যত্ন হয় বোঝাই যায়। এখন বয়েস পঞ্চাশের ওপর। তাই হিরো হতে এখন কেউ আর ডাকে টাকে না। তারও জিদ হিরো না হলে তিনি পার্ট করবেন না। তিনি বলেন – বাবা কাকার রোল করার জন্য যাত্রার সুপারস্টার ইন্দ্রকুমারের জন্ম হয় নি। তাই সারাদিনটা পুকুরের জলে ছিপ ফেলেই কেটে যায়। সাঙ্ঘাতিক নেশা। তিনি নিরামিষাশী। শুধু ধরাতেই তাঁর আনন্দ। তাই মাছ ধরে ধরে ফের পুকুরেই ছেড়ে দেন। ভোররাত থেকেই একটা পুকুর বেছে ছিপ ফেলে বসে থাকেন ধ্যানগ্রস্ত ঋষির মত। এ সময় কথা বলতে গেলে খুব জোর হুঁ হাঁ বেরোয় তাঁর মুখ দিয়ে। অবলাকান্ত গলা বাড়িয়ে দেখল ইন্দ্রকুমার চ্যাপ্টা মত কি একটা মাছ বড়শি থেকে খুলে ছুঁড়ে দিলেন। এই জীবনদান করবার সময় তার চোখটা যেন একটু চকচক করে উঠল। আবার যে কে সেই। অবলাকান্ত তাকে বিরক্ত না করে আবার পথে নেমে এলো। পা ফেললেই ধুলো উড়ছে। তার ওপর পাশ দিয়ে একদল গরু লাফাতে লাফাতে চলে গেলো। ধুলোর ঝড় বয়ে গেলো যেন। সূর্য অনেক পরিষ্কার। আঁচ লাগছে রোদের। আলোয়ানটা হাতে তুলে নিলো অবলাকান্ত। দু দিকের চাষের জমিগুলোতে ব্যস্ত চাষিদের ভিড়। ফসল কাটার সময় এটা। তেড়েফুঁড়ে কাজ না করলে শীতের আলিস্যি কাটবে না। কয়েকটা শিশু মাঠের মধ্যে একটা রবারের পুরনো বল লাথিয়ে যাচ্ছে। মন দিয়ে খেলা দেখছিল অবলাকান্ত। এমন সময় দেখল হারান কবিরাজ আসছেন। এই হিজলগঞ্জের সবেধন নীলমণি চিকিৎসক বলতে তিনিই। তাঁর পিতার ছিল বিশাল খ্যাতি । রাজা মহারাজারা পালকি পাঠিয়ে খাতির করে তুলে নিয়ে যেতেন তাঁকে। সেই পঞ্চানন ধন্বন্তরির ছেলেই হারান কবিরাজ। এঁরও হাতযশ মন্দ নয়। তবে অনেকের মতে হারান কবিরাজ মৃত মানুষকে যেমন জাগিয়ে দিতে পারেন তেমনি সর্দি গর্মির রুগীকেও শ্মশানে পাঠাতে তাঁর জুড়ি নেই। মাঝে একটা প্যান্ট শার্ট ছোকরা হোমিওপ্যাথির আসর বসানোর তালে ছিল। জমাতে না পেরে কেটে পড়েছে। হারান কবিরাজ কি একটা ভীষণ চিন্তা করতে করতে পথ হাঁটছিলেন। হাতের মুঠোতে কয়েকটা লতা পাতা আর শেকড় বাকড়। বোধহয় আরও খুঁজতে এদিক ওদিক চললেন। কথা বলার লোক পেয়ে অবলাকান্ত তাঁকে দেখে ভারি খুশি হলেও তিনি অন্যমনস্কভাবেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই থমকে গেলেন।

-"আরে অবলা যে। আর বোলনা ভাই। মন ভালো নেই।" কেন ভালো নেই সেটা শুনবে বলে অবলাকান্ত পথ আটকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে। উপায় না দেখে কবিরাজ মশাই মুখ খুললেন – "ক্ষেন্তির, মানে তোমার গিন্নিমার, মানে ইয়ে আমারও একটা কচি ছাগল ছিল বুঝলে। যাকে বলে ছাগলছানা। আদর করে নাম রেখেছিল চাঁদনী। কপালে চাঁদের মত একটা সাদা টিপও ছিল বৈকি। সেই চাঁদনী কাল সন্ধ্যে থেকে বেপাত্তা। কেউ গলার দড়ি খুলে চুরি করে নিয়ে গেছে। সঙ্গে বারান্দা থেকে বড় একগাছি দড়িও নিয়ে গেছে।"

-"আমাদের গাঁয়ে চোর! বলেন কি কবিরাজ মশাই!" বিস্মিত হয় অবলাকান্ত। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার সময় চ্যাঁচাল না? অকারণে ডেকে ওঠাটা ছাগলদের মজ্জাগত। এটা তার খুব জানা আছে।

-"কি করে ডাকবে বল। জীবটার গলায় ভগবান আওয়াজ দিতেই ভুলে গেছেন।"

জিভ দিয়ে একটা চুক চুক করে শব্দ করল অবলাকান্ত। হারান কবিরাজ বললেন – "না হলে আর বলছি কি। আমাদের তো আর ছেলেপুলে নেই। আমার ক্ষেন্তি ওই ছাগলছানাটাকেই ছেলের মত আদর যত্ন করত। ওটাও ভারি ন্যাওটা ছিল তোমার গিন্নিমার..." বলে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর মাথাটা নিচু করে পাশ

কাটিয়ে হাঁটা দিলেন। অবলাকান্ত হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো এক জায়গায়। সে ভেবে পাচ্ছিল না কিছু। বহুদিন পরে একটা চুরির কথা শুনল। একসময় চোর ছিল বটে তাদের গাঁয়ে। পবন মিস্ত্রী । পবনের মতই যাওয়া আসা করত সে। হাতের কাজ আর গলার কাজ ও নাকি দেখার মত ছিল। যার তার গলার স্বর ইচ্ছেমত নকল করতে পারত। অবলা না দেখলেও গল্প আছে সে নাকি এক গামলা দুধের ওপর থেকে পুরো সর তুলে আনতে পারত। কিন্তু দুধে একটুও ঢেউ খেলত না। কিন্তু সেই মহাত্মা শহরে গিয়ে এক পুলিশের পকেট মেরে এখন যাবজ্জীবনে। তাছাড়া পবন ওস্তাদ নিজের গাঁয়ের ঘর দোর সাফ করতেন না মোটেও। গ্রামে তার একটা সম্মান ছিল গুণীজন হিসেবে। তাহলে কি অন্য গাঁয়ের চোর? একটা ছুটন্ত সাইকেলের বেলে ভড়কে রাস্তা থেকে নেমে দাঁড়ালো অবলাকান্ত। দেখল সামনে কয়েকটা শেকড়বাকড় পথের ধুলোতে পড়ে রয়েছে। অন্যমনস্কভাবে কবিরাজ মশাই ফেলে গেছেন নিশ্চয়ই। পরে ফেরত দেবে মনে করে ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে নিলো সেগুলো।

চতুর্থ পর্ব

এতক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকায় শীত শীত লাগছে। আলোয়ানটা ভালো করে জড়িয়ে সামনের টিউবকলে মুখটা ভালো করে ধুয়ে নিলো। জলের ছোঁয়া লেগে আবার ঝরঝরে ভাবটা ফিরে এসেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে পরপর বেশ কয়েকটা হাঁচিও দিলো সঙ্গে। মাথায় ছাগল চুরির ব্যাপারটা বিজবিজ করছে। কিন্তু তদন্ত করতে ইচ্ছে হলেও কান্নাকাটির মধ্যে কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে করল না তার। তার চেয়ে একটু ঘুরে গেলে পুরো গ্রামটা ঘুরে দেখা হয়ে যাবে। গ্রামের পশ্চিম সীমানায় মোক্ষদা বুড়ির ঘর। সেদিক দিয়ে যেতে যেতে বুড়ির চালাঘরটা চোখে পড়ল। টালির চালটা একেবারে সবুজ হয়ে আছে। সামনে একটা কামরাঙ্গা গাছ ছিল। ছোটবেলায় কত পেড়ে পেড়ে খেয়েছে। কৌতূহলে পায়ে পায়ে কাছে গেলো। লতানে শাক-সবজির বাহার। চালের ওপর বেশ কিছু চালকুমড়ো আর লাউ ফলে রয়েছে। উঠোনেও কত রকম গাছ, সবগুলোর নামও জানে না সে। একটা বাঁশের কঞ্চির খাঁচায় প্রচুর সিম ফলে রয়েছে। ভালো লাগছিল দেখতে। মোক্ষদাবুড়ি একাই থাকে। ছেলে যুবক হয়ে সেই যে বাষট্টির যুদ্ধে নাম লেখাতে গিয়েছিলো, আর ফেরে নি। তার কি হয়েছে সবাই বুঝলেও বুড়ি এখনো ছেলের আশায় বসে রয়েছে। কিভাবে এতো আশা জন্মায় কে জানে? অবলাকান্ত এসব ভাবতে ভাবতেই একটা মসৃণ লাউডগায় হাত বুলচ্ছিল। হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা তীব্র যন্ত্রণায় ছিটকে পড়ে গেলো মাটিতে । লাঠি হাতে রণাঙ্গিনী মূর্তি নিয়ে মোক্ষদাবুড়িকে দেখে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার উপক্রম। বুড়ির গলায় ফুল ফুটছে তখন। ড্যাকরা ছোঁড়ার দল। হাড় গোড় সব জ্বালিয়ে খেলি। চ্যালা কাঠে ভূত পালায় । আজ দিচ্ছি তোদের মুড়ো গুঁড়ো করে...

অবলাকান্ত প্রায় মাটিতে শুয়ে কোনমতে হাত জোড় করে বলে – "বুড়িমা আমি অবলা। তোমাদের অবলাকান্ত।" বুড়ির লাঠিটা আকাশে থেমে যায়। চোখ দুটো একটু পিটপিট করে দুটো ফোকলা দাঁত বেরিয়ে আসে। হাসতে দেখে স্বস্তি পায় অবলাকান্ত।

-"অ বাবা। এখন চোখে ভালো দেখিনা তো। তুই আমাদের কত্তার ছেলে অবলা না?"

অবলাকান্ত মাথা নাড়ে। বুড়িকে দেখে মনে হল একটু আগের ঘটনাটা সে বেমালুম ভুলে গেছে।

-"এতো বড় দাওয়া থাকতে মাটিতে শুয়ে রয়েছিস কেন লা। তুই তো আমাদের নাতির মত। আয় দুটো নাড়ু খেয়ে যা বাপ।"

অবাক হলেও "পেটে খেলে পিঠে সয়" কথাটা স্মরণ করে সে বুড়ির পেছন পেছন গিয়ে দরজায় দাঁড়ায়। খানিক পরে অবলাকান্ত আর মোক্ষদা বুড়িকে দেখা গেলো ঝকঝকে গোবর লেপা দাওয়ায় একখানা মাদুরের ওপর বসে থাকতে। এনামেলের বাটিতে খানিকটা মুড়ি নিয়ে সাথে কচকচ করে নাড়ু চেবাচ্ছে অবলাকান্ত আর বুড়ি ভারি খুশি হয়ে হাসিমুখে সে দৃশ্য দেখছে। গলায় আটকাতে চোঁ চোঁ করে এক গ্লাস জল সাবাড় করে অবলাকান্ত বলল

-"তারপর বুড়ি মা? সকালে উঠে দেখি তিন তিনটে কচি লাউ চালের থেকে কোন হারামজাদা তুলে নিয়ে গেছে। দেখেছিলে কাউকে রাতে এদিকে আসতে যেতে?"

-"দেখেছি মানে? আমি তো রাত জেগেই থাকি। রাত বিরেতে নরেনটা এসে পড়লে চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দিতে হবে না!"

নরেন বুড়ির ছেলের নাম। অবলা একটু ধৈর্যহারা হয়। বলে "আরে দেখেছো কি কাউকে চুরি করতে?"

-"আ মোলো। এই বয়েসে অত শত মনে থাকে নাকি? তা দেখতাম বটে অন্ধকার হলেই একটা লম্বামত খাড়াচুলো ছেলেকে এদিকে ঘুরঘুর করতে। আজ তোকে দেখে ভাবলাম ওই ছোঁড়াটাই এসেছে বুঝি দল বেঁধে।"

কাঁধে হাত বুলোতে বুলোতে অবলাকান্ত ভাবতে লাগলো। বুড়ির থেকে উত্তরের সঙ্গে আরও এক রাশ প্রশ্ন জোগাড় হল। লম্বামত আর খাড়া চুল বলতে তো এই গ্রামে কেষ্টা। কেষ্টা হল ক্লাবের ছেলেদের লিডার। একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে যেন। মেলাতে চেষ্টা করল, একে একে দুই আর দুইয়ে দুইয়ে চার হয় কিনা। কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ি থেকে ছাগলছানা আর মোক্ষদা বুড়ির বাড়ি থেকে লাউ চুরির অর্থ হল অদূর ভবিষ্যতে একটা ফিস্ট বা পিকনিক হতে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা সত্যি কিনা বোঝা যায় কি করে ? তুখোড় ভাবে মাথা খাটাতে লাগলো অবলাকান্ত। হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কভাবেই পকেটে রাখা কবিরাজ মশাইয়ের একখানা শেকড়ের টুকরো মুখে দিয়ে ফেলেছিল। সে এককালের জমিদারের বংশধর হলেও গ্রামেরই মানুষ। আর অসুস্থ থাকার দরুন ছোট থেকেই নিমপাতা বাটা থেকে শুরু করে অনেক পাঁচন তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাখতে এবং গিলতে হয়েছে। কিন্তু এই শেকড়টায় এক কামড় দিয়ে মনে হল মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। মুখের ভেতরে আর গলায় কে যেন বেলচা করে এক খাবলা জ্বলন্ত তিতকুটে কয়লা ঢেলে দিয়েছে। ভাগ্যিস চিবিয়ে টিবিয়ে ফেলে নি। তাহলে তো হয়েই গিয়েছিলো। সামনের পুকুর থেকে ঢক ঢক করে আঁজলা ভরে জল পান করে যখন থামল, পেটে এক ফোঁটাও জায়গা অবশিষ্ট নেই। ঝিমিয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর উঠে হাঁটতে গিয়েই মনে হল ক্লান্তিটা অনেক কম লাগছে আর মাথাটাও বেশ চনমনে ঠেকছে। কেমন যেন কিছু একটা করতে, লাফাতে, দৌড়তে ইচ্ছে করছে। সে ঠিক করল বাড়ি পৌঁছেই দাশুটাকেও শেকড়টা এক কামড় খাইয়ে দুজনে মিলে একদফা দৌড়তে বেরবে। শুরুটা অবলাকান্ত তক্ষুনি করেই ফেলল। ছুটতে শুরু করল দুলকি চালে।

পঞ্চম পর্ব

মাঠ ঘাট সব পেরিয়ে যাচ্ছে দুপাশে। দৌড়নোর আনন্দে খেয়ালই করে নি যে পুরনো কালীমন্দিরের কাছে চলে এসেছে। সামনেই কাপালিক কালিধরের ডেরা। অদ্ভুত কিছু উচ্চারণ কানে আসতে এগিয়ে গেলো। মন্দিরের

পাশের ভাঙা দেওয়ালের গায়ে একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ রয়েছে। তার একটা ঝুরি প্রায় জাপটে ধরে আড়াল থেকে দেখতে লাগলো। একটা সস্তা ফুটিফাটা ছাপানো ব্যাঘ্রচর্মের আসনে কালিধর কাপালিক বসে রয়েছে ধুনি জ্বালিয়ে। যজ্ঞ মতন কি একটা যেন হচ্ছে। সামনে একটা খুলি তোবড়ানো নরকঙ্কালের মাথা। সেদিকে তাকাতে বুকটা একটু ছাঁৎ করে উঠল যেন। তবে সেই ভয়টা খুব তাড়াতাড়িই সামলে নিতে পারলো। পাশে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন কবিরাজ মশাইয়ের সহধর্মিণী ক্ষেন্তিমণি। চোখে জল। তার কাজের ঝি চণ্ডীবালা সঙ্গে এসেছে তবে একখানা বড়সড় গাছের ডাল দিয়ে মন্দিরের সামনেটা ঝাঁট দিতে লেগেছে। চণ্ডীবালার সবকিছু পরিষ্কার রাখবার বাতিক আছে। কোথাও একটুও আবর্জনা সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া চল্লিশ বছরের অভ্যাস। কাপালিকের কাছে এসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ডুরে শাড়িটা গাছ কোমর করে বেঁধে নিবিষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে বিড়বিড় করে ছাগল চোরের বাপ বাপান্ত করছে। কবিরাজ গিন্নীর চোখ কিন্তু পড়ে আছে ধুনির আগুনের দিকে। কালিধর একটু একটু দুলছে আর গোল গোল করে জব্বর মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তারপর অনেকক্ষণ হিং ক্রিং ইত্যাদি করে খালি হাতেই আগুনের একধার থেকে একচিমটে ছাই তুলে নিয়ে বাতাসে ছেড়ে দিলো। মুহূর্তে সেটা উড়ে গেলো। সেদিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে কালিধর চ্যাঁচাতে লাগলো – "পুবদিকে পুবদিকে। মা তোর আদরের ধন আছে পুব দিকে যেখানে সূর্য্যি ঢোকে না।" বলতে বলতে হেঁড়ে গলায় একখানা শ্যামাসংগীত গেয়ে উঠল এবং গাইতে গাইতেই ভেতরে চলে গেলো। কবিরাজ গিন্নী খানিকক্ষণ ওভাবেই বসে থেকে চোখ মুছে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। জায়গাটার হাল ফিরিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চণ্ডীবালাও তার সঙ্গ নিল।

এই কালি কাপালিকেরও একটা ইতিহাস রয়েছে। আর সেটা অবলাকান্তর থেকে ভালো আর কেউ জানে না। কারণ ছেলেবেলায় দুজনে একই স্কুলে এবং একই ক্লাসে পড়েছে। ভালো বন্ধুত্বও ছিল বলা যায়। কালির পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল ষোল আনা। চেষ্টাও কম করত না। কিন্তু অঙ্ক বিষয়টা কিছুতেই তার নিরেট মাথায় ঢোকেনি। অঙ্কের মাস্টার পাঁচুগোপাল বাবুর কাছে মারও খেত বিস্তর। একদিন ক্লাস ফোরে সাতের নামতা না বলতে পাড়ায় পাঁচুগোপাল বাবু তাকে বেধড়ক মারেন। সেদিনই পড়ার বই রাখবার টিনের বাক্সটুকু সম্বল করে ঘর ছেড়ে বিবাগী হয় কালি। তারপর তার আবির্ভাব হয় পাক্কা একত্রিশ বছর পরে। পরনে লাল চেলিবস্ত্র, মাথায় ছোপানো রক্ত চন্দনের তিলক, মুখ ভর্তি ছন্নছাড়া দাড়ি গোঁফ। রটে যায় গায়ের কালি হিমালয় থেকে দীক্ষা নিয়ে এসে কালিধর কাপালিক হয়ে এসেছে। এমনকি কয়েকজন মায়ের মূর্তির সঙ্গে তাকে কথা বলতেও দেখেছে। তারপর থেকে সে পুরনো কালীমন্দিরের এককোণে ডেরা বেঁধেছে। গ্রামের লোক মান্যি-গণ্যি করে, ভয়ও পায়। তাই মাঝে মাঝে এর ওর ক্ষেত পুকুর থেকে কলাটা মুলোটা ভেট হিসেবে জুটেই যায়। আজ যেমন কবিরাজ গিন্নীর নিয়ে আসা একটা মাঝারি মাপের বাঁশের ঝুড়ি থেকে কিছু সবুজ সবজি উঁকি দিচ্ছে। শেকড়ে কামড় দেওয়ার পর থেকেই সাহসটা খানিক বেশি আর বুকটা অনেক চওড়া লাগছে অবলাকান্তর। কাপালিক বলে এতদিন কাছে আসবার সাহস পেতো না। কিন্তু আজ তার ইচ্ছে হল ভেতরে তার ছেলেবেলার বন্ধু কি করছে সেটা দেখবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মন্দিরটার পেছন দিকে ভাঙা ইটের স্তূপ বেয়ে তরতর করে উঠে গেলো অবলাকান্ত। কয়েকটা খসে যাওয়া ইটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি মারল। পায়ে বিছুটি জাতীয় কিছু লাগায় বড্ড কুটকুট করছে। পরোয়া করল না অবলাকান্ত। ভেতরে একটা উনুন জ্বলছে। মনে হয় ভাত টাত কিছু সেদ্ধ হচ্ছে একটা তোবড়ানো ডেকচিতে। কালিধর ঘরে ঢুকল। আবার বেরিয়ে কবিরাজ গিন্নীর আনা

জিনিসপত্রগুলো একে একে তুলে এনে ভেতরে রাখল। তারপরের দৃশ্যটুকু দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল না অবলাকান্ত। দেখল কালিধর একটা জীর্ণ পুঁটুলির মধ্যে থেকে ততোধিক জীর্ণ কিছু ছেঁড়াখোঁড়া বই বের করে আনল। চিনতে পারলো অবলাকান্ত। সেই বইগুলো, যেগুলো সঙ্গে নিয়েই কালি বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। এখনকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ কাপালিক কালিধর সেই বইগুলো জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। চোখে কাজল জাতীয় কিছু ছিল সেগুলো থেবড়ে একশা। চুলকুনির জ্বালায় নেমে এলো অবলাকান্ত। ভাবল সেই ছেলেবেলার অঙ্ক না শেখার দুঃখ তাহলে কালি এখনো ভুলতে পারে নি। ঠিক করে ফেলল কালিকে পরে কখনো নিয়ম করে এসে অঙ্ক শিখিয়ে যাবে। বাল্যবন্ধুকে এভাবে দেখে আবার মনটা ভারি হল অবলাকান্তর। এই মনের ফাঁদে পড়েই ছোটবেলা থেকে তার আর কিছু করে ওঠা হল না। তার মনটা যেন কেমন হাওয়া দেওয়া বেলুনের মত। কখনো এদিক ওড়ে, কখনো ওদিক। আবার কখনো চুপসে যায় ইচ্ছে মত। স্থায়ী হয়ে একটা কিছু ভাববে সেটা কি আর হওয়ার জো আছে।

হঠাৎ বিশেকে দেখে সাঁৎ করে আড়ালে চলে গেলো অবলাকান্ত। ছোটবেলায় প্রচুর লুকোচুরি খেলেছে, এখন সেই বিদ্যে কাজে লাগছে। গোয়েন্দাগিরির ম্যানুয়ালে এই খেলাটা বাধ্যতামূলক রাখা উচিৎ বলে বোধ হল তার। তারপর আড়াল রেখেই অনুসরণ করতে লাগলো।

ষষ্ঠ পর্ব

এই বিশে কেষ্টার ডান হাত। ভালো ফুটবল খেলত; এখন তাস পেটা ছাড়া কিছুই করে না। কালীমন্দিরের থেকে খানিকটা দূরে শ্মশানের সীমানা যেখানে শুরু হয়েছে সেখানেই ওদের আড্ডার ঠেকে এসে পৌঁছেছে বিশে। কেষ্টা ছাড়াও জনা চারেক উঠতি ছোকরা সেখানে উপস্থিত। শেকড়ের দৌলতে কানটা দিব্বি কাজ করছে। কিন্তু ওরাও ভীষণ ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। এতো গোপনীয়তা কিসের ভাবে অবলাকান্ত। তবে "পিকনিক" আর "রাত" কথাটা কানে এলো বেশ কয়েকবার। তাহলে তার আশঙ্কাই সত্যি। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই যে এরাই চোর। লোপাট করে গোপনে কোথাও চোরাই মাল রাখা আছে তাহলে। কিন্তু "রাত" কথাটা এতবার শুনেও তার বোধগম্য হল না। গ্রামের রাত বলতে তো খুবজোর সন্ধ্যে সাতটা। তারপর রাত কি বা কেন সেটা কেউ বেরিয়ে দেখতে যায় না। তাছাড়া রাত বাড়লে তেনারাও বেরোন শুনেছে সে। এত গাছগাছালি আর জলাশয়। দু চারটে বেহ্মদত্তি আর মেছো ভূত থাকাটা একটুও অসম্ভব নয়। ভূত না দেখলেও ভুতে ভারি ভয় অবলাকান্তর। এসব ভাবতে গিয়েই সর্দিটা আরও চেপে ধরল। জোরে একটা হ্যাঁচ্চো দিতে গিয়েও সেটা চেপে রেখে ধীরে ধীরে পালিয়ে এলো সে।

ততক্ষনে বেলা দ্বিপ্রহর। বুড়ির বাড়িতে পেট পুরে মুড়ি আর নাড়ু খেয়ে এসে এখনো অবলাকান্তর পেট বেশ শান্ত। ফেরার পথে দেখল যে গ্রামের সালিশি সভা বসেছে। গ্রামের মাথারা আর বয়োজ্যেষ্ঠরা সব আছেন। সে এসেছে তাতে কেউ তেমন গা করল না। অবলাকান্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো। বাজারের সবচেয়ে বড় মুদির দোকানের মালিক হারাধন শীল মধ্যমণি হয়ে আছেন। উপস্থিত বুদ্ধিতে একটু খাটো হলেও ব্যবসায় চৌকস। এসব সভায় কিছু বলার সুযোগ তিনি পারতপক্ষে হারান না। তিনি বলতে লাগলেন – "আমাদের হারান কে পাঁচ গায়ের লোক শ্রদ্ধা করে। তার ওপর আক্রোশ কার হতে পারে? তাছাড়া ওই ছাগল তো গ্রামের হাটে বিক্রি করাও যাবে

না। কেউ না কেউ দেখেই ফেলবে।" দু একজন মাথা নাড়ল। কিন্তু , অনেকদিন আগে দোকানে বাকি দেওয়া নিয়ে হারাধন শীল রাধু মুখুজ্জেকে বেশ দু কথা শুনিয়েছিল। তারপর থেকে রাধু মুখুজ্জে হারাধনের ওপর খাপ্পা। নস্যি নেওয়া শেষ করে টিপ্পনী কাটলেন – "রাগটা হারানের ওপর না হারানের ছাগলটার ওপর সেটা আগে ভাবো হে হারাধন। সারাদিন মুদির দোকান করে কি আর ভাবনার সময় পাওয়া যায়। চাল ডাল তেল নুনের হিসেব কষে আর জায়গা আছে মাথায়?" হারাধন শীল রেগে গেলেও ভঙ্গিতে প্রকাশ হতে দিলেন না। তবে খোঁচাটা বহাল রইলো।

-"আসলে সারাদিন নস্যি নিয়ে না ঘুমোলে তো ঠিক ভাবা যায় না। এই আর কি। কেউ খেটে খায়, কেউ নাকে তেল দিয়ে..." ঠাণ্ডা ঝগড়াটা জমাট বাঁধতে যাচ্ছিলো। এমন সময় ইন্দ্রকুমার দুহাত তুলে গম্ভীর কণ্ঠে একটা হুম করলেন। সবাই চুপ করে গেলো। হাতের ছিপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গলাটা যথাসম্ভব উচুতে তুলে বললেন – "সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের গাঁয়ে চুরি হয়েছে। পারিবারিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। এবার সেই চোর কে হাতেনাতে খুঁজে বের না করলেই নয়।" হারাধন বলে ফেললেন – "একদম তাই। তাহলে তো চোরকে আগে খুঁজে বের করতে হয়। তারপর সে যখন চুরি করবে..." রাধু মুখুজ্জে খুক খুক করে হাসলেন না কাশলেন বোঝা গেলো না। বটকেষ্ট পাশে হাঁ করে বোধ হয় মাড়িটাকেই আবার খেলাচ্ছিলেন। বললেন – "বলি ও নগেন, জাল ফেলে আমার দাঁতটা তুলে আনতে পারছ না তোমার দীঘি থেকে?" সবাই মন দিয়ে শুনলেও ফোকলা দাঁতের মধ্যে অবিরাম হাওয়ার আসা যাওয়াতে পুরোটা বুঝতে পারলো না। তবুও বন্ধুর মন রাখার জন্য নগেন মুখজ্জে তাকে সায় দিলেন – "তা ঠিকই বলেছ ভায়া। চোর ধরতে গেলে আগে সাঁতার জানা জরুরি।" বটকেষ্ট এবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন – "সাঁতার জেনে কি করবে তুমি কিপটে বামুন? আমার বাঁধানো দাঁতটা কবে জাল ফেলে তুলে দেবে সেটা জানতে চাই।" নগেন মুখুজ্জে এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন। তেড়েফুঁড়ে উঠলেন তিনিও – "হ্যাঁ তোমার একপাটি দাঁতের জন্য দীঘির সব মাছ তুলে ফেলি আর কি। ইয়ার্কি পেয়েছেন। কিপটে আমি। তুমি তো নও। সেটা ভেবেই খুশি থাকো না! কোন সত্যযুগে সাঁতরাতে। এখনো জলকেলির সখ গেলো না!" বটকেষ্ট ছড়ি বাগিয়ে এগোতে যাচ্ছিলেন। আবার ইন্দ্রকুমার এসে বাগড়া দিলেন।

-"বটকেষ্ট বাবু, অনেক মহত্তর উদ্দেশ্যর জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। আজ আমাদের গ্রামের ঘর থেকে ছাগল চুরি হয়েছে। কাল গরু চুরি হবে। পরশু ছেলে চুরি হবে। তরশু..." তাঁকেও থামতে হল। কারণ নিবারণ সামন্ত এসে গেছেন – "তরশু কি হবে জানি না। আমাদের আজ থেকেই পাহারা বসাতে হবে রাতে। না না সন্ধ্যা থেকেই। আর আপনাদের সুরক্ষার দায়িত্ব আমার। রোজ পুরো গ্রাম টহল দেবো। একটা মাছিও চোখ এড়িয়ে গ্রামে ঢুকতে পাবে না। চোর একজন আসুক বা এক ঝাঁক সবাই মিলে সামলে নেওয়া যাবে। মনে রাখবেন পৃথিবীর মানুষের জন্য কিছু করাতেই মহত্ত্ব। একলা বেঁচে থাকায় নয়..." একসাথে এতো কথা বলে কাশতে লাগলেন নিবারণ সামন্ত। কিন্তু ফেলে দেওয়ার মত কিছু বলেননি এটাও ঠিক। তবুও সবাই দোনামনা করতে লাগলো। এই শীতের রাতে বুড়ো বয়েসে পাহারা দিতে কারই বা ইচ্ছে করে। তবুও অবস্থার গুরুত্ব বুঝে নিবারণ মণ্ডলের ইচ্ছেরই জিত হল। স্থির হল আজ নয়, আগামীকাল থেকে সন্ধেবেলায় পালা করে পাহারা দেওয়া হাবে। মিটিং ভাঙল। সবাই বাড়ির পথ ধরল। কালোদীঘির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অবলাকান্ত দেখল বটকেষ্ট আগে বেরিয়ে এসে দীঘির জলে পা ডুবিয়ে বসে আছেন। অদ্ভুত মানুষ বটে।

সপ্তম পর্ব

বাড়ি এসে একটু চা খাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দাশু কোথাও নেই। এই ছেলেটা হঠাৎ হঠাৎ জলে জঙ্গলে বাঁশি বাজাতে গিয়ে উধাও হয়ে যায়। তাই মাঝে মাঝেই পাওয়া যায় না। তবে বাজায় যে বেশ সুরেলা এটা স্বীকার করে অবলাকান্ত। যেমন রাঁধে, তেমনি সুরের দমক। এক গ্লাস লাল চা বানিয়ে আধশোয়া হয়ে ভাবতে চেষ্টা করল অবলাকান্ত। গোয়েন্দারা ভাবনার সময় সিগারেট খান। সেও চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওসব খেতে তার একদম ভালো লাগে নি। তার চেয়ে জানালার বাইরে তাকালে মনটা স্বচ্ছ হয়ে যায়। সবকিছুর গভীরে দেখতে পায় যেন। সে ঠিক করে নিল আজ রাতটা জেগে থাকবে। যদি কিছু হয়। কাল থেকে তো পাহারা বসবে। সে কথা গ্রামে সবাই এতক্ষণে জেনে গেছে। তাই কিছু হলে সেটা আজকেই। দাশুকে দেখল দরজা ঠেলে উঁকি দিতে। কটমট করে তাকাতে মুখটা সরে গেল। অবলাকান্ত একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত জাগতে হবে। গ্রামে এখনো সব ঘরে ইলেকট্রিক নেই। লণ্ঠন জ্বলে। তাছাড়া রেড়ির তেলের সলতে ভেজানো প্রদীপ জ্বলে সন্ধ্যে হলেই। তাই পুরো গ্রামটায় রাত নামলেই অন্ধকার গিলে খেতে আসে। তবে আজ ভাগ্যটা ভালো। পূর্ণিমা ছিল গত পরশু। তাই খানিকটা আলো রেখে গেছে আকাশে। নিরীহ ছাগলটার কথা ভেবে খারাপ লাগছে অবলাকান্তর। মাংস তার অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এখন আর সে দিন তো নেই। কালেভদ্রে কারো বাড়ির নিমন্ত্রণ হলে জোটে আর কি। কিন্তু কবিরাজ মশাইয়ের আদরের চাঁদনী তার মাথায় ঘুরপাক খেয়েই চলেছে। ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যে থেকেই কানটাও বাজছে মনে হয়। থেকে থেকে চাঁদনির আওয়াজ যেন কানের পর্দায় আঘাত করছে। কিন্তু ছাগলটা তো বোবা। ডাক ছাড়ে না মোটেও। সত্যি অবলাকান্ত দিনে দিনে ক্যাবলাকান্তই হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাগুলো এভাবে কায়ামূর্তি ধারণ করতে পারে জানা ছিল না। কানের বারোটা বেজে গেছে একেবারে। সব মনের ভুল। দু কানে তুলো গোঁজে সে। তারপর দাড়ি আঁচড়ে জানালার ধারে গিয়ে বসে। এই জানালাটা থেকে গ্রামের অনেকটা দেখা যায়। অভ্যাস নেই তবুও প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করছিল অবলাকান্ত।

এভাবে বসে থাকতে থাকতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। দেওয়াল ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজলো। পুরো গ্রাম ঘুমিয়ে কাদা। হঠাৎ চটকা ভেঙ্গে জানালার বাইরে কয়েকটা আলো দেখতে পেলো অবলাকান্ত। আলোগুলো ঘুরছে কালদীঘির সামনে। কিছুক্ষণ ঠাহর করেও কিছু বুঝতে পারলো না। দাশুকে ডেকে কাজ নেই। হাঁক ডাক করে সব নষ্ট করে দেবে। খানিক সাহস জোগাড় করে রাম রাম বলতে বলতে একটা লাঠি নিয়ে রওয়ানা হল সেদিকে। গা ছমছম করছে। নাক বন্ধ। সর্দিতে মাথাটা ধরে রয়েছে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে হাঁটতে লাগলো অবলাকান্ত। কালদীঘির ধারে তিন চারটে ছায়ামূর্তি ঘোরাঘুরি করছে। চাঁদটাও সুযোগ বুঝে মেঘের আড়ালে ডুবেছে। "কে র‍্যা" বলে কাঁপা কাঁপা গলায় হাঁক দিতে গেলো অবলাকান্ত। ভয় আর সর্দি মিলিয়ে নাকি গলায় যে আর্তনাদটা বেরোলো সেটা শুনতে সে নিজেই তৈরি ছিল না। ফাঁকা এলাকায় প্রতিধ্বনি শুনে সে নিজেই ভয় পেয়ে জড়সড় হয়ে গেল। হঠাৎ করে একটা হুটোপাটির আওয়াজ। কতোগুলো পা দৌড়ে পালাচ্ছে মনে হল। কি একটা যেন গায়ে এসে লাগলো। হাতড়ে দেখল পিছল মত কিছু। তারপরই ধারালো কি একটা এসে কপালের বাঁ দিকে লাগলো। অবলাকান্ত অনেকক্ষণ সাহসীর অভিনয় করেছে। আর পারলো না। মেছো ভূতই তাকে নির্ঘাত কামড়ে দিতে এসেছে। যুক্তি টুক্তি বিসর্জন দিয়ে অ্যাঁ অ্যাঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেলো সে।.

যখন সম্বিৎ ফিরল, ভোরের আলো ফুটে গেছে। একটা আঁশটে গন্ধ সারা গায়ে। এতক্ষণ নাক বন্ধ থাকায় বোঝেনি। ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে কপালের বাম পাশটা চিনচিন করে উঠল। এদিক ওদিক তাকাতেই আবিষ্কার করল অনতিদূরেই একখানা হুমদো মত বেড়াল মাঝারি আকারের একটা পোনা মাছ নিয়ে টানাটানি করছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের যেটা সেটা হল বগলের নিচেই একটা দাঁতের পাটি হাঁ করে রয়েছে। এবার ধীরে ধীরে গতরাতের কথা মনে পড়ল সব। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াতে লজ্জাও বোধ হল। তার মানে গতকাল রাতে কেউ বা কারা কালদীঘি থেকে মাছ চুরি করতে এসেছিল। তার আওয়াজ শুনে ভড়কে গিয়ে এসব ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়েছে। দাঁতের পাটিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আবার ভালো লাগতে লাগলো তার। কপালের ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠলেও ওটা দেখলেই প্রলেপের কাজ করল। বুড়ো মানুষটাকে খুশি করা যাবে। কিন্তু মাথা থেকে ছাগলের ডাকটা যে কিছুতেই যাচ্ছে না। চোখ বন্ধ করলেও কোন লাভ হচ্ছে না। এত ছাগলের ডাক শুনে নিজেকেই কেমন ছাগল ছাগল মনে হতে লাগলো তার। পেছন দিকে একবার তাকিয়ে আড়চোখে দেখেও নিলো লেজ টেজ গজিয়েছে কিনা। বাগান থেকে বেরিয়ে দূরে একটা গাছতলায় হেলান দিয়ে বসে গত রাতের কথা ভাবতে লাগলো। দাশুকে দেখা গেলো একখানা রামদা নিয়ে কাঁঠালগাছের পাতা কেটে পরিষ্কার করছে। দেখে ভালো লাগলো অবলাকান্তর। বাগানটা পরিষ্কার হলে মোক্ষদা বুড়ির মত বেশ শাক সবজি ফলানো যেতে পারে। রোজ এই পুকুরের চুনোমাছ আর বন বাদাড়ের ঢেঁকিশাক খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। দাশু ভালো রাঁধে বটে কিন্তু কিছু না পেলে বেচারারই বা কি করার থাকতে পারে। বাবা মাও কিছু না রাখতে পেরে হুট করে চলে গেলেন। এসব ভাবলেই জিভের নিচটা কেমন উচ্ছে চেবানোর মত তিতকুটে লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে ছাগলের আওয়াজটা কানে বাজলেও বেশ মৃদু। দুর্বল শরীর। বেশি পরিশ্রম সয় না। গাছের নিচেই ঘুমিয়ে পড়ল অবলাকান্ত। দাশু একগোছা পাতাসহ গাছের ডাল টানতে টানতে অবলাকান্তর সামনে এসে কিছু বলতে গেলো। তারপর তাকে ঘুমন্ত দেখে বাড়ির ভেতরে চলে গেলো। একটু পরে দাশুকে দেখা গেলো বাঁশি হাতে জঙ্গলের দিকে যেতে।

অষ্টম পর্ব

অবলাকান্ত স্বপ্ন দেখছিল একটা মেছো ভূত তাকে তাড়া করে এসে টিপ করে করে মাছ ছুঁড়ে মারছে আর মাঝে মাঝেই জোর গাঁট্টা লাগাচ্ছে। অবলাকান্ত পালাতে পালাতে পেছন ফিরে দেখল ভূতের মাথাটা অবিকল কেষ্টার মত। সেই হাড়গিলে লম্বা চেহারা, কড়াইশুঁটির ডানার মত ছোট্ট ছোট্ট চোখ, খাড়া খাড়া চুল। কালদীঘির ধার দিয়ে দৌড়চ্ছে সে। হঠাৎ করে কোত্থেকে বটু সাঁতারু এসে তাঁর ছড়িটা এগিয়ে দিলেন। অবলাকান্ত হোঁচট খেয়ে পড়ল ছপছপে কাদার তালে। আর পালানোর পথ নেই। সামনে জল আর পেছনে কেষ্টারূপী মেছোভূত। মুখ চোখ থেকে কাদা মুছে তাকাতে চাইল সে। হাত মুখের ওপর বোলাতেই চিটচিটে পদার্থটা আঙুলে উঠে এলো। ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসতেই ডানা ঝাপটে কয়েকটা কাক চলে গেলো মাথার ওপর দিয়ে। তার মানে কাদা নয়, এসব ওই কাকেদের কাণ্ড। ঘুমন্ত মানুষ দেখে আর সামলাতে পারে নি। ঝটপট ফতুয়ার কোনটা দিয়ে মুখ মুছে পুকুরের দিকে হাঁটা দিলো। শীতকালে স্নান টান বিশেষ করে না অবলাকান্ত। পুকুরপাড় থেকে হাত মুখ ধুয়ে সোজা ঘরে

এসে ঢুকল। দেওয়ালঘড়িতে বেলা একটা। কিন্তু নিস্তার নেই। সেই ব্যা ব্যা চিৎকারটা আবার খানিক অন্তর অন্তর কানের গভীরে জগঝম্পের মত বাজতে লেগেছে। অনেকক্ষণ রোদে ঘুমনোর ফলে সর্দিটা বেশ কম। তবে কানটা কবিরাজ মশাইকে না দেখালেই নয়। তার আগে একটু উষ্ণ গরম তেল দিয়ে দেখা যেতে পারে।

একটা কৃত্তিবাসী রামায়ণে চিবুক রেখে এসব ভাবছিল অবলাকান্ত। দাশু ঘরে এসে ঢুকেছে। একখানা প্রাচীন কাঁসার থালায় ভাত আর গোটা দুয়েক বাটি। এসে হাঁক দিলো খেয়ে নিন কত্তা। দাশু এমনিই কথা ভীষণ কম বলে। শুনতে ভালবাসে কিন্তু কাজের বাইরে কিছু বলাতে ভীষণ কৃপণ। নিঃশব্দে আসন পেতে দিয়ে চলে গেলো। সেদিকে তাকাতেই অবলার খেয়াল হল সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়ে নি। ওই কেষ্টার দলবলের পেছনে সারারাত খরচ করে আর ঘুমিয়ে খিদেটা বিপজ্জনকভাবে চাগাড় দিচ্ছে। সময় নষ্ট না করে হামলে পড়ল সে। দাশু অবলাকান্তর খাবার সময় পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে বরাবর। কিছু লাগলে এনে টেনে দেয়। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আঙুল চাটতে চাটতে অবলাকান্ত বলল – "ডাঁটার তরকারিটা জব্বর হয়েছে রে। আর লাউ চিংড়ির তো জবাবই নেই।" চওড়া হাসি ফুটল দাশুর মুখে।

-"কাল আরও ভালো খাওয়াবো কত্তা। বিকেলে এটটু সওদা করতে হবে। এই তেল টেল..."

কথা কেড়ে নিয়ে খোস মেজাজে বলল অবলাকান্ত – "কেন কিসের মেনু হচ্ছে কাল?"

-"পাঁঠার মাংস কত্তা..."

আঙুল চাটতে গিয়ে কামড় দিয়ে ফেলল অবলাকান্ত। সে হিসেবে চালাক চতুর না হলেও বোঝে যে সংসারে রেখে যাওয়া টাকার পরিমাণ তলানিতে, ফি হপ্তায় নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে কচি পাঁঠা? সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বলল কেউ দিয়েছে তোকে? একটু ঘাবড়ে গেলো দাশু।

-"না কত্তা। হেঁটে হেঁটে এসেছে..."

অবলাকান্ত প্রায় হিড়হিড় করে দাশুর হাত ধরে নীচে ছুটল। গিয়ে দেখল বাড়ির পেছনে যেখানে এককালে গোশালা ছিল, এখন অবশ্য কাঠকুটো, কয়লা ইত্যাদি রাখে দাশু; সেখানে এক কোণে একটা চকচকে ছাগল সোজা হয়ে পরিত্রাহি চ্যাচাচ্ছে। সামনে পাতার স্তুপ এবং এটা-ওটার খোসা। চেবাচ্ছে আর মাঝে মাঝেই নিখুঁত ব্যা ব্যা উচ্চারণে হাঁক পাড়ছে । নিশ্চিত হওয়ার জন্য ছাগলটার কপালের কয়লার গুঁড়ো সরিয়ে নিশ্চিত হল অবলাকান্ত। সাদা একটা দাগ রয়েছে। তার মানে এই সেই কবিরাজ মশাইয়ের চাঁদনী। ভাগ্যিস এতক্ষনে রান্না হয়ে যায় নি। একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে দাশুর দিকে তাকাল অবলাকান্ত। বাবুর কীর্তি কলাপ দেখে ভয় পেলেও চোখে মুখে একফোঁটাও টলেনি দাশু। এমন দেখে অভ্যস্ত সে। সব শুনে বোঝা গেলো যে এতে দাশুর কোন দোষ নেই বরং আকস্মিক ভাবে একটা কাজের কাজ করে ফেলেছে। দাশু একলা বাঁশি বাজাতে ভালবাসে। গত পরশু গ্রামের পূর্বদিকের জঙ্গলটায় গিয়েছিলো সে। সেখানেই শুকনো পাতা ভাঙবার আওয়াজ শুনে দেখতে পায় একটা ছাগলকে কেউ গাছে বেঁধে রেখে চলে গেছে। বেচারা ছাড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর ততই লম্বা দড়িটা আরও তার শরীরে পেঁচিয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ দেখেও কেউ নিতে না আসায় আর না থাকতে পেরে দাশু ওর দড়িটা খুলে দেয়। ভাবে ছাড়লে মালিকের কাছে চলে যাবে। কিন্তু যখনই সে বাড়ি ফেরার জন্য হাঁটতে থাকে দেখে তার পেছন পেছন সেটাও আসছে। ওই জঙ্গলে বাঘ টাঘ না থাকলেও একলা ছেড়ে আসতে মন চাইল না। তাই পেছন পেছন আসায় বাধা দেয় নি সে।

কিন্তু? অবলাকান্ত ভাবল কবিরাজ মশাইয়ের ছাগল তো বোবা। মোটেও ডাকবার কথা নয়। আর এ ছাগল এমন ডাক ডেকেছে যে অবলাকান্ত সেটাকেই অজ্ঞাতে কানের ব্যামো ভাবছে। সেটাই জিজ্ঞেস করে দাশুকে। উত্তরে দাশু যেটা বলল সেটা আরও আশ্চর্যের। কত্তা ঠিকই বলেছেন। ছাগলটা মোটেও ডাকত না। কাল বিকেল থেকেই ডাকতে লেগেছে। পাতা টাতা কিছুই খাচ্ছিল না দেখে দাশু কত্তার টেবিলে কয়েকটা গাছের পাতা, শেকড় বাকড় ছিল ওগুলো স্রেফ মজা করেই ছাগলের সামনে ধরেছিল। ব্যাটা চিবিয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গেই। ছাগলে কিনা খায় আর কি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। ওগুলো খেয়ে দেয়ে ঠিক তারপরই সামনের দুপা তুলে অবিশ্রান্ত চরকি পাক দিয়ে টানা দশ মিনিট গোয়াল ঘরের মাটি ফাটি খুঁড়ে ফেলে ছাগলটা চোখ উল্টে পড়ে যায়। দাশু তো প্রথমে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলো। মরে টরে গেলো নাকি ! কিন্তু পশুটা খানিক পরে উঠেই যা চেল্লানো আরম্ভ করে সেটা আর থামছেই না। তার সাথে গব গব করে যা সামনে পাচ্ছে গিলে চলেছে। এই চিৎকারের আর খাবার যোগাড়ের চাপে দাশু বিরক্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে ভেবেছিল এর অন্ত করে ফেলবে। ছাগলের মুখের সামনে থেকে সাবধানে পাঞ্জাবীটা সরিয়ে নিয়ে অবলাকান্ত হো হো করে হেসেই কুটিপাটি। কবিরাজের ওষুধ পত্তর নিজেরই ছাগলের রোগ সারিয়ে দিলো। এদিকে কবিরাজ জানতেও পারলো না। ব্যাটা তো চেঁচাবেই। এতদিনকার কথা জমানো ছিল যে। এবার দেখার যে কবিরাজ গিন্নী নিজের পুত্রসম চতুষ্পদের বচনামৃত কতদিন সহ্য করতে পারেন। এবার পুরো ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে এলো অবলাকান্তর কাছে। কেষ্টা আর তার দলবলের পিকনিকের ব্যাপারটা সে ঠিকই ধরেছিল। সে জন্যই ছাগলটাকে চুরি করেছিল তারা। পুব দিকের জঙ্গলে সাপ খোপের ভয়ে এমনিই কেউ যায় টায় না। গাছ গাছালির ছায়ায় জায়গাটা দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার হয়ে থাকে। তার ওপর ছাগলটা বোবা। চরে ঘাস খাওয়ার জন্য একটা লম্বামত দড়ি বেঁধে নিশ্চিন্তে কেষ্টারা ওখানে রেখে গিয়েছিলো। সময় হলেই নিয়ে যেত অথবা ওকে দিয়ে ওখানেই পিকনিক হয়ে যেত। ওদিকে হতভাগা দাশু গত বিকেলে বাঁশি বাজাতে গিয়ে না জেনেই চোরের ওপর বাটপাড়ি করে ফেলেছে। আর গত রাতে মাছ চুরি করতে এসেও কেষ্টারা সুবিধে করতে পারে নি। অবলাকান্তর কাঁপা কাঁপা সর্দি বসানো হেঁড়ে গলার ডাক শুনে ওকেই ভূত ঠাউরে পালিয়েছিল। কিন্তু ব্যাটা কালিধর কিভাবে জানল যে ছাগলটা পুব দিকেই লুকিয়ে রাখা আছে। কে জানে হিমালয় থেকে সত্যিই কিছু তন্ত্র মন্ত্র শিখে এসেছে হয়তো। অথবা সব আন্দাজের বুজরুকি। না হলে হয়তো কোনভাবে কেষ্টাদের আড্ডায় অবলাকান্তর মতই লুকিয়ে শুনেছে। ওর ডেরা থেকে বেশি দূরে তো নয়। সে অঙ্ক সেখাতে গিয়ে সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করে নেবে না হয়। এক নিশ্বাসে এতো কিছু ভেবে ফেলে অবলাকান্তর নিজের পিঠ নিজেরই চাপড়ে দিতে ইচ্ছে হল। নিজের পিঠ টাকে কব্জা করা সহজ নয়। তাই সামনে পেয়ে দাশুর পিঠটাই চাপড়ে দিয়ে বলল যা একটু গড়িয়ে নে। রোদ পড়লে বেরোব।

অন্তিম পর্ব

বিকেলের দিকে অবলাকান্তকে দেখা গেলো একটু নতুন একটা ফতুয়া পরে শিস দিতে দিতে হাঁটছে। তার পেছনে দাশু। দাশুর হাতের দড়িতে বাঁধা চাঁদনী। সে একমনে দাশুর হাতের ডাল থেকে ঝুলন্ত কাঁঠাল পাতা চিবুচ্ছে আর থেকে থেকেই পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছে। একদিনের অনুশীলনে গলা আরো খোলতাই হয়েছে। কালদীঘির পাড়ে বটকেষ্টকে দেখা গেলো ফোকলা দাঁতে বিড়বিড় করছেন আর ছড়ি দিয়ে ঝোপঝাড়গুলো খুঁচিয়ে চলেছেন।

অবলাকান্ত সোজা গিয়ে বটকেষ্টর হাতে তার দাঁতের পাটিটি ধরিয়ে দিলো। বটকেষ্ট চমকে তাকালেন। অবলাকান্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল ঢেউ এসে দিয়ে গেছে জ্যাঠামশাই। বুড়োর চোখে কান্নার জল না কালদীঘির জলের ছিটে বুঝতে পারলো না অবলাকান্ত। কিন্তু জীবনে প্রথমবার ঝকমকে আলোয় ফোকলা দাঁতের হাসি দেখে ভারি ভালো লাগলো তার। বটকেষ্ট আর কিছু জিজ্ঞেস না করে অবলার হাতটা চেপে ধরলেন। তারপর ধুতির কোঁচায় চোখটা মুছে চাঁদনির দিকে তাকালেন। কোবরেজের ছাগলডা না? অবলাকান্ত মৃদু মাথা নাড়ল। তারপর কেষ্টাদের কীর্তিকলাপ আর ছাগল উদ্ধারের কাহিনী সবিস্তারে বলল। এবার যাত্রায় বটকেষ্টও তাদের সঙ্গী হলেন। রাস্তায় যেতে যেতে নিবারণ মণ্ডলের সাথে দেখা। এবারটা এড়িয়ে যেতে পারলো না অবলাকান্ত। তিনি এখন থেকেই রাতের পাহারার তদারক করতে বেরিয়েছেন। তাঁকেও সবিস্তারে সব বলতে হল। গ্রামের লোক গল্পগাছা পেলে আর কিছু চায় না। জীবনের নিস্তরঙ্গ জলে একটা নুড়ি পড়লেও সেই আলোড়নটুকু সম্বল করে খানিকক্ষণ বেঁচে থাকতে চায়। নিবারণ মণ্ডল একটু মনমরা হয়ে গেলেন কারণ রাতে পাহারার তাহলে আর দরকার পড়বে না। কিন্তু তিনি যথারীতি তাদের সঙ্গী হলেন এবং কেষ্টাদের থেকে ছাগলটা উদ্ধার করে অবলা আর দাশু যে কি গভীর পরোপকার করেছে সেটা বারবার বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। শোভাযাত্রাটা একটা দেখার মত হল। সামনে নিবারণ মণ্ডল অবিশ্রান্ত বকবক করতে করতে চলেছেন। তার পেছনে অবলাকান্ত। তার পেছনে চাঁদনির দড়ি হাতে দাশু এবং সর্বোপরি বাহারি দাঁতের পাটি সবাইকে দেখাতে দেখাতে যাওয়া বটকেষ্ট। বটতলার কাছে কেষ্টার দলবল দাঁড়িয়ে। কিছু একটা নিয়ে চরম বচসা বেধেছে। কারণ আন্দাজ করা শক্ত নয়। দাশুর হাতে চাঁদনিকে দেখে কেষ্টা সহ পুরো দলটাই কেমন থমকে চোখ গোল গোল করে চেয়ে রইল যেন ভয়ংকর কিছু দেখে ফেলেছে। অবলাকান্তর মুখে এক চিলতে যুদ্ধজয়ের হাসি। ছেলেগুলো ক্যাবলাকান্ত ডাকটাও ডাকতে ভুলে গেছে অথবা সঙ্গে ছড়ি হাতে বটকেষ্টকে দেখে ট্যাঁ ফোঁ করার সাহস পেলো না। তাদেরকে পেছনে ফেলে শোভাযাত্রা পৌঁছল কবিরাজের বাড়িতে। পথে যেতে যেতে গ্রামের প্রায় সবাই কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করেছে। ব্যতিক্রম শুধু ইন্দ্রকুমার। একখানা ছিপ হাতে নিয়ে ফাতনার দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়ে ছিলেন। তাদেরকে দেখেও দেখলেন না।

অতএব মধুরেন সমাপয়েত। পুরো গ্রামে ততক্ষণে রটে গেছে ছাগল উদ্ধারের ঘটনা। কবিরাজ গিন্নী অনশনে ছিলেন। চণ্ডীবালা একটা ঝাঁটা হাতে অতিথিদের তদারক করছিল। ঘরের ছাগল ঘরে ফিরে আসতে তাকে জড়িয়ে ধরে কবিরাজ গিন্নী এমন ডুকরে কাঁদতে লাগলেন যে কে বলবে চাঁদনী একটা ছাগল মাত্র। কবিরাজ মশাইও ঘরের এককোণে একটা খল হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জড়িয়ে ধরলেন অবলাকান্তকে। অবলাকান্তর এসব আদিখ্যেতা দেখে প্রথমে একটু হাসি হাসি পাচ্ছিল কিন্তু খেয়াল করেনি যে পশু মানুষের এমন মর্মান্তিক মিলন দৃশ্য দেখে তারও চোখ কখন জলে ভরে গেছে। নরম মানুষ তো। কিন্তু ছাগলের ডাক ফিরে পাওয়ার মন্ত্রগুপ্তি কাউকে বলে নি সে। বারবার জানে না বলে এড়িয়ে গেছে। আর দাশু তো এমনিই কথা কম বলে। বটকেষ্ট নগেন মুখুজ্জেকে সামনে পেয়ে তাঁর দাঁত উদ্ধারের কাহিনী হাত-পা নেড়ে বলতে লাগলেন। দুই বন্ধুর আড্ডা আবার জমে উঠল। পরদিন নেমন্তন্ন ছিল কবিরাজ মশাইয়ের বাড়িতে। পেটপুরে খেয়ে দেয়ে আসতে আসতে দেখল দাশু আপন মনে বাঁশিতে একটা সুর ধরেছে। মনটা ভারি নরম হয়ে গেলো অবলাকান্তর। গোয়েন্দাদেরও মন বলে তো একটা জিনিস আছে। সে তো আর গল্পের বইয়ের অতিচালাক গোয়েন্দা নয়। নেহাত বোকাসোকা গ্রামের মানুষ। দাশুকে আর জিজ্ঞেস করতে মন চাইল না যে সেদিন চাঁদনিকে আবিষ্কারের সময়

ভাঁড়ারে যে গোটা দুই লাউ দেখেছিল সেগুলো কোথা থেকে এলো বা গোয়াল ঘরে চাঁদনির সামনে গুচ্ছের লাউ-এর খোসার উৎস কোথায়! লম্বামত আর খাড়াচুলো বললে কি দাশু আপত্তি করবে? মনে হয় না। তবে লাউ চিংড়িটা বেড়ে রাঁধে ছেলেটা। মোক্ষদা বুড়িকে পরে সাবধানে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গোটা দুই টাকা দিয়ে এলেই চলবে।

জোছনা

সত্র্যজিত

জুন ২৬, ২০১৩

এক নিঃশব্দ রাত্রে তোমাকে প্রথম দেখি
তোমাদের একতলা বাড়ির ছাতে।
তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে,
শ্যাওলা লাগা পাঁচিলে হেলান দিয়ে, অসাবধানে।
তারার আলোয় তোমার সাথে আলাপ করতে চাইলাম
তাই মনগড়া এক গল্প নিয়ে তোমার কাছে গেলাম....

আমার পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙ্গলো তোমার,
আমার ছদ্মবেশ দেখে তুমি বললে, "রাজপুত্র,....
প্রজাপতি ধরার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে।
আমার জন্য বানানো তোমার নীল ঘরে
আজ আমি অত্যন্ত বেমানান।"

তোমার চোখের ভাষা পড়তে পারিনি সেদিন,
অবুঝের মতো পালিয়েছিলাম... অথবা ভয়ে।
সবুজ শ্যাওলার রঙ ফিকে হয়, সন্তর্পণে
ছদ্মবেশের আড়ালে আমার সত্তা মিলিয়ে যেতে থাকে।

তারপর একদিন,
সোনালী আলোয় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যৌনতা
শুভ্রতায় সৃষ্টি হয় সম্ভাবনা
এক নপুংসকের গর্ভে জন্ম নেয় প্রেম
জীবন দিশা পায় পিতৃত্বের অঙ্গীকারে।

পাগল ভাবলে?

নবকলম

ফেব্রুয়ারী ১২, ২০১৩

খিদের জন্য তুলসীপাতা,
ঘুম না হলে অ্যালজোলাম;
তেষ্টা পেলে তেঁতুলজল,
আর মনখারাপে চিঠির খাম।

চাঁদ না এলে সড়ক-বাতি,
মনের ব্যাথায় পিঠ-মালিশ;
বিরিয়ানিতে জাপানি-ব্ল্যাক,
আর ডালডা দিয়ে বুট–পালিশ।

আইন ভাঙলে গুলাব-জামুন,
সৎসাহসে পান্তাভাত;
শ্রাদ্ধবাসরে হাততালি,
আর অন্নপ্রাশনে অশ্রুপাত।

যুদ্ধ লাগলে খুশির ঝিলিক,
মিত্র-হস্তে কুড়ুল-কোপ!
শজারু-কাঁটা উপড়ে এনে
সাজানো নকল আঁতেল গোঁফ।

এসব বলেছি, নালিশ কর গে,
যেখানে খুশি মার না তেল;
পাগলা-গারদ রিলিজ দিলে
জিতব আমি-ই ইগনোবেল।

শঙ্কুমামা ও ফেসবুক

অশোক দেব

অক্টোবর ৩, ২০১৩

২২শে অগাস্ট ২০১৩, সকাল সাড়ে নটা

ফোনটা ধরে হ্যালো বলতেই কান ফাটানো আওয়াজ - "ভূতো আমাকে হেল্প কর । আমি আর কিছুতেই পেরে উঠছিনা।" শোনা মাত্রই বুঝতে পারলাম এতো শঙ্কুমামার গলা। শংকরপ্রসাদ মজুমদার। এরকম গলা আর কারোর হতেই পারেনা। বাজখাঁই নয়, হেঁড়েও নয়, কিন্তু ফোনটা কানের থেকে ইঞ্চি ছয়েক দূরে না ধরলে নির্ঘাৎ সার্ভিসিং করাতে হবে, ফোনের নয়, কানের। শঙ্কুমামা চিরকালই আদর্শবাদী সজ্জন। তাই ঘরে এখনও এ সি লাগেনি (সরি, তাবলে যাদের ঘরে এ সি আছে তাদের আমি অসজ্জন বলতে চাইনি)। গোদা পাটা সিমেন্টের মেঝে, সিরামিক টাইলস বা টেরাজো নয়। সোদপুরের ইস্কুলে বাংলার টীচার। প্রায় বিশ বছর একই স্কুলে,একই বিষয়ে,একই পদে আসীন। ঘরেও একই মামী, আর একটাই ছেলে পুঁটে। দিনভর-রাতভর পড়াশুনা আর ছাত্র পড়ানো ছাড়া আর কোন প্যাশন নেই। তবে গলাটাই ওনার সম্পদ। এই গলা কোন ক্লাসরুমে বাজতে থাকলে টিভি দেখে রাতজাগা কোন ছেলের চোখেও ঘুম আসবেনা। আস্তে কথা বলতে পারেননা, কিছুতেই না। এর অবশ্য কারণ আছে। মাত্র বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। পাড়ার ফুটবল খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়ে পুঁটের দল ঘন ঘন চকলেট বোম ফাটাচ্ছে, এমনই সময় শঙ্কুমামা সেখান দিয়ে পাস করছিলেন। ফাটবি তো ফাট-ওনার কানের গোড়ায় "দড়াম"! ঝুলপির কাছে বেশ কিছু চুল পুড়ে গেছিল। সেটা অবশ্য কোন কথা নয়। চুল গেলে চুল আসবে, কিন্তু কান গেলে!! মৃদুভাষিনী বসুন্ধরা। পেছন থেকে গাড়ী বেধড়ক হর্ন বাজালেও কোকিল ডাকছে মনে হয়। যার ফলে যা হবার তাই-ই হয়। শঙ্কু স্যারের ক্লাস মানেই ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। মনের আনন্দে গল্পগুজব কর, কিন্তু চোখটা থাকতে হবে স্যারের দিকে, আর ঘাড়টা রাখতে হবে সোজা। শুধু যে হতভাগার কপাল খারাপ-তাকে প্রশ্নের উত্তর বলতে হবে, সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরলে মা জলে আদা ফুটিয়ে নুন মিশিয়ে রেডি করে রাখেন। মামীর বহুবার ভোকাল কর্ড জ্যাম হয়ে গেছিল। তারপর থেকে হাত পা নেড়ে, ঠোঁট নাড়িয়ে কমিউনিকেট করেন। এহেন শঙ্কুমামাকে তাঁর কোন সহকর্মী ইদানীং ফেসবুক শিখিয়েছে। অনেকদিন থেকেই বাড়িতে একটা ডেস্কটপ আছে। তাতে পুঁটে ইন্টারনেট লাগিয়েছে। সব কিছু ভালোই চলছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর পূজোপাঠ করে সেই যে বাবা বসে, পুঁটের আর কোন চান্স নেই। আগে তো বইটই পড়ত, এখন তো তাও নয়। মামীর নিঃসঙ্গতর জীবন।

শঙ্কুমামা যে ফেসবুকে এ্যাকাউন্ট করেছে সেকথা মামী কাঁদতে কাঁদতে একদিন বলছিল আমাকে। "জানিস ভূতো, তোর মামা আগে আপিস থেকে ফিরলে কি সুন্দর গমগম করত ঘরটা, মনে হত যেন কত লোক আছে বাড়িতে। আর এখন... সেই যে ঘাড় গুজে পড়ে থাকে, রাতের খাবার রেডি করে পুঁটে আর আমাকে মিলে রীতিমতো টনাটানি করতে হয়।" স্বামীর এই আকস্মিক দুরারোগ্য ব্যাধির নিদারুণ অসহায়তায় মামী সেদিন ঝরঝর করে

কেঁদেছিল। - "জানিস ভূতো, কানের জন্য তো অনেক চিকিৎসা হয়েছে, ফল ও পেয়েছি অনেক। কিন্তু একি ব্যামো হল বল দেখি। কত ডেকেছি ঠাকুরকে, মানত করেছি এমনকি পুঁটে কদিনের জন্য বিগড়ে দিয়েছিল কমপ্যুটরটাকে, লাভ হয়নি, পরের দিনই লোক ডাকিয়ে সারিয়ে ফেলেছে। মামীর জন্য সেদিন অনুকম্পা হচ্ছিল। এমন একজন অ-মাইক পতিদেব যদি ঘরে ফিরেই সাইলেন্ট মোডে চলে যায়...

আমার দ্বিতীয়বার "হ্যাল্লো" বলামাত্রই আমার গলার ডেসিবল শুনেই ওঘর থেকে মা বলল "কে রে ভূতো, শঙ্কুর ফোন, তাইনা?"

বললাম – বলো মামা কিসের হেল্প চাই ?

- আরে শোননা... আমি তো কদিন আগে ফেসবুকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছি। কি সুন্দর সুন্দর ছবি, কি সুন্দর কবিতা পাঠাচ্ছে বন্ধুরা। আমার খুব ইচ্ছে করছে ওদের আমার ভালোলাগার কথা জানাতে, কিন্তু..

- কিন্তু কি? তুমি লাইক মারো, নিচে কমেন্ট লেখো, তাহলেই ওরা বুঝবে যে তোমার ভালো লেগেছে। এ তো খুব সিম্পল ব্যাপার।

- আরে, তুই তো বলছিস সিম্পল, কিন্তু যতবার যেখানে লাইক মারছি ততবারই আনলাইক দেখাচ্ছে । আধ ঘন্টা ধরে অনেক জায়গায় চেষ্টা করলাম কিন্তু সেই আনলাইক। আরে আমার পছন্দ না হলে আমি তো ডিসলাইক টিপতাম। আনলাইক আর ডিসলাইক কি এক হল, তুই-ই বল। মনে হয় কম্পিউটার কোন গড়বড় করছে, কি করি বলতো এখন?

- মামা, তুমি লাইক টেপো।

- টিপছিতো, টিপলেই আনলাইক হয়ে যাচ্ছে। আবার আনলাইক টিপলেই লাইক চলে আসছে, আবার লাইক টিপলেই আনলাইক..এতো কি বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার!

- ছাড়ো, তুমি কমেন্ট লেখো।

- কারেন্ট? হ্যাঁ, আছে।

– কারেন্ট না, কমেন্ট। কমেন্ট, কমেন্ট... শুনতে পেলে?

– চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? শুনেছি। কমেন্ট লিখতে বলছিস তো? আচ্ছা দেখি, পরে দরকার পড়লে আবার ফোন করব কিন্তু। এখন রাখছি।

সকাল নটা পঞ্চান্ন

- ভূতো রে, কমেন্ট করতে গিয়ে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে। পারছিনা। A,B,C,D, কমা, ফুলস্টপ আর 1,2,3 দিয়ে বাংলায় কি করে লিখব? ওরা কি সুন্দর ঝকঝকে বাংলায় লিখছে...

– মামু, কিছু করার নেই, ঐ English keyboard এর সাহায্যে তোমাকে ইংরেজী হরফে বাংলায় লিখতে হবে। যেমন ধরো –"আমার ঘুম পেয়েছে"- এই কথাটা লিখতে গেলে তোমায় লিখতে হবে - amar ghum peyechhe..। বানান করে বুঝিয়ে দিলাম। কিম্বা ধরো- "ভূতো বড় ভালো ছেলে"- এটা লিখতে গেলে তোমাকে টাইপ করে লিখতে হবে - Bhuto baro bhalo chhele। কি, এবার বুঝলে তো?
কিছুক্ষণ কোন উত্তর নেই।

– মামু, তুমি শুনলে তো?

– তুই কিছু বললে তবে তো শুনব!!

এবার মাথাটা দপদপ করছে। চীৎকার করে আবার আগের কথাগুলোই বলে গেলাম। আবার কিছুক্ষণ চুপ। কিন্তু এবার উত্তর এলো। –"বাঃ,বেড়ে বলেছিস তো! এখন তো সব লিখতে পারছি। থ্যাংক ইউ ভূতো। তবে ওরা অমন ঝকঝকে বাংলায় লিখছে কেমন করে?"

– ওসব তুমি এখন পারবেনা মামু, তার জন্যে বাংলা সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয়। এখন এভাবেই কাজ চালিয়ে যাও, পরে আমি বুঝিয়ে দেবো।

–ঠিক আছে, দেখি কি হয়।

সকাল ১০টা ১০

- ভূতো, বাবা, তোকে বারবার ফোন করে বিরক্ত করছি, তুই কিছু মনে করছিস না তো রে? আজ রোববার, তাই একটু ফেসবুক খুলে বসেছি আর কি।

– না মামু, বলুন না, আবার কোন প্রবলেম হলো নাকি?

– না, প্রবলেম ঠিক নয়, তবে একটা বড় ভুল করে ফেলেছি। একজন "কলা"র ওপর খুব সুন্দর একটা নিবন্ধ লিখেছে। পড়ে খুব ভালো লাগল, তাই কমেন্টে গিয়ে লিখলাম - Kadali khub e upadeyo fall, khosa chharalei gota fall ta atyanta suswadu. Kola onek prokarer hoy - ইত্যাদি লিখলাম। কিছুক্ষণ পরে

দেখি মাথায় ফেট্টিবাঁধা, সরু গোঁফওলা একটা ছোকরা এসে হাজির। বলছে - "এটা কলা খাওয়ার জায়গা নয়। ভুল জায়গায় এসে পড়েছো। কলা খেতে হলে নিচের থ্রেডে গিয়ে খাও।" কে বলল দেখতে গিয়ে কি লজ্জা কি লজ্জা, ওরেব্বাস! এখানে সাম্রাজ্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা চলছিল। তার মধ্যে কলা! আমি বললাম ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ভাবছি, ভুলটা হল কিভাবে!

– না না মামু, ওরকম ভুল দুএকবার সবারই হয়। আর তুমি তো নিজেই বুঝেছো কি ভুল করেছো। এরপর থেকে একটু দেখেশুনে কমেন্ট কোরো। তাহলেই আর কোন চিন্তা নেই। ব্যস্ এবার অল্পের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সকাল ১০টা ৪৫

আবার ফোন।

- ভূতো রে, আমার বড় কষ্ট।

– কেন, আবার কি হলো?

– সবার নিজের কেমন সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, সবাই কত সুন্দর সুন্দর ছবি পোস্টিং করছে। আমি পারিনা কেন?

– মামু, তুমি কি তোমার কোনো ছবি কম্পিউটারে সেভ করে রেখেছো?

– নাহ্ আমি তো এসব পারিনা রে, তবে পুঁটে করলেও করতে পারে। ও বাড়িতে এলে ওকে জিজ্ঞেস করব।

– শোনো মামু, তোমার পেজের ওপরের দিকে দ্যাখো।

– ধুস্! কথা বলছিস না কেন রে? ধুস্, এই দিলাম রেখে।

– ফোনটা কেটে গেল। 0hhh God!

২৩শে অগাস্ট, ২০১৩ সকাল সাড়ে দশটা

- ভূতো, ও ভূতো রে... কিছু একটা কর।

– আবার কী হল মামু?

– কি আবার হবে, কিছুই হচ্ছে না, নট নড়নচড়ন নট কিস্যু।

– মানে?

– মানে আবার কি, না পারছি লিখতে, না পারছি লাইক দিতে, না পারছি পেজটাকে নাড়াতে, না পারছি কাটতে...

– মামু তোমার কম্পিউটার হ্যাং করে গেছে।

– কোথায় ব্যাং? তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি রে?

– ব্যাং নয় মামু, হ্যাং হ্যাং! তোমার কম্পিউটার কাজ করছেনা। রিস্টার্ট করতে পারো?

– সেটা কী?

– তোমার সি পি ইউ এর নীচের দিকে একটা বোতাম আছে, সেটা টিপে দাও।

– না না, কোন ডিউ টিউ নেই। সেকেন্ড হ্যান্ড বটে, কিন্তু নগদে কেনা।

আমিও হাল ছাড়ব না । বললাম- মামু,-তোমার কম্পিউটারটা যে সুইচ টিপে চালাও, সেটাই আরেকবার টিপে দাও।

–দিলাম টিপে! ওমা এতো অন্ধকার হয়ে সব বন্ধ হয়ে গেল। কি সব বলিস!! কিস্যু জানিসনা। অর্বাচীন! অপদার্থ!

তড়াক করে মাথায় রক্ত উঠে গেলো, রোববারের সকালটা বরবাদ করে কণ্ঠনালীর বিপর্যয় ঘটিয়ে যে কৃচ্ছ্রসাধন করলাম, তার এই পরিনাম... ছিঃ! আমি নিশ্চিত ছিলাম যে স্বাভাবিক স্বরে গালমন্দ দিলেও এক বর্ণও শুনতে পাবেননা। তাতে লাভ কী! মনে বরফ ঢেলে ফোনে চীৎকার করলাম - মামু এবার আবার সুইচটা টিপে দাও। বলতে না বলতে ফোনের ওপাশে ঠং ঠঙাৎ আওয়াজ, তারপরই মামীর আর্তচীৎকার।

– কি হলো মামু, কিসের আওয়াজ?

– ও কিছু নয়, তোর মামী চা দিয়েছিল, তাড়াহূড়োতে আমার হাত লেগে উল্টে গেছে। তুই ওসব নিয়ে ভাবিস না, তোর মামী এখন টেবিলের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে সব মুছে নিচ্ছে।

– ভূতো, তোর কথা মতো দিলাম তো টিপে, এ বাবা স্ক্রীনটাই তো নীল হয়ে গেলো, কী করলি রে ভূতো। সেই ঢিপির ওপর সবুজ ঘাস, হলুদ ফুল-কোথায় হারিয়ে গেল।

– কিচ্ছু হারায়নি মামু, একটু ধৈর্য ধরো...দ্যাখো ঐ নীল স্ক্রীনে এক জায়গায় লেখা আছে windows starts normally, আরেক জায়গায় আছে safe mode। তুমি normally টা টিপে দাও, দ্যাখো কি হয়।

– এই দিলুম টিপে, আরেব্বাস্, ভূতো তোর জয় হোক। বেঁচে থাক বাবা। কিন্তু এ তো দেখছি ফাঁকা মাঠ...ওর মধ্যে সুন্দর নানা রঙের বাক্সোগুলো কোথায় গেলো?

– আরেকটু ধৈর্য ধরো, ঐ বাকসো... মানে আইকন গুলো সব ফেরত চলে আসবে।

– হ্যাঁ রে ভূতো, সব কটা আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।

– আসুক, এখন আর তুমি কিছু টিপে দিওনা। কম্পিউটারটাকে একটু জিরোতে দাও।

- ঠিক আছে, এখন রাখছি, একটু বাথরুম থেকে আসছি। তুই পালাস না যেন, কোন অসুবিধে হলে আবার ফোন করব।

মামু বাথরুমে গেছে-আমিও কম্পিউটারের সামনে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে গেছি। কোমর ব্যথা করছে। সটান গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অনেক টেনশান গেছে মামুর, একটু রিলিস হয়ে গেলেই আবার নতুন উদ্যমে শুরু করা যাবে।

সকাল ১১টা ০৫

সবে শুয়েছি, এমন সময় আবার ফোন। এবার মামী।

- "ভূতো, আমার লক্ষ্মী সোনা, বাবা তুই আমাদের রক্ষে কর। কি অলুক্ষুণে নেশায় ধরেছে রে... এঁ এঁ এঁ"

মনে হল মামী কাঁদছে!

- কিছু একটা কর চাঁদু আমার, তোকে নলেন গুড়ের সন্দেশ খাওয়াবো, ভাপে ইলিশ খাওয়াবো, তুই যা চাস তাই-ই করবো, কিন্তু কিছু একটা কর, এঁ-এঁ-এঁ...

মামীর কান্না শুনে আমার গলা শুকিয়ে উঠেছিল। সুর পঞ্চমে ওঠার আগেই কোঁৎ কোঁৎ করে খানিকটা জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিলাম। তারপর রাজেশ খান্নার মতো স্টাইলে স্বরে মধু মাখিয়ে বললাম, তুমি কাঁদছো মামীমা-আ-আ-! আমি তো আছি। মামু ফিরুক, একটা বন্দোবস্ত নিশ্চই করব। মনে হল মামী কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। আর কথা না বাড়িয়ে মা তারকেশ্বরীর নাম নিয়ে আমাকে যতরকম ভাবে আশীর্বাদ করা যায় করে ফোন রেখে দিলেন।

আমার আরো ক্লান্ত লাগছিল। আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো। ঘুম....ঘুম...। স্বপ্নের ভেলায় ভাসতে ভাসতে ছেলেবেলার ছবিগুলো সব যেন ভেসে ভেসে উঠছিল। কি আশ্চর্য ! এ আমি কার কোলে ? ছোঙ্কুমামা না! তাই-ই তো। ছোঙ্কুমামার কোলে আমি, আর মামা পকেট থেকে লুকিয়ে বের করেছে আমার প্রিয় হজমি গুলি। সামনে একটা নাগরদোলা ঘুরছে পাঁই পাঁই করে। আমি ছোঙ্কুমামার কোলে ছটফট করছি নাগরদোলায় চড়ব বলে। চারিদিকে ভেঁপু বাজছে, মেলা বসেছে। তারপর দেখি আমি সার্কাসের তাঁবুতে বসে জোকারদের খেলা দেখছি, পাশে শঙ্কুমামা। অনেক উঁচুতে দোলনায় ঝুলতে ঝুলতে সবাই কেমন খেলা দেখাচ্ছে। বাঘ এলো, সিংহ এলো, হাতি এসে ফুটবল খেললো। হঠাৎ একটা জোকার এত জোরে ফুঁ-বাঁশি বাজালো যে ঘুমটাই গেল ভেঙ্গে...

দুপুর ১২ টা

মোবাইলটা ফোনটা বেজেই চলেছে।

– হ্যালো...ও মামু, বলো, এতো দেরী হলো কেন? তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

– না রে, ঘুমোইনি। আসলে কালকে শোবার আগে কায়ম চূর্ণ খেতে ভুলে গেছিলাম তো। আর পুঁটেটাও এমন বিচ্ছু, আমার দেরী হচ্ছে দেখে বাইরে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়েছিল। আর জানিস তো তোর মামী আবার একবার পূজোয় বসলে শেষ না করে ওঠেনা। আজ ফিরুক পুঁটে! জবাই না করেছি, দেখিস!

– ও...

– এদিকে ফিরে এসে দেখি ইন্টারনেট চলছেনা। এটাও পুঁটের ফিচলেমো, সুইচ অফ করে দিয়ে গেছে।

– যাক, এখন চালু করেছো তো?

- হ্যাঁ, এই তো করলাম। গুগুল খুললাম, কিন্তু ভূতোরে, সর্বনাশ হয়েছে, সব টেনশান একসাথে এসে যাওয়ায় আমি পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি।

– এই সেরেছে, মামু ঠিক করে মন দিয়ে ভাবো...

– ধুর ছাতা! কি খাবো? তুই কি খেতে বলছিস? ধর তো একটু "এ্যাই-শুনছো? ও পুঁটের মা! কোথায় গেলে গো? একটু ব্রাহ্মী তেলের শিশিটা নিয়ে এসোনা একবার!"

বুঝলাম মামী এসে শঙ্কুমামার মাথায় ব্রাহ্মী তেল মাখাচ্ছে।

– হ্যাঁ, এইবার বল্...

– কি বলব?

– মনে করার চেষ্টা কর্...

– তুমি ভুলেছো, আর আমি মনে করব?

– তাও তো ঠিক, দাঁড়া মাথাটা ঠান্ডা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকটু নিচে দাও... কানের পাশে আর ঘাড়ে... আহ্ কি আরাম রে ভূতো, মনে হচ্ছে মগজটা পুরো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ এবার ভাবছি।

–মনে কর মামু, শব্দ না সংখ্যা?

– শব্দই মনে হয়...

– তোমার নাম?

– নাঃ

– দাদুর নাম?

- নাহ

– মামীর নাম? পুঁটের নাম?

–নাঃ

– ইস্কুলের নাম?

– না মনে হয়, এখন মনে হচ্ছে সংখ্যাও হতে পারে।

– তাহলে দ্যাখো, তোমার ফোন নাম্বার?

– কোন নাম্বার? তুই কি বলছিস?

– আরে বাবা, তোমার ফোন নাম্বার।

চলতে থাকল অনুমান ও উপলব্ধির মেমোরি গেম। এই ফাঁকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, মামা যখন বাথরুমে,তখন মামীর ঐ দেড় মিনিটের মড়া কান্না আমার কোমল মনে এত গভীর দাগ কেটেছিলো, যে forgot password এর রহস্যটা মামাকে জানাতে চাইনি। তবে বেপরোয়া ভাবে ভুল পাসওয়ার্ড দিতে দিতে হঠাৎ মামুরই সেটা নজরে এলো। বলল – ভূতো রে, ব্রাহ্মী তেলে কোন কাজ দিচ্ছেনা। বরং নিচে নীল একটা পুঁচকে লেখা দাঁত বের করে হাসছে।

– সেটা আবার কী?

– গা পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে, আমি মরছি আমার জ্বালায়, আর বলছে forgot password.. পাশে আবার একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন।

বিবেকের দংশন সামলে ভাবলাম সবার নিস্তার পাবার এটাই পরম সুযোগ। বললাম - মামু, আমিও আর ঠিক মনে করে উঠতে পারছিনা। তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে, এখন এভাবে আর হবেনা। তুমি বরং এখন কম্পিউটার বন্ধ করে একটু জিরিয়ে নাও।

– বলছিস? নাহ্, তুইও তাহলে ওদের দলেই পড়লি রে!! তোর থেকে অন্তত এটা আশা করিনি ভুতো। আমার এই করুণ অবস্থায়ও তুই আমার পাশে দাঁড়ালিনা। মনে থাকবে... নেতাজী ঠিকই বলেছিলেন...

– কি বলেছিলেন মামু?

–হ্যাঁ, এসব কথা তো ভুলে যাবিই। যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সবাই তাকে একা ফেলে চলে গেল তখন উনি গেয়ে উঠেছিলেন "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে..."

– মামু তুমি একটু বিশ্রাম নাও।

– ঠিক আছে, আমাকে অত বোকা পাসনি, বুঝেছি তুই কি বলতে চাইছিস। বলেই ধড়াম করে ফোনটা রেখে দিলেন।

আমি জানি শঙ্কুমামু খুব অভিমানী মানুষ। কিন্তু এতো অভিমান আগে বুঝিনি। একমাস কোন ফোন নেই, দেখা নেই, কথা নেই, আমি মাঝে মাঝে খুঁজে বেড়াতাম আমার অত্যন্ত প্রিয় শঙ্কুমামাকে। মাঝে মাঝে মনটা যে ভারী হয়ে আসতনা তা নয়। শেষ পর্যন্ত আমি ব্যাপারটা আমার অগোচরেই ভুলে যেতে থাকলাম। ফেসবুকের সমস্ত গ্রুপের সব বন্ধুদের সাথে আনন্দে মশগুল হয়ে গেলাম। ভালোই চলছিলো দিনগুলো, হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ফেসবুকে লগ-ইন করেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। চোখ কচলে, গায়ে চিমটি কেটে দেখে নিলাম। একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসেছে। "শঙ্করপ্রসাদ মজুমদার"... মামার সেই প্রাণখোলা হাসিমুখ আর ডানপাশে মামী, বাঁ পাশে পুঁটে। আমি চকিতে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম।

অক্সিজেন

সত্র্যজিত

মে ১৫, ২০১৩

আমার বেড়ানোর নেশাটা উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার থেকে পাওয়া। বাবা ভীষণ ভ্রমণপিপাসু ছিলেন। সময় সুযোগ পেলেই আমরা বেরিয়ে পড়তাম বিভিন্ন জায়গার উদ্দেশ্যে। ছোটবেলায় বাবার দৌলতে আমি আর মা ট্রাভেল বুক এর বাইরে অনেক জায়গা দেখতে পেয়েছিলাম। বাবা বলতেন "টুরিস্ট স্পট হিসেবে যে জায়গার বেশী নাম ডাক, সেখানে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য কিছু দেখা যায়না, সেখানকার মাটির গন্ধ কেমন বা মানুষগুলো কেমন সেগুলো জানা হয় না। সেই জায়গাটা দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অদৃশ্য সৌন্দর্য সবসময় রহস্যময়ী।" সেই বয়েসে বাবার অনেক কথার মানে ঠিকমত বুঝতাম না। তবে "ভ্রমণে মনের প্রসার বাড়ে", বহু ব্যবহৃত এই উক্তিটা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করেছিলাম।

তখন আমার বয়েস দশ-এগারো। সেবার আমরা গেছিলাম উত্তরবঙ্গের একটা নামহীন জায়গায়। সেবারই আমার প্রথম উত্তরবঙ্গের সাথে আলাপ। নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে গাড়িতে আরো ঘন্টা চারেকের রাস্তা। জায়গাটাকে বড়জোর মফস্বল বলা যেতে পারে। মকাইবাড়ী চা বাগান সেখান থেকে আরো প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। আমাদের জন্য বাবা আগে থেকে গেস্ট হাউসে বুকিং করে রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য সেটার কোনো দরকার ছিলনা। পরে জেনেছিলাম, ওই গেস্ট হাউস ছাড়া সেখানে আরো দুটো হোটেল ছিল। একচিলতে ছবির মত সুন্দর শহর। বাংলোটা থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে তিস্তা। তিস্তা এখানে স্থবির, শান্ত, সংযত। আসার আগে আমার মনে খুব একটা আনন্দ ছিলনা। উত্তরবঙ্গে যাব অথচ দার্জিলিং যাব না, এ আবার হয় নাকি! বাবাকে বলতে বাবা শুধু হেসেছিলেন। আমি গাঁইগুঁই করছিলাম সমানে। কিন্তু শেষ বিকেলের আলোয় চারিদিকটা দেখে মনটা খুশিতে ভরে গেল আমার। বাবা গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুন্দর বিকেলটা পেছনে রেখে আমি আর মা বাংলো তে ঢুকলাম।

ভেতরে ঢুকে দেখলাম বাংলোটা বেশ বড়। লাউঞ্জে কয়েকটা সোফা রাখা ছিল। মা সেগুলোর একটায় বসে পাশ থেকে একটা পত্রিকা নিয়ে ওল্টাতে লাগলো। আমি অন্যদিকের দেওয়ালে কিছু ছবি টাঙানো ছিল দেখে সেদিকে গেলাম। একটু পরে মায়ের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম,

-"আচ্ছা মা, এখানে দেখার কি জায়গা আছে?"... মা একটা হাই তুলে বলল

-"আমি জানি না বাবা। তোর বাবা জানতে পারে।"

আমাদের থেকে কিছুটা দূরে আর একটা সোফায় বসে কাগজ পড়ছিলেন এক মধ্য পঞ্চাশের ভদ্রলোক। আমার প্রশ্নটা ওনার কানে গিয়ে থাকবে। হাতের কাগজটা নামিয়ে উনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

-"আপনারা কি এদিকে বেড়াতে?"

মা হালকা হেসে মাথা নাড়তে ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন।

-"উত্তরবঙ্গের এত দর্শনীয় স্থান থাকতে আপনারা এখানে...." বলেই সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, "মাফ করবেন, প্রশ্নটা হয়ত একটু বেশী ব্যক্তিগত হয়ে গেল..."

ইতিমধ্যে বাবা এসে পড়েছেন। ওনার প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে বললেন,

-"আপনার অবাক হওয়া টা স্বাভাবিক। এটা আমার ছেলের প্রথম উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ। তাই আমি এখানে আসতে চেয়েছিলাম যাতে ও আসল উত্তরবঙ্গের স্বাদ কিছুটা হলেও পায়। এখানকার রং যাতে ওর মনে অমলিন থাকে চিরকাল।"

এরপরে আমাকে বলা আগের কথা গুলো বলতে উনি ভীষণ আশ্চর্য হয়েছেন বোঝা গেল। বাবাকে বললেন,

-"আপনার কথা গুলো শুনে খুব ভালো লাগলো। অন্যরকম চিন্তা করার মত মানুষের বড়ই অভাব আজ।"

নিজের নাম বললেন অসিতবরণ সান্যাল। সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। গত বছর অবসর নিয়েছেন। স্ত্রী মারা গেছেন তিন বছর আগে। ছেলে অধ্যাপক। হাতে অখণ্ড অবসর। তাই ভ্রমণের শখটা বজায় রেখেছেন। চা এসে গেছিল। বাবা জানতে চাইলেন,

-"আপনি কি আগে এসেছেন এখানে?" অল্প একটু হেসে উনি বললেন,

-"আমি জানতাম আপনি এই প্রশ্নটা করবেন। এটা আমার উনিশতম।"

বাবা একটু আশ্চর্য হলেন। আশ্চর্য হবারই কথা। হিমালয়ের কোলের এক প্রত্যন্ত জনবিরল মফস্বলে একজন লোক যদি উনিশ বার আসে, তবে সেটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। আমরা প্রত্যেকেই যে কথাটা ভাবছিলাম, সেটা মা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল,

-"আপনি এখানে এতবার....মানে.."

অসিত বাবুর চা খাওয়া হয়ে গেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে মাফলারটা ঠিক করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন,

-"আমি এখানে অক্সিজেন দেখতে আসি।"

আজ এত বছর পরেও অসিত বাবুর বলা ওই কথা কটা আমার মনে অটুট। জীবনের প্রতিটি চড়াই-উতরাই এ দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছি "আমি কি অক্সিজেন দেখেছি? অক্সিজেন কি দেখা যায়?" কাদাজল মেখে ফুটবল খেলা, রাত জেগে হোস্টেলে সরস্বতী পুজোর কাজকর্ম করা, বিদেশ যাওয়ার ছাড়পত্র বা পরবর্তী কালে চাকরিতে প্রমোশন অথবা সমাজ কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তথাকথিত নিষিদ্ধ কিছু কাজ...সমস্ত কিছুকেই সেই সময় গুলোতে মনে হয়েছিল অক্সিজেন। আর তার পরে নিজের মনে হেসেছি আর বুঝেছি "হেথা নয়, হেথা নয়/ অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।"

অনিমা আমার জীবনের প্রথম নারীসঙ্গ। স্কুলে পড়ার সময় আলাপ। অনেক দিন ওর সাথে কোচিং কামাই করে গঙ্গার ধারে বসে থেকেছি, নৌকায় করে ঘুরেছি খোলা গঙ্গার ওপর। সেরকমই একদিন, সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে মনে মনে বলেছিলাম,

-"অনিমা তুই আমার অক্সিজেন। আজ আমি তোকে দেখতে পেয়েছি।"

সেদিন অনেক রাত্রে গোপনে লিখেছিলাম "তোমার চোখের বিজলি উজল আলোকে/পরানে আমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে" .....সরস্বতী পুজোর দিন সকালে দুরুদুরু বক্ষে অনিমাকে লাইন দুটো পড়ে শোনাতে সে বলেছিল,

-"আমার এই লাল রঙের শাড়ী টা কি ভালো না, জানিস তো এটা না বড়পিসী দিয়েছে..."

উধাও হয়ে গেছিল আমার সাময়িক অক্সিজেন।

অপালার সাথে দেখা হয় ইউনিভার্সিটি তে পড়ার সময়। তখন কলকাতায় একা থাকি। আমার লেখা কবিতা পড়তে ভালবাসত অপালা। এক পূর্ণিমার সন্ধ্যেতে দুম করে ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিল – "ভালবাসি"। তারপর ও আসত আমার বাড়ি। ওর হাজারো অর্থহীন কথার মধ্যে আমি দেখার চেষ্টা করতাম অক্সিজেনের অবয়ব। অপালার কালো অন্তর্বাস, আমাকে হাতছানি দিত এক অদৃশ্য রহস্যময়ী দুনিয়ার। শরীরী খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর চলে যেত অপালা। আমার সারা ঘরে ছড়িয়ে থাকত ওর সুগন্ধের মাদকতা। পরদিন আবার অপালার বুকের সুগন্ধ নিতে নিতে বিড়বিড় করতাম,

-"এই তো দেখা পেয়েছি, আবার আমার অক্সিজেনের।"

অপালাও থাকেনি। হঠাৎ একদিন না বলে কয়ে উধাও হয়ে গেছিল। এক প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে আমার বাড়ী থেকে ফেরার সময় বাস দুর্ঘটনায় অপালা মারা যায়।খবর পেয়ে আমি যাওয়ার আগেই সব শেষ। আমার এক বন্ধু ডাক্তার পোস্ট মর্টেম করেছিল।আমাকে দেখে, এক পাশে ডেকে বলে,

"ওনার তিনহপ্তা চলছিল। তোর ওকে একলা এমন ভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি।".....বাড়ী ফিরে সেদিন অপালার সাথে শেষ বার কথা বলি "তোমার শরীরের চোরাবালিতে আমার মৃত্যু হয়েছে আজ"...

জীবন থেমে থাকেনি। পিছু ফিরেও তাকায়নি। বন্ধুত্ব, ভালবাসা, রাগ, অভিমান... বহুবার মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছে অক্সিজেনের... কিন্তু অধরাই থেকে গেছে চিরকাল। সিগারেটের নীল ধোঁয়ায় আমার ফুসফুসের রং এখন কালো। এই বৃদ্ধ বয়েসে যখন অসিত বাবুর কথাটা নির্মম ভাবে কানে বাজে, ফেলে আসা জীবনের পাতা গুলো উল্টোতে থাকি অক্সিজেন খোঁজার প্রয়াসে। হঠাৎ চোখে পড়ে প্রায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া এক মলিন স্মৃতি, চিরকাল যাকে অনাদরে অথবা ভয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম।

নাম না জানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার আনন্দ আমি কোনদিনই ভুলিনি। তাই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তাম অদৃশ্যের উদ্দেশ্যে। সেরকম একদিন ট্রেনে যেতে যেতে জানলা দিয়ে একটা সুন্দর গ্রাম দেখলাম। কি মনে হল, নেমে পড়লাম। মেঠো পথ ধরে হাঁটছি, সামনে একটা বাঁক। অগোছালো ভাবে বাঁকটা পেরিয়ে সামনে দেখি....

মাঝারি মাপের একটা দীঘি। একদিকে সবুজ বাঁশঝাড় আর অন্য দিকে একসারি খয়েরি রঙের সুপুরি গাছ, দীঘির আব্রু রক্ষা করছে সযত্নে। সমস্ত দীঘি জুড়ে ফুটে আছে অজস্র পদ্মফুল। মাঝে মাঝে পদ্মপাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি

দিচ্ছে দীঘির কালো জল। দীঘিটাতে একটাই মাত্র ঘাট। সেই ঘাটের পৈঠায় বসে আছে এক বিষণ্ণ যুবতী, হলদে একটা শাড়ী আটপৌরে ভাবে এলিয়ে আছে তার গায়ের ওপর। পায়ের কাছে পড়ে আছে এক গাদা বাসন। যুবতীর কাজে মন নেই। বাঁশ বনের মধ্যে দিয়ে নরম সূর্যের আলো এসে পড়ছে তার পায়ের কাছে। বোধহয় ভয় পাচ্ছে, পাছে যুবতীর শরীরে স্পর্শ করলে তার ধ্যান ভেঙ্গে যায়। একটা বৌ-কথা-কও পাখি দেখলাম। কিন্তু আজ সেও যেন ডাকতে ভুলে গেছে। কোথাও একটুও শব্দ নেই। বিশ্ব সংসারে সবাই যেন চুপ করে এই অশ্রুতপূর্ব গান শুনছে। আকাশে তখন কিছু অনভ্যস্ত মেঘের আনাগোনা। মনের মধ্যে কে যেন গুনগুন করে,

"অক্সিজেন দেখে নাও, অক্সিজেন দেখে নাও।"

-"বাবু, অ বাবু, ওঠেন। ইবার যাইতে হইব।"

হঠাৎ আহ্বানে চমকে উঠি। দেখি সামনে আমার নৌকার মাঝি। হকচকিয়ে যাই। অজান্তে বলে ফেলি,

-"কোথায় নিয়ে যাবি রে?"

-"ওই হোথায়। চলেন। আপনার লগে বইস্যা আছি। আপনাকে পার কইরা তবে মোর ছুটি। আজ আমি ঘর যাব বটেক। মোর মাইয়াটাকে দেখি নাই কতকাল.... লেন, ওঠেন এবার।"

-"আর বাকিরা? মা, বাবা, অসিতবাবু....তারা সব কোথায়?"

-"সেই হক্কালে তেনাদের রাইখ্যা এসেছি গো। শুধু আপনার লগে আবার আসিতে হইলো মোকে।"

উঠে পড়ি। লেখার খাতা, পেন, চশমা, ঘুমের ওষুধ সব পড়ে থাকে। জানলা দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়ে আমার আরাম কেদারায়। সেই আলোতে আর এক বার দেখে নিই সবকিছু। আচমকা চোখ যায় দেওয়ালে। মা-বাবার একসাথে একটা ছবি। প্রথমবার উত্তরবঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তোলা। তিস্তার জল থেকে যে ভাঙ্গাচোরা গাড়ীটা উদ্ধার করেছিল সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা, সেখানে দলাপাকানো কিছু মাংসপিন্ড ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিলনা। বাবার এক ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ার আগে পর্যন্ত আমি পরিস্থিতির ভয়াবহতা আন্দাজ করতে পারিনি। অজান্তে একটা প্রণাম করি অদৃশ্যের উদ্দেশ্যে। আর দেরী নয়। এবার প্রস্তুত হই। আমার নৌকা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

বাঙ্গালি করেছে ভগবান রে

শাক্য মুনি

জুলাই ১৪, ২০১৩

আমাদের বাঁকু বাবু দুঃখ করে লিখেছিলেন, গ্রিনল্যান্ডেরও ইতিহাস আছে, মাওরি জাতিরও ইতিহাস আছে, কিন্তু বাঙালীর ইতিহাস নেই। তা সে আজ বহু বচ্ছর হল। তারপর এই আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য জাতের বহু গণ্যমান্য পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ তাঁদের সারা জীবনের চেষ্টায় ধীরে ধীরে বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাস নির্মাণের কাজ করে গেছেন। কাজটি সরল একরৈখিক নয়, কারণ ইতিহাসের ধারা কখনও অভিপ্রেত ঋজু রাস্তা বেয়ে চলে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই সমস্ত বিভিন্ন পুঁথিপত্তর ঘেঁটে কিছুটা বুঝেছি, কিছুটা বুঝিনি, সেই সব বোঝা না-বোঝা মিলিয়ে গোদা বাংলায় আদিম ও মধ্যযুগীয় বাঙালী চরিত্রের একটা অতি-সরলীকৃত ঐতিহাসিক রূপকল্প নির্মাণ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ভুলভ্রান্তি সে তো মানুষেরই, তাই সেরম কিছু মনে হলে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন অথবা এঁড়ে বাছুরের মত শিং উঁচিয়ে তক্কো করবেন, কোনটাতেই আপত্তি নেই। পাঠক শুধু একটি কথা মাথায় রাখবেন, এই লেখা কোনও ফর্মাল রিসার্চ পেপার নয়, অথবা জ্ঞানদানন্দিনী প্রবন্ধ নয়। নেহাতি আড্ডার ছলে গল্পগুজব করবার মত, চায়ের দোকানে বসে আচমকাই যেমন কথায় কথায় একটু আধটু ইতিহাস ফিতিহাসের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, এই লেখাকে সেইভাবে দেখলেই আমার এবং আপনার, উভয়েরই মঙ্গল।

অতঃপর, যুদ্ধবাজ, পরাক্রমী আর্য ইনভেডাররা জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষের প্রাচীন নাম) উত্তর পশ্চিম অংশ দিয়ে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করল ও এখানকার আদি ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী (মূলত আদি-অস্ট্রেলীয় ও নিগ্রোবটু) গুলিকে পরাভূত করে নিজেদের স্থায়ী বাসভূমি রচনা করতে শুরু করল। এরও আগে এদেরই পূর্বপুরুষ কাশীয়রা খ্রিস্ট-পূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতাকে ধ্বংস করে নতুন উপনিবেশ গঠন করেছিল, যাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল 'সূর্যস্' এবং পবন দেবতার নাম ছিল 'মরুত্তস্' (সংস্কৃত মরুৎ)। এইসমস্ত উন্নত নাসিকা, দৃঢ় চোয়াল ও দীর্ঘ মুখাবয়ব সম্পন্ন সাদা চামড়ার আদি-নর্ডিক গোত্রীয় মানুষদের তস্য তস্য ছানা-পোনারাই উত্তর-পশ্চিমের দুর্ভেদ্য মরু-পর্বত অতিক্রম করে এসে ভারতের আদিম সামাজিক কাঠামোটিকে নড়িয়ে দেয় এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম 'বৈদিক সভ্যতা'র পত্তন ও বিস্তার করে।

এরা মূলত ছিল শিকারজীবী ও পশুপালক (হান্টার গ্যাদারার) এবং কৃষিকাজ এরা জানত না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এদের সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি (যথা- অগ্নি, বায়ু, জল) কে সন্তুষ্ট করবার জন্য এরা যাগযজ্ঞ করত, তাঁদের উদ্দেশ্যে দুধ ঘি মদ মাংস উৎসর্গ করত, এবং এই সমস্ত শক্তির কাছে নিজেদের অন্ন, বস্ত্র, সুরক্ষা, সমৃদ্ধি কামনা করত। আর এই গোটা প্রসেসটির কালেক্টেড গ্লোরিফায়েড নাম হল ঋগ্বেদ সংহিতা।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় থেকে নবম সূক্ত হল প্রাচীনতম এবং বাকি গুলি আপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ও প্রক্ষিপ্ত অংশ, যা পরে অর্থাৎ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে গুপ্ত রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ও গ্রন্থিত হয়।

যাইহোক, তো কালক্রমে এই বৈদিক জনগণ যখন মূল ভারত ভূখণ্ডের গভীরে অগ্রসর হতে লাগল তখনই তাদের এই ভূভাগের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে শুরু করল এবং এই সমস্ত কালো কুচকুচে গোলগাল বেঁটে খাটো আদিম অধিবাসীদের ধন সম্পত্তি ও উর্বরা কৃষি জমি দেখে আর্য নেতাদের চোখ কপালে উঠে গেল। এবং এর ফলে যে অবশ্যম্ভাবী ক্যাঁচালের সূত্রপাত হল তার সরস আখ্যানের নাম রামায়ণ। বস্তুত সীতাকে নিয়ে রাম ও রাবণের মধ্যে রামায়ণের যে লড়াই তা তো আসলে এলাকা দখলেরই লড়াই। রামায়ণের সীতা তো বসুন্ধরার কন্যা, লাঙলের ফলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া, সে তো আসলে ভারতবর্ষের সুজলা সুফলা উর্বরা জমিরই মেটাফর, আর এই জমির দখলদারি নিয়েই তো আর্য রাম ও অনার্য রাবণের মধ্যে লড়াই।

এইখানে একটা কথা বলে নেওয়া জরুরী। এই সমস্ত আর্য ইনভেডারদের রণ নিপুণতার কাছে অনার্য ভূমিজরা ছিল নেহাতি ছেলে মানুষ। তার প্রধান কারণ আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের নমনীয় জলবায়ুতে দীর্ঘদিন নিরুপদ্রবে বসবাস করবার ফলে এবং কৃষিপ্রধান মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কমনীয়তার গুণে এরা অর্থাৎ ভূমিজ আদিবাসীরা যুদ্ধ টুদ্ধ খুব একটা ভালো পারতনা। আর অন্যদিকে মধ্য এশিয়ার রুক্ষ বালুকা-বিক্ষুব্ধ প্রান্তর পেরিয়ে আসা আর্যরা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে হয়ত এদের চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়েই ছিল। উপরন্তু যুদ্ধবিদ্যার অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত দিক থেকেও আর্যরা ছিল উন্নত, যীশুর জন্মের দু'হাজার বছর আগেই তারা লোহার ব্যাবহার শিখে ফেলেছিল। ফলে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে আর্য প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত আদিবাসী কৌম সমাজ গুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করল। (এই সমস্ত কৌম গণরাজ্যগুলিকে শায়েস্তা করবার শাস্ত্রীয় পন্থা বাৎলানোর জন্য বিখ্যাত একজন টিকিধারি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হলেন বিষ্ণুগুপ্ত, যাঁকে আমরা চাণক্য নামে চিনি।) আর্য হানাদারদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে এইসব ভূমিজ সন্তানেরা লুকালো গিয়ে মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ জঙ্গলের গভীরে, টিলা ও পাহাড়ের কন্দরে। এবং পরবর্তী কয়েক হাজার বছর ধরে এই সমস্ত অনার্য জাতিগুলি অসুর, দস্যু, রাক্ষস, ম্লেচ্ছ, ব্রাত্য, আদিবাসী, সাঁওতাল, ও সর্বশেষ 'মাওবাদী' নাম নিয়ে এই সমস্ত পাহাড় জঙ্গল ঘেরা দুর্গম প্রদেশগুলিতে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগলো।

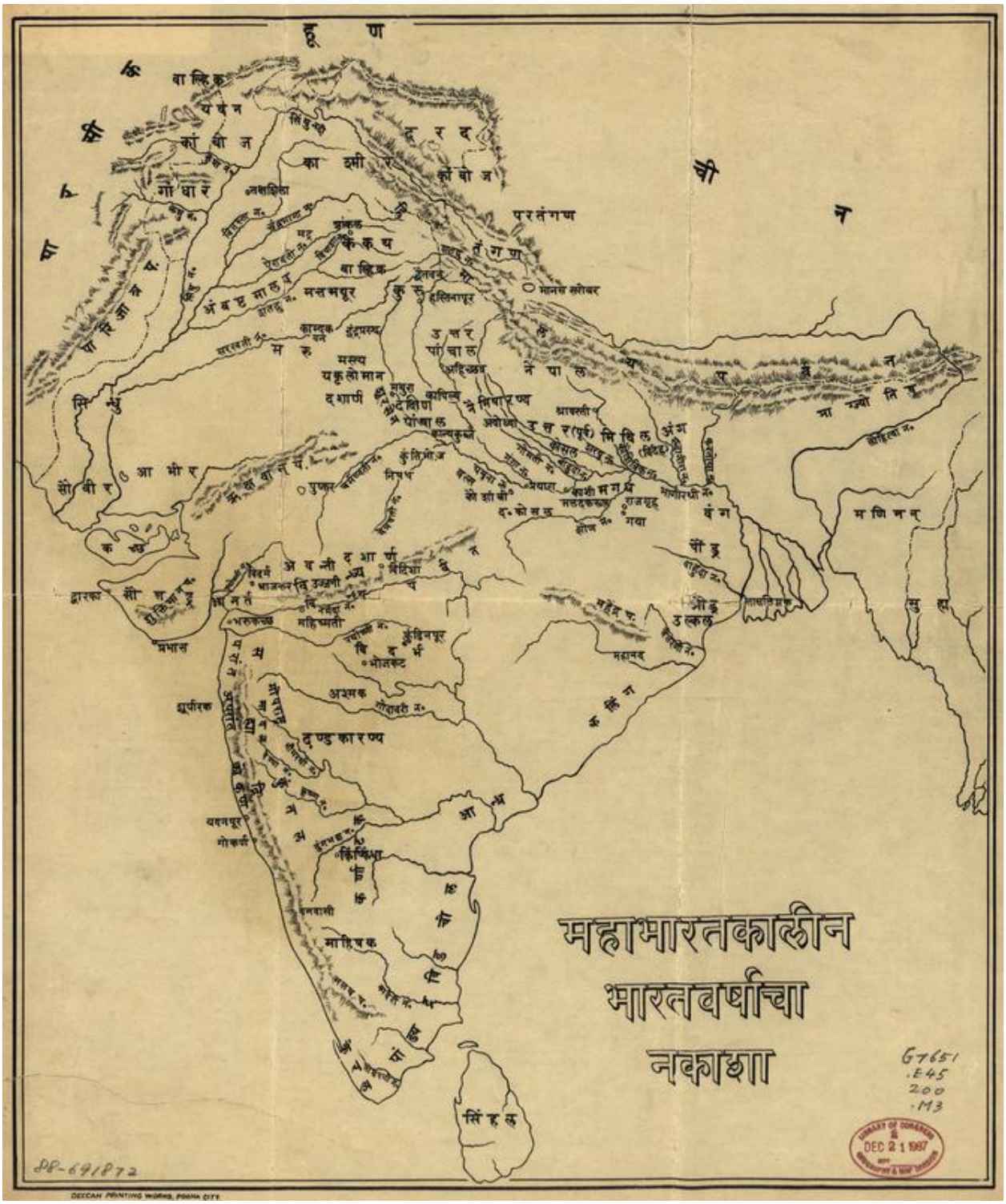

এতো গেল আদ্দিকালের কথা। কিন্তু এসবের সঙ্গে 'বাঙালির' যোগাযোগটা কি? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সবার প্রথম যে পাল্টা প্রশ্নটা করবার তা হল 'বাঙালি' কে বা কারা? আর প্রাচীন ভারতের নিরিখে বাংলা বা

বাংলাদেশের অবস্থানই বা ঠিক কোন জায়গায়? আজকের বাংলা আর আগেকার বাংলা কি একই ভূখণ্ডকে বোঝায়? আর সর্বোপরি 'বাংলা' বলে আদৌ কি কিছু ছিল পূর্বে? অত্যন্ত সংক্ষেপে বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো।

কি ছিল, আর কি ছিলনা সেসব জানবার জন্য পুরানো পুঁথিপত্র আর শিলাশাসনের ওপর ভরসা করা ছাড়া আর কোনও উপায় আমাদের নেই। সেই পুঁথিপত্রের নমুনা দু'একটা দেবো, কিন্তু তার আগে এটা বলা দরকার যে আজকের বাঙালি অধ্যুষিত বাংলা (পশ্চিম ও পূর্ব মিলিয়ে) আগে ছিল বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট অঞ্চল ভিত্তিক কোমের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ দুই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্বাংশ মিলিয়ে যে বিশাল ভূখণ্ড তা আসলে অজস্র ছোট ছোট কৌম গণসমাজে বিভক্ত ছিল। যার মধ্যে ছিল পুণ্ড্র, সুহ্ম, রাঢ়, বঙ্গ, বগধ (মগধ), কলিঙ্গ প্রভৃতি কোমগুলি। বঙ্গ শব্দের সবচেয়ে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় *'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে যেখানে "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের-পাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি"* [ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১] পদে বঙ্গ এবং তার নিকটবর্তী বগধ ও চের রাজ্যের (ভারতের আদিমতম দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী) নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই গ্রন্থে বাঙালি কে "আর্যভূমির প্রাচ্য-প্রত্যন্তদেশীয় দস্যু কোম" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এদের ভাষা কে পাখির কিচিরমিচির বলে হ্যাটা করা হয়েছে। এরপর হিন্দু স্মৃতিকার বোধায়নের 'আর্যধর্মসূত্রে' বঙ্গ ও তার প্রতিবেশী দেশ কলিঙ্গের নাম উল্লেখিত হয়েছে এবং এখানকার লোকেদের "সংকীর্ণযোনি ও অপবিত্র" বলা হয়েছে এবং এই দেশে গেলে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে [*অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রেমগধেষু চ / তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমহর্তি*]।

এছাড়া খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন জৈন গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সুত্রে' দেখা যাচ্ছে যে মহাবীর নাকি লাঢ় দেশে (রাঢ় দেশ, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম বর্ধমান মুর্শিদাবাদ হুগলী সহ দক্ষিণ বঙ্গের বিস্তীর্ণ ভূভাগ) ধর্ম প্রচার করতে আসেন এবং এখানকার নিষ্ঠুর লোকেরা তাঁর দিকে কুকুর লেলিয়ে দেয় (ঢ্যামনামিতে বাঙালি তখন থেকেই অদ্বিতীয়)।

আবার এরই পাশাপাশি সিংহলী পালিগ্রন্থ 'মহাবংশ' থেকে বাঙালীর বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ মেলে যেখানে দেখা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে রাঢ় দেশের সীহপুরের রাজা সিংহবাহুর পুত্র রাজকুমার বিজয়সিংহ তাম্রলিপ্ত বন্দর হয়ে সমুদ্র পথে শ্রীলংকা গিয়ে সেখানে নগর ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনেক পণ্ডিতের মতে এই 'সীহপুর' বর্তমানের আমাদের 'মা-মাটি-মানুষের' জন্মভূমি ন্যানো-ফ্যাক্টরি খ্যাত হুগলীর সিঙ্গুর গ্রাম। এবং শ্রীলঙ্কার পূর্বতন 'সিংহল' নামটির পিছনের ইতিহাসেও এই সিংহ বংশের রাজকুমার বিজয়সিংহের বিশেষ অবদান রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই!

মহাভারতেও অন্যান্য ম্লেচ্ছ কোমদের সঙ্গে সুহ্ম ও পুন্ড্রের নাম একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে, তবে প্রত্যেকবারই অগৌরবের সঙ্গে। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে বঙ্গরাজ নাকি পাপাচারী কৌরব পক্ষে যোগদান করে দুর্যোধনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া আদি পর্বে তৃতীয় পান্ডব ভীম নাকি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, প্রভৃতি ম্লেচ্ছ কোমগুলিকে পরাজিত করেন, এবং ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করেন। অবশ্য গভীর

জঙ্গলের মধ্যে আর্য ভীম ও অনার্য হিড়িম্বির প্রেম কাহিনী ও তাঁদের হাফ-রাক্ষস সন্তান ঘটোৎকচের জন্ম সংক্রান্ত মুচমুচে স্ক্যান্ডাল নিয়ে আর বেশী কথা বাড়াচ্ছি না। যার যা বোঝবার বুঝে নিন।

এছাড়া গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস তাঁর 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে "গঙ্গারিডি" বা "গঙ্গারিদয়" নামে পূর্ব ভারতের কোনও এক দুর্ধর্ষ রাজ্যের কথা লিখে গেছেন, যাঁদের নাকি ৭০০ হস্তী, ১০০০ অশ্বারোহী ও ৬০০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল, এবং এই বিপুল পরিমান হস্তী সম্বলিত সৈন্যের খবর পেয়ে ৩২৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে বিশ্ববিজেতা গ্রীক সম্রাট অ্যালেকজান্ডার নাকি বিশ্বজয়ের স্বপ্নে দাঁড়ি টেনে পাঞ্জাব থেকেই ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান হয়েছিলেন। [প্রসঙ্গত, এই একটা অদ্ভুত কাজের নিরিখে আমরা বোধহয় সবার অলক্ষ্যে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে আছি। বুনো হাতিকে পোষ মানাবার পদ্ধতি আমাদের আগে কেউ আবিস্কার করেছিল বলে মনে হয় না।] পরবর্তীকালে টলেমী ও প্লিনির বিবরণ অনুযায়ী আজকের পণ্ডিতদের অনেকেই মনে করেন যে বর্তমান বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ এই "গঙ্গারিদয়" রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই নিয়ে বিস্তৃত কচকচানি জানবার উৎসাহ থাকলে চট করে একবার এই সংক্রান্ত উইকি পেজটি থেকে ঘুরে আসুন। ততক্ষন আমি একটা বিড়ি খেয়ে আসি।

হ্যাঁ তো যে কথা বলছিলাম, বাঙালি কোথা হইতে আসিল ও কি তাহার আত্মপরিচয়? আশা করি উপরের এই অল্প কয়েকটা উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে স্মরণাতীত কাল থেকেই বাংলার ও বাঙালীর সঙ্গে তথাকথিত সংস্কৃতিবান বৈদিক আর্যদের সম্পর্ক ছিল সাপে নেউলে। যেসব বাঙালি ভদ্রলোক ও লেডিস নিজেদের বৈদিক ঋষি মুনিদের সন্তান সন্ততি জেনে ও মেনে বাথরুমে গর্ব অনুভব করেন তাঁদের জন্য দুঃসংবাদ! গুপ্তযুগের আগে অর্থাৎ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের আগে বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদিকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই পুণ্ড্রবর্ধনে (বর্তমান বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ) বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মহাস্থানগড় শিলালেখ থেকে। অর্থাৎ জম্বুদ্বীপে আরিয়ান ইনভেশানের পর থেকে প্রায় দুই-তিন হাজার বছরে যখন এদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বৈদিক সংস্কৃতি রমরমিয়ে বিকাশ লাভ করেছে এবং ক্রমে ক্রমে তার বিস্তৃতি যখন বাংলার নাকের ডগায় মিথিলা (বর্তমান উত্তর বিহার) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তখন অন্যদিকে এদেশের পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ বৃহত্তর বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসিরা তাদের অবৈদিক, লোকায়ত ও আদিম সংস্কৃতিকে আঁকড়ে সুখে দিন যাপন করছে। আর সেই জন্যই বৈদিক মুনি ঋষিরা বাঙালিদের মোটে সহ্য করতে পারতেন না এবং সুযোগ পেলেই তাদের উদ্দেশ্যে শাপশাপান্ত করতে ছাড়তেন না। অনার্য অবৈদিক বাংলাকে সহজে বাগে আনতে না পেরে এবং ভিন্ন প্রকৃতির সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পেরে তাঁরা তাঁদের পুঁথি পত্তরে এইসব আদিম বংদের ব্রাত্য বানিয়ে দিলেন। কারণ জীবিকা থেকে শুরু করে পুজোআচ্চা পদ্ধতি, সামাজিকতা, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই দুই দলে ছিল গঙ্গা গঙ্গা ফাঁক। আর মজার কোথা হল সেই ট্রাডিশান আজও সমানে চলছে। আজও আপনার ডিনারের মেনু আর একজন দক্ষিণ ভারতীয় গোঁড়া ব্রাহ্মণের মেনু মিলিয়ে দেখুন, পরিষ্কার বুঝতে পারবেন কি বলতে চাইছি।

আর ঠিক এই কারনেই ভারতের অন্যান্য অনেক জাতের লোকেরাই বাঙালি কালচারকে এখনো পুরোপুরি হজম করে উঠতে পারেন না। যে যে স্থানে বৈদিক সংস্কৃতি পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে আমাদের বাঙালিদের এসেন্সিয়ালি একটা বড়সড় গ্যাপ রয়ে গেছে আজও। হ্যাঁ, এই এত বছর পরে এত রকমের রক্ত মেশাবার পরেও আমরা বাঙালীরা বাকিদের থেকে অনেকটাই আলাদা, অনেকটাই প্রোগ্রেসিভ। কারণ আমরা চিরকালই রোম্যান্টিক, রেবেলিয়াস, রঙিন। গোঁড়ামিকে আমরা কোনোকালেই পাত্তা দিইনি (গোঁড়ামি সে ধর্মীয় বলুন বা রাজনৈতিক), তাই ধর্মের রুক্ষ পাষাণ বেদী থেকে দেবতাকে আমরা নামিয়ে এনেছি ঘরের উঠোনে, শিব ঠাকুর কে জামাই বানিয়ে বিয়ে দিয়েছি ঘরের মেয়ে উমার সঙ্গে আর কেষ্ট ঠাকুরের মামিমা রাধার সঙ্গে অবৈধ প্রেম নিয়ে আমরা বেঁধেছি প্রাণের গান, ভক্তিরসের উন্মাদনায় কাতর হয়েছি, পাগল হয়েছি, বিপ্লবী হয়েছি আমরা, পৈতে ছেড়ে গলায় দিয়েছি কণ্ঠীর মালা। প্রেম ও যৌনতার ট্যাবু কে অবলীলায় ছিন্ন করে তাকে জুড়ে দিয়েছি রিচুয়াল প্র্যাকটিসের সঙ্গে। কট্টর মৌলবিদের চোখ রাঙানি কে উপেক্ষা করে আমরা পরিধান করেছি বেশরিয়ত ফকিরের আলখাল্লা। আর বৃহৎ বঙ্গের এই চিরায়ত বিপ্লবী সত্তাই গোঁড়া হিন্দুত্বের পেন্টাগনে কামান দেগে পথ করে দিয়েছে এক যুগান্তকারী মতবাদের, সে পথ মহানির্বাণের, করুণার রসে সিক্ত সেই পথে হেঁটে আত্মদ্বীপের আলোকে আলোকিত হয়েছে মানুষ, জন্ম হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের। সনাতন ধর্মের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে শঙ্খ-ঘন্টা-ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়েছে "বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি" মন্ত্র। আর মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মকেও আমরা আমাদের মত করে বুঝে নিয়েছি। বৌদ্ধ ধর্মের কঠোর তপস্যা ও সন্ন্যাসের নীরস রাস্তাতেও আমরা আমাদের প্রাণ ধর্মের রাজধানী এক্সপ্রেস চালিয়ে দিয়েছি। একের পর এক প্রথমে মহাযান ও তার পেট থেকে যথাক্রমে বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানের হাত ধরে সহজিয়া মেঠো পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে ধর্মীয় শাসন তন্ত্রের বাঁশের বেড়াজাল, আর সেই বেড়ার ফাঁক গলে আমরা ছাগলের তৃতীয় সন্তানেরা মনের আনন্দে নৃত্য করতে করতে বেড়ে উঠেছি আমাদের মত করে। অন্ত্যজ প্রান্তিক মানুষের প্রাণের কাছাকাছি এসেছে তার জীবনের ধর্ম, হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বাসে সম্পৃক্ত হয়েছে তার অন্তরের দেবতা, সে লিখেছে বেঁচে থাকার গান, চর্যাপদের গান।

তবে গুপ্ত যুগের বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অল্প বিস্তর যা কিছু দেখা দিয়েছিল, পাল যুগের বৌদ্ধ প্রভাবকে কাটিয়ে সেন-বর্মন যুগে এসে তার চরমত্ব প্রাপ্তি ঘটল। সেন এবং বর্মনরা উভয়েই মূলত দক্ষিণ ভারত থেকে আসা গোঁড়া হিন্দু রাজবংশ যাঁরা বাংলায় সাম্রাজ্য বিস্তার করবার পর এখানকার বাঙালিদেরকে নিজেদের সনাতন হিন্দু ডোমেনের মধ্যে এনে ফেলতে চাইলেন। তাঁরা পূর্ববর্তী পাল যুগের বৌদ্ধ প্রভাবকে সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডন করবার জন্য যা কিছু করবার করেছিলেন। ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, জীমূতবাহন প্রভৃতি এই সময়কার স্মৃতিকারেরা তাঁদের স্মৃতি-শাস্ত্র গ্রন্থ গুলিতে হিন্দু বর্ণভেদ প্রথাকে আরও সুচারুভাবে প্রয়োগ করে বাঙালী সমাজের চুলচেরা স্তরায়ন করে ফেললেন এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রচনা করে তাকে শাসন করবার যাবতীয় ফর্মুলা দিয়ে দিলেন। বস্তুত সেন আমলের বাংলায় হিন্দু গোঁড়ামি, বর্ণ বিভাজন ও কদর্যতা যে লেভেলে পৌঁছেছিল তা এর আগে ও পরে খুব একটা চোখে পড়েনা। বলা বাহুল্য সেন রাজারা বিশেষত বল্লাল সেন ব্যাপারটিকে পুরোপুরি সাপোর্ট করেছিলেন। কট্টর হিন্দু হওয়ার সুবাদে তাঁরা বাংলার চিরায়ত বৌদ্ধ ও অনার্য শ্রেণীকে খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না। আর ফলে বৌদ্ধ আচার্যরাও এঁদের সহ্য করতে পারতেন না। পনেরশ' শতকের তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারানাথের লেখা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে হিন্দু রাজাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং তুর্কী সেনাদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে বিহারের একদল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই নাকি তুর্কী সেনাদের বাংলার হিন্দু সেন রাজাদের দিকে লেলিয়ে দেন এবং ঝাড়খণ্ডের গহন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অতর্কিতে বাংলায় প্রবেশ করার রাস্তা বাৎলে দেন। "মরবোই যখন তো আমরা একা কেন, তোরাও সঙ্গে মর!"

অন্যদিকে বর্ণ বিভাজন এবং জাতপাতের চক্করে পড়ে সেনরাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তিতেও যেমন কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয় তেমন সাধারণ জনজীবনে অপরিমিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অবাধ যৌন ব্যাভিচারে তখন সারা বাংলা জর্জরিত। ধর্মের নামে যৌনতার প্র্যাকটিস চলছে সর্বত্র, হিন্দু মন্দিরগুলোতে ঠাকুর দেবতা কম, সেবাদাসী আর দেবভোগ্যা বেশ্যার সংখ্যা বেশী। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মকেই গ্রাস করেছে তন্ত্র ধর্মের বিবিধ যৌন কদর্যতা ("গুহ্যসমাজতন্ত্র" নামে একটা বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুহ্যাচারের পুঁথি পড়তে গিয়ে তো আমার চোখ রীতিমত কপালে উঠে গেছিল মশাই! তন্ত্র সাধনার নামে বারো ও ষোল বছরের মেয়েদের সঙ্গে যৌনসঙ্গম করা তো কিছুই না, দেবতার উদ্দেশ্যে রীতিমত নিজেদের মল মূত্র বীর্য ও রজঃ উৎসর্গ করবার এবং প্রসাদ হিসাবে সেই সব খাওয়ার বিধান দেওয়া আছে। আবার এমনও দেবতা ছিল যাঁদের পুজো করতে গেলে হাতির মাংস দেওয়া একেবারে মাস্ট মাস্ট মাস্ট!!!) গুহ্য জাদু বিশ্বাস আর সেক্স-এর বাইরে ধর্ম বলতে মানুষ আর কিছু বুঝতেই পারছেনা। দেশের প্রধান উৎসব হচ্ছে গিয়ে চৈত্র মাসে মদনদেবের কাম-মহোৎসব! আর এই মার্কেটে আবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট সামন্ত জমিদারেরা সেন রাজাদের অখণ্ড কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিচ্ছে, বিভিন্ন প্রান্তে ছুতোয় নাতায় বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে। মোটমাট একদিকে চরম নৈরাজ্য আর অন্যদিকে ধুন্ধুমার মোচ্ছবের ওলট পালট হাওয়ায় দোল খাচ্ছে সেকালের বাংলা।

কিন্তু কথায় বলে যা কিছুর শুরু আছে তার শেষও আছে। তাই বাঙালীর এই স্বাধীন চিরায়ত মোচ্ছবের পালা অচিরেই সাঙ্গ হল যখন বারশ' শতকের গোড়ায় ইক্তিয়ার উদ্দীন বিন বক্তিয়ার খিলজি নামে এক দুর্ধর্ষ তুর্কী যুদ্ধ ব্যবসায়ী আঠেরোটি অশ্বারোহী নিয়ে এসে নবদ্বীপে হিন্দু সেন বংশের শেষ পরাক্রমশালী রাজা লক্ষণ সেনের (বল্লাল সেনের ছেলে) রাজধানী সীজ করল এবং গৌড়বঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করল। এর আগে বিহার-ঝাড়খণ্ডের ভেতর দিয়ে বাংলায় আসবার পথে খিলজি ও তার সৈন্যদল বিহারের শত শত বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করতে করতে আসে, যার মধ্যে ছিল শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত ঔদন্তপুরী মহাবিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহার এবং বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা মহাবিহার (এইসব অঞ্চলগুলিতে বৌদ্ধ বিহারের রমরমার কারণেই ওই অঞ্চলের নামই হয়ে গেল "বিহার" এবং তা আজও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি-সাক্ষ্য বহন করে চলেছে)। ১১৯০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে খিলজীর তুর্কী বাহিনী এইসমস্ত বৌদ্ধ সেন্টারগুলিতে বার বার হানা দিতে থাকে এবং ভারতবর্ষের বৌদ্ধ সংস্কৃতির বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেয়। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে কেবল মাত্র ঔদন্তপুরিতেই তারা প্রায় দু'হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ কে কচুকাটা করে ও যাবতীয় পুঁথি ও গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। নালন্দাও এই নারকীয় ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাঁচেনি। ৩৭ বছর বয়সী এক দুঃসাহসী বৌদ্ধ স্কলার ধর্মস্বামীর লেখা ট্র্যাভেলগ থেকে তৎকালীন নালন্দা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দুর্দশার কথা খানিকটা জানা যায়, যিনি ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে সেই প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতার খবর জেনেশুনেও তিব্বত থেকে পায়ে হেঁটে নালন্দায় পড়াশোনা করবার জন্য এসেছিলেন। এর আঠেরো বছর আগে ধর্মস্বামীর নিজের কাকা নালন্দাতেই তুর্কীদের হাতে নিহত হন। ধর্মস্বামীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে সেকালের আঞ্চলিক রাজারা তুর্কী জল্লাদদের ভয়ে আণ্ডা বাচ্চা নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতেন এবং সাধারণ নাগরিকদের ছেড়ে দিতেন তুর্কীদের হাতে ক্যালানি খাওয়ার জন্য! দেশে কোথাও কোনও অ্যাডমিনিস্ট্রেশান বলে কিছু ছিলনা, না তো ছিল প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা। নালন্দায় পৌঁছে তিনি দেখেন যে সেখানে তখন সাকুল্যে মাত্র ৭০ জন ছাত্র ও রাহুল শ্রীভদ্র নামে একজন ৯০ বছর বয়স্ক মাষ্টারমশাই ব্যাজার মুখ করে বসে আছে। এমনকি নালন্দার বিশ্বখ্যাত গ্রন্থাগারটি তন্ন তন্ন করে হাঁটকে তিনি একটা বইয়ের ছেঁড়া মলাটও বের করতে পারেননি। ভাবুন একবার, অতবড় একটা বিশ্ববিখ্যাত ইউনিভার্সিটির কি চরম দুর্দশা হলে এই অবস্থা হয়! আর সাধারণত এই সব মহাবিহারগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠত এক একটা ছোট ছোট নগরী। কিন্তু আপৎ কালে এই অহিংস বৌদ্ধদের বাঁচাবে কে? তুর্কীরা তো যাওয়া আসার পথে মাঝে মধ্যেই মহাবিহারে এসে ঢুকত আর দু'চারটে করে পণ্ডিতের মুন্ডু কেটে, কিছু স্তুপ-টুপ ভাঙ্গচুর করে, কিছু পুঁথি পত্র পুড়িয়ে চলে যেত। উপরন্তু হিন্দু সেন রাজাদের আমলে মুসলমানদের বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসকে তখনকার বামুনরা পুরোপুরি সাপোর্ট করতেন। অনেক পণ্ডিতের মতে ঔদন্তপুরীর মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ শ্রমণদের মুসলমান জঙ্গিরা প্রথম দেখে নাকি হিন্দু ব্রাহ্মণই ভেবেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের তো টিকি থাকে, বৌদ্ধদের থাকেনা। বিষয়টা নিয়ে তারা দু'একজন চেনা-পরিচিত ব্রাহ্মণকে ধরে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল যে যেসব হিন্দু ব্রাহ্মণরা কোনও গর্হিত অপরাধ করেছে হিন্দু শাস্ত্রে নাকি তাদের টিকি কেটে নেওয়ার বিধান আছে। ব্যাস! আর যায় কোথায়। একে তো হিন্দু বামুন তায় আবার ঘোর পাপী। অতএব মার শালাদের। আর এই খার থেকেই যদি বৌদ্ধ আচার্যরা মরবার আগে আঙুল তুলে তুর্কীদেরকে বাংলায় যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় কি?

নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসস্তুপ

যাইহোক, এইভাবে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লার্নিং সেন্টারগুলি একে একে সমস্ত উঠে গেল, বৌদ্ধ পণ্ডিত ও স্কলাররা সব নেপাল ও তিব্বতে পালিয়ে গেলেন। আর ওদিকে তুর্কী সেনারা বিহার ধ্বংস করার দু'বছর পরেই অর্থাৎ ১২০১ সালে গয়া ও ঝাড়খণ্ডের গভীর পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে পৌঁছে গেল বীরভূম, এবং সেখান থেকে সোজ্জা লক্ষণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ। এবং তারপর ১৯ জন তুর্কী হানাদার ঘোড়া-বিক্রেতা সেজে ভরদুপুরে নবদ্বীপে ঢুকল। তাদের পেছনেই ছিল তুর্কী সৈন্যদলের এক বিশাল ট্রুপ। খিলজী রাজভবন সীজ করা মাত্রই পেছনের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা খোলা তলোয়ার নিয়ে ময়দানে নেমে পড়ল এবং চতুর্দিকে রক্তগঙ্গা বইয়ে এক ভয়ংকর নরমেধ যজ্ঞ চালাল ও বাংলার শাসনতন্ত্র কে বিকেলের মধ্যেই কব্জাগত করে ফেলল। লক্ষণ সেন রাজবাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে খালি পায়ে পালিয়ে গেলেন এবং নবদ্বীপ থেকে আত্মগোপন করে বিক্রমপুরে চলে গিয়ে সেখানেই জীবনের শেষ কয়েকটা দিন রাজার হালে কাটালেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে পুলেরাও নিজেদের গৌড়াধিপ (অর্থাৎ গৌড় বঙ্গের একচ্ছত্র অধিপতি) বলেই দাবী করে গেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই সম্ভবত বাংলায় এই তুর্কী বিজয়ের রাজনৈতিক আফটার এফেক্টসটিকে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তুর্কী মুসলমান যে কি জিনিস সে ইনফরমেশান বোধহয় তাঁদের কাছে ছিলনা। কারণ বাংলার তুর্কী বিজয়ের পরের প্রায় দুশ' বছর ধরে গোটা বাংলার ইতিহাস রক্ত দিয়ে লেখা, সে ইতিহাস শুধুই অত্যাচার, গণহত্যা আর ধর্মান্তরের ইতিহাস। আজকের বাংলার যত বাঙালি মুসলমান আছেন তাঁরা সবাই এক কালে বৌদ্ধ বা হিন্দু ছিলেন। তুর্কীরা বাংলার মাটিতে পা দিয়েছিল একহাতে পবিত্র কোরান শরীফ আর অন্য হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে। বাঙালিদের ধরে ধরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়া ছিল তাদের অন্যতম একটি প্রধান এজেন্ডা। আর এই কাজে যারা তাদের

সাহায্য করত তাদের বলে পীর। আর যে পীর কোনও 'কাফের' (অর্থাৎ অমুসলিম) কে হত্যা করবে বা কোনও কাফেরের হাতে শহীদ হবে সে হল গাজী (এখানে ছোট্ট করে একটা জেনারেল নলেজ দিয়ে রাখি, চাকরির পরীক্ষায় কাজে আসতে পারে - কলকাতায় এইর'ম একজন বিখ্যাত গাজী ছিলেন যাঁর নাম হল সোনা গাজী, আর তাঁর কবরটি যে গলির ভেতর আছে তার বর্তমান নাম সোনাগাছি লেন)। তো এই পীর এবং গাজীরা ছিলেন তুর্কীদের ফিফথ্ ব্যাটেলিয়ান। এঁদের কাজ ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার করা ও সাধারণ মানুষকে ধর্মান্তরিত করা, এবং সন্দেহ নেই যে বাংলায় সেই কাজ তাঁরা সাক্সেসফুলিই করতে পেরেছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল একটু আগেই বাঙালির যে আবেগ প্রবণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে প্রবল অনীহার কথা বলছিলাম এক্ষেত্রেও তার একটা বড় প্রমাণ আজও মেলে। আজও বিয়ে-শাদি হলে বা বাড়ির ছেলে চাকরী বাকরি পেলে অনেক বাড়িতেই সত্যনারায়ণের পুজো দেওয়া হয়। সেই পুজোর প্রধান প্রসাদ হল শিন্নি (আটা, গুড়, দুধ, কলা ও সন্দেশ দিয়ে মাখা এক উপাদেয় ব্যাপার)। এই 'শিন্নি' আসলে একটি পার্সিয়ান শব্দ, মূল উচ্চারণ 'সিরনি' যা এখনও বিভিন্ন ইসলামিক উৎসবের দিনে দরগা ও মাজার থেকে বিতরিত হয়। আর এই সত্যনারায়ণ আসলে সত্যপীর, যিনি মধ্যযুগের বাংলার ইসলামি ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে হয়ত বিপুল সাক্সেস ও পপুলারিটি অর্জন করেছিলেন। তারপর কেটে গেছে বহু বছর এবং বহু কনভার্টেড মুসলমান হয়ত আবার তাদের পুরনো হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে ফিরে এসেছেন, কিন্তু সত্যপীরকে তারা ছুঁড়ে ফেলে দেননি, তাঁকে নিজের মত করে বদলে হিন্দু নারায়ণের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আজও শিন্নি চড়াচ্ছেন তাঁর উদ্দেশ্যে, এদিকে মন্ত্র পড়ছেন বিষ্ণুর!

কিন্তু পনেরশ' শতকের শেষ ভাগে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে লাগল। যে নবদ্বীপ থেকে বাংলার ও বাঙালীর স্বাধীনতা ও বাঙালীর নিজস্বতার তেজস্বী স্বত্বাটি চিরতরে মুসলমানের কব্জাগত হয়েছিল সেই নবদ্বীপেই জন্ম নিল অন্য এক বিপ্লবের স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নদ্রষ্টা দিব্যকান্তি ভাবোন্মাদ যুবা পুরুষটির নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র, ওরফে নিমাই, ওরফে চৈতন্য মহাপ্রভু। চৈতন্যদেব কে নিয়ে মিথের ছড়াছড়ি। মায়াপুরে ও নবদ্বীপে নানা জনে নানা ঢপের গপ্পো ফেঁদে বসে দু'পয়সা কামাচ্ছে। কিন্তু সেসবে কান দিলে আমাদের চলবে না। আমরা শুধু এটুকু জেনে রাখবো যে মধ্যযুগের বাংলায় চৈতন্যদেবের মত ধুরন্ধর পলিটিশিয়ান এবং তুখোড় বাস্তব বুদ্ধি-সম্পন্ন বাঙালি আর একটাও জন্মায়নি। তিনি শুধুই বুদ্ধিমান ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত জননেতা। জন্মসূত্রে উড়িয়া হলেও নদীয়ার নবদ্বীপেই তাঁর বেড়ে ওঠা ও শিক্ষা পাঠ। সত্যি মিথ্যে জানিনা, তবে শুনেছি কোনও এক মুসলমান সেপাইয়ের ঔরসে নাকি তাঁর জন্ম। এবং তাঁর মায়ের কাছে এই সত্যটি জানতে পারার পরেই তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটা আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই গপ্পের পিছনের যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে মায়াপুরের যে অঞ্চলে জগন্নাথ মিশ্রের (চৈতন্যদেবের পিতা) বাড়ি ছিল সেটা ছিল লক্ষ্মণ সেনের পুরনো রাজধানী এবং ফলত সেই সময়ে মুসলমান অধ্যুষিত, আর আজকের 'মায়াপুর' নামটি নাকি পরে পরিবর্তিত নাম, আসলে সেকালে জায়গাটার নাম নাকি ছিল 'মিঞাপুর'।

তো সে যাইহোক, এসব কূটকাচালির মধ্যে ঢুকে মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে আমাদের কাজ নেই। আসল কথা হল চৈতন্যদেবের মূল এজেন্ডা ছিল অমুসলিম জনতাকে একজোট করে একটি অখন্ড হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলমানের হাত থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধদেরকে বাঁচানো। এবং এই এজেন্ডাকে সাক্সেসফুল করবার জন্য তিনি বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানের ইতিহাস এবং বাঙালি জনগণের চরিত্রকে ভাল্লো করে স্টাডি করলেন এবং অচিরেই নিজের কর্তব্যটি বুঝে ফেললেন। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মন্ত্র আউড়ে, নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও জাতপাতের সংস্কার ধর্মকে কাঁচকলা দেখিয়ে এবং প্রেম ধর্মের মানবিক আবেদনে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে আলিঙ্গন করে তিনি নিমেষেই আপামর বাঙালীর চিত্ত জয় করে ফেললেন। নিচু তলার এবং কনভার্টেড হিন্দু ও বৌদ্ধদের তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করলেন, এবং অখণ্ড হিন্দু রাজ্য স্থাপনের গোপন বিপ্লবটি তলে তলে চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু অচিরেই ব্যাপারটা মুসলমানদের নজরে চলে আসায় তাঁকে নবদ্বীপের পাট চুকিয়ে নিজের দেশের বাড়ি উড়িষ্যাতে চলে যেতে হল। কিন্তু এই উড়িষ্যায় পালিয়ে যাওয়ার পেছনের কারণটি ছিল চূড়ান্ত পলিটিকাল। কারণ উড়িষ্যার পুরী তখন বাংলার কাছাকাছি একমাত্র শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য। এবং পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রকে নিজের বশে এনে তিনি গৌড়ের মুসলমান রাজত্বের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্রকে আরও জোরদার করতে লাগলেন। তৎকালীন গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের দুই প্রধান আমত্য দবীর খাস এবং শকুর মল্লিক কে তিনি নিজ ধর্মে দীক্ষিত করলেন যাঁরা পরবর্তীতে রূপ-সনাতন নামে খ্যাত হল। এইভাবে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু পুরীর রাজবৃত্তের কর্তৃত্ব বর্ণ হিন্দুদের হাত থেকে আলগা হয়ে যতই চৈতন্যদেবের দলের দিকে চলে যেতে লাগল ততই হিন্দু বামুনরা ক্রমে ক্ষেপে উঠতে লাগল। রাজা প্রতাপরুদ্র তখন পুরোপুরি চৈতন্যদেবের হাতের পুতুলে পর্যবসিত হয়েছেন। এরপর হঠাৎ কি থেকে যে কি হল সে ইতিহাস আজও ধোঁয়াশা পূর্ণ রহস্যের ঘন কালো মেঘে ঢাকা। চৈতন্যদেবের আকস্মিক অন্তর্ধান নিয়ে আমাদের ইতিহাস কোনও সদুত্তর আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। এমন একজন লেজেন্ডারি ফিগারের শেষটা কিভাবে হল তা কেউ জানেনা। এতগুলো চৈতন্যমঙ্গল আর চরিতামৃতর পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আপনি চৈতন্যদেবের মৃত্যুর একটা ঠিকঠাক বিশ্বাসযোগ্য এক্সপ্লেনেশান খুঁজে বের করতে পারবেন না। কেউ বলে তিনি সমুদ্রে চলে গেলেন, আবার কেউ বলে তিনি নাকি পুরীর জগন্নাথের দারু শরীরে মিলিয়ে গেলেন! এই সমস্ত গোলমেলে অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে কোনও কোনও পণ্ডিত আবার সন্দেহ করেন যে চৈতন্যদেব হয়ত খুন হয়েছিলেন। কিন্তু কে খুন করল, কেন করল, কিভাবে করল- সেসব নিয়ে সবাই মুখে কুলূপ এঁটে বসে রয়েছে। কোনও বইতে প্রায় কিছুই লেখা নেই।

কিন্তু বাকি যা কিছু লেখা আছে তা খুঁজে দেখলে আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে হিন্দু, তন্ত্র, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের মহৎ আদর্শের দিক গুলিকে গ্রথিত করেই চৈতন্যদেব তাঁর প্রেম-ধর্মের জয়মাল্যটি রচনা করেছিলেন। হিন্দুর থেকে কৃষ্ণ, তন্ত্র থেকে রাধা, বৌদ্ধের থেকে ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতা, এবং সূফী-দরবেশ ট্রাডিশান থেকে সংকীর্তন নাচ-গানের কায়দা রপ্ত করে তিনি তাঁর মহান লোকধর্মের প্রচারের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক চাল চেলেছিলেন তাকে মধ্যযুগীয় বাংলার নিরিখে 'বিপ্লব' নামে অভিহিত করা যায় বৈকি। চৈতন্যদেবের সেই অখণ্ড হিন্দু রাজ্য গঠনের স্বপ্ন হয়ত অধরাই থেকে গেছে কিন্তু তাঁর প্রেম-ধর্মের সেকুলার আলিঙ্গনে ব্রাহ্মণ্য ও মুসলমান শাসনের নিগড় থেকে মুক্তি লাভ করেছে শত শত অন্ত্যজ প্রাকৃত মানুষ, মার খেতে খেতে, সমাজে অপমানিত

হতে হতে যাঁদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছিল। আর সেদিক থেকে দেখতে গেলে চৈতন্যদেবের এই বিপ্লব সফল, এবং এটাই বোধহয় বাঙালীর করা শেষ সফল বিপ্লব।

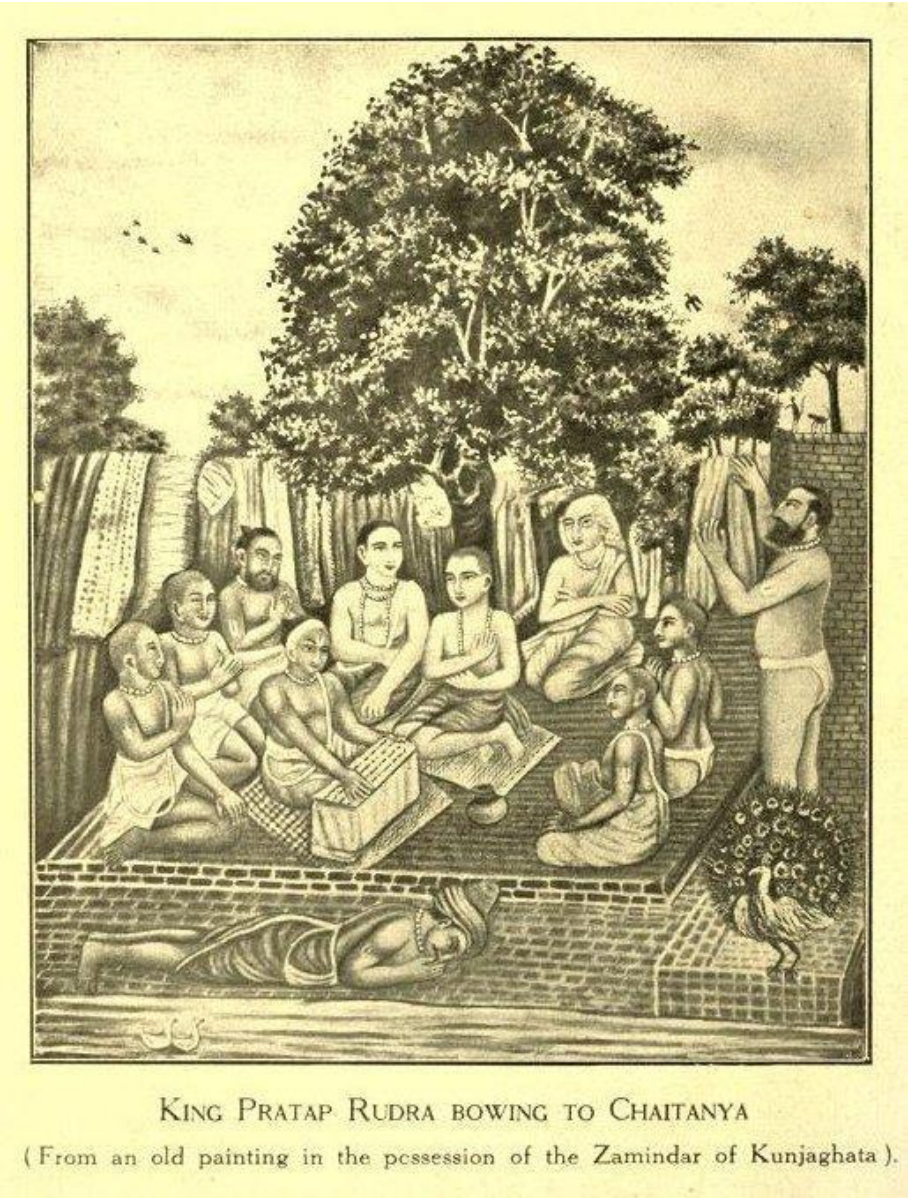

KING PRATAP RUDRA BOWING TO CHAITANYA
(From an old painting in the possession of the Zamindar of Kunjaghata).

কথা ছিল আদিম ও মধ্যযুগের বাঙালীর একটা অতি-সরলীকৃত ঐতিহাসিক রূপরেখা নির্মানের চেষ্টা করব। সেটা করতে গিয়ে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে ফেললাম। এই হল বাঙালীর রোগ, সে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে না হওয়া পর্যন্ত থামে না। তো যাইহোক, মোটামুটি এযাবৎ যা বোধগম্য হচ্ছে তা হল বাঙালির চরিত্র আদপেই একটি ঘোলা জলের মাছের মত, শান্ত শিষ্ট অ্যাকুরিয়ামে থাকবার মাল সে নয়। সে তার নিজের মত

করে দুনিয়াকে বিচার করবে এবং সেই মত বাকি সমস্ত কিছুকে বদলে নেবে, কারুর চোখ রাঙ্গানি সে পছন্দ করবেনা, কারুর পায়ের নীচে বেশীদিন সে থাকবে না। সেই আদিম যুগের বেদের ধর্মই বলুন বা গতকালের বামফ্রন্ট সরকার, যেখানেই বজ্জাতি দেখবে, প্রতিবাদ সে করবেই, পরিবর্তন সে আনবেই। আর পরিবর্তন এনেও যদি দেখে যে লাভ কিছুই হচ্ছে না তো সে আবার গর্জে উঠবে, আবার একজোট হয়ে নেমে পড়বে রাস্তায়, সংকীর্তনের সুরে সুর মিলিয়ে সে নেবে ইন্‌কিলাবের শপথ। বাঙালীর মাথার ওপর ছড়ি ঘুড়িয়ে আর চোখ রাঙিয়ে কেউই বেশীদিন টিকবে না- বাংলার আকাশ বাতাস মাঠ প্রান্তর সাক্ষী হয়ে যুগ যুগ ধরে এই নাটকেরই বিভিন্ন সর্গের অভিনয় দেখে আসছে। কত এলো কত গেল, বাঙ্গালি বাঙ্গালিই রয়ে গেল। আমরা বাঙালিরা আসলে সেই ফেলুদার গপ্পের সিধু জ্যাঠার মত, আমরা কেবল আমাদের মনের জানলাগুলোকে খুলে দিয়ে বসে আছি, যাতে আলো আর বাতাস ঢুকে মনটাকে তাজা রাখে। সেই যে রবি ঠাকুর লিখেছিলেন না,

"... ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

আমরা চিরকাল নানা ভাবে নানা ছন্দে আসলে এই কথাই তো বলে এসেছি। এই তো সহজিয়ার কথা, এই তো বৈষ্ণব হৃদয়াবেগের নশ্বর সঙ্গীত। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে তো আমাদের কোন কালেই নয়। আর তার সমস্ত ছাপ আমরা রেখে এসেছি যুগ যুগ ধরে আমাদের চিন্তায়, চেতনায়, শিল্পে, সাহিত্যে, গানে। গোঁড়া বৈদিকরা তো রেগে যাবেই, কট্টর মৌলবিরা তো চোখ রাঙাবেই, রাজনীতির ঘোড়েল ব্যাবসায়ীরা তো গাল পাড়বেই, অক্ষমের অস্ত্রই তো গাল পাড়া। কিন্তু তাতে আমাদের ভারী বয়েই গেছে। মানবিকতার ওপরে আর কোনও কিছুকেই আমরা সেভাবে তোয়াক্কা করিনি, করিনা। জীবনের পূর্ণ আনন্দে ভরপুর মাতোয়ারা আমরা। তাই পেটে ভীষণ খিদে তবু আমাদের মুখে বাউল গান। আর সে জন্যই আমাদের দেখলে বাকিরা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। আমার সাথী বঙ্গজ বোন ও ভাইয়েরা, আসুন ওঁদের উদ্দেশ্যে আমরা সমস্বরে তিনবার দুয়ো দিই।

একাত্তর ও শাহবাগের বাংলাদেশ

ঘনাদা

মার্চ ১১, ২০১৩

শুরুর শুরুটা ছিল অন্যরকম। ভারতে ব্রিটিশরাজের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার ঘোড়া দাপিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে টগবগ করে। আসমুদ্র হিমাচলে একটা আপাত স্বস্তি কায়েম। ভাবছে, একটা শৃঙ্খলার শাসন কায়েম হয়েছে দেশে।

কিছু মানুষ তখন আলাদা রকম ভাবছেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষ তখনও ঠিক ভাবে হয় নি। সিপাহী বিদ্রোহ বিফলে গিয়েছে, মূলত সেই কারণে। বিদ্রোহটা কুলাক বা বৃহৎ চাষীদের নেতৃত্বে হলেও, সেটা নিশ্চয়ই প্রথম একটা বড়সড় প্রতিবাদ ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে। এরও আগে হয়েছিল প্রতিবাদ। তবে, সেটা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ির জন্য সেই মত দানা বাঁধে নি।

প্রথমে অকথ্য অত্যাচার নামিয়ে আনল তদানীন্তন বৃটিশ প্রভুরা। সমর্থন ছিল কিছু ভারতীয় বেনিয়াদের। চলছিল দিন এই ভাবেই। ধর্মের ব্যাপারটা ততদিনে বুঝে গিয়েছে বৃটিশরা। ডিউক অফ সলসবেরী প্রথম স্লোগান তোলেন – ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল দেম। ব্যাপারটা কাজেও দেয়।

বড় রকম হইচই ফেলেন, সুভাষ-গাঁধী-নেহেরু-জিন্না এবং আরও অনেকে। এইসব ইতিহাস বহুপঠিত তাই আর নতুন করে কিছু বলার নেই।

ডিভাইড আণ্ড রুল দেম – এই স্লোগান, দ্বিজাতি তত্ব এবং বেনিয়াদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ভাগ হল ভারত।

১৯৪৭ এর আগে যাঁরা ভারতে ছিলেন, তাঁরা '৪৭ সালেই এলেন আবার ভারতবর্ষে। সম্পূর্ণ এক নতুন প্রহসনের জন্ম হল। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে, শেয়ালদা ষ্টেশনে পড়ে একদা জমিদার গিন্নি বা কর্তা ভিক্ষে করছেন দুমুঠো খাবারের জন্য, এটাই তখন বাস্তব সত্য। সাধারণ লোকেদের কথা বাদই দিলাম। তারা তো "জনগণ"। এই জনগণের হিতার্থেই তো দেশভাগ! পরিহাস আর কাকে বলে??

এদিকে দুইপারে চলছে অবাধ হত্যালীলা। শাসক শ্রেণী ক্ষমতার নেশায় মশগুল। প্রতিটা মানুষের পরিবার আছে, সকলেই খেয়ে পরে বাঁচতে চায়। খেয়ে পরে বাঁচাটাই যখন সবচেয়ে বড় সমস্যা তখন কেন মানুষ সব ছেড়ে দিয়ে ধর্ম এবং ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে ভাবতে যাবে? এটা কেউ বুঝল না!

নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান দুই হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত হল – পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যোজন যোজন ব্যবধানে অবস্থিত এ দুটি অংশের মধ্যে মিল ছিল কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মে। সৃষ্টি হল এমন এক রাষ্ট্রের যার সঙ্গে তুলনা করা

চলে এক অবয়বহীন পাখীর যার শুধু ডানা দুটো আছে। সে ডানা দুটোরও আবার চরিত্রগত মিল নেই। ভাষা, সংস্কার, আচার আচরণ সব ভিন্ন শুধু ধর্ম এক।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এর পূর্ব অংশ পশ্চিম অংশের তুলনায় নানাভাবে বঞ্চিত হতেই থাকে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস। প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় যখন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা করলেন- "উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

এর প্রতিবাদে প্রথম লেখনী ধারণ করেন ভাষাচার্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে বলেন,

"পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন পশতু, বেলুচি, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং বাংলা; কিন্তু উর্দূ পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেই মাতৃভাষা রূপে চালু নয়। ... যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়,তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবে উর্দূ ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য। ... বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দূ বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দূ ভাষার স্বপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।"

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন :-

"আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়; এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ রেখে দিয়েছেন যে মালল-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি দাড়িতে ঢাকবার কোন জো-টি নেই।"

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা দিবসে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের ছাত্রদের আহ্বানে তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

এই প্রতিবাদ অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে জন্ম দিয়েছিল রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের। ১৯৫২র ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ হলেন বরকত সহ আরও অনেকে ।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত নাটকীয়তার মুখোমুখি হয় যখন ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দলটি পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয়লাভ করে এবং ৩১৩ আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, যা আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের অধিকার প্রদান করে। কিন্তু নির্বাচনে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্যে থাকবে দু'জন প্রধানমন্ত্রী। "এক ইউনিট কাঠামো" নিয়ে ক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে এরকম অভিনব প্রস্তাব নতুন করে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ভুট্টো এমনকি মুজিবের ৬-দফা দাবি মেনে নিতেও অস্বীকার করেন। মার্চের ৩ তারিখ পূর্ব ও পশ্চিম অংশের এই দুই নেতা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে দেশের ভাগ্য নির্ধারণে ঢাকায় বৈঠকে মিলিত হন। তবে বৈঠক ফলপ্রসূ হয় না। মুজিব সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই বাস্তবায়নের জন্য চার দফা দাবি পেশ করেন:

- অবিলম্বে মার্শাল 'ল' প্রত্যাহার করতে হবে।
- সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।
- নিহত ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা অনুসন্ধান করতে হবে।
- ২৫শে মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, *"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"*। তাঁর এই ভাষণ গোটা জাতিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উত্তাল করে তোলে।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করে, কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার কোন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। যদিও ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ নির্ধারিত হয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বোনা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ কোন কারণ ছাড়াই ৩ তারিখের নির্ধারিত অধিবেশন বাতিল করা হয়। ক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ধৈর্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল এই সিদ্ধান্ত। সারা দেশে বিক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। বঙ্গবন্ধু সারা দেশে ৫ দিনের হরতাল

এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর আহবানে সারা পূর্ব পাকিস্তান কার্যত অচল হয়ে যায়। সামরিক সরকার কারফিউ জারি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে কিন্তু বুলেটের ভয় দেখিয়ে বাঙ্গালিদের রাজপথ থেকে সরানো যায় না। ৫ দিন হরতাল শেষে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন।

অনেক ক্ষোভ এবং বঞ্চনার ইতিহাস বলার পর তিনি বললেন :-

"এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়- তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু- আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবেনা। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবানা। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের ডুবাতে পারবে না।.....মনে রাখবা, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।"

২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে জনযুদ্ধের আদলে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী সামরিক জুন্টা ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ হত্যা করে নির্বিচারে। যে ধর্মের নামে একটা দেশ তৈরি হয়েছিল, সেই ধর্মের লোকেদের "কাফের" বলে নির্মম এবং পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করে বাঙালিদের।

গ্রেফতার করা হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল আওয়ামী লীগ প্রধান বাঙ্গালীর প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের ঠিক আগেই ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারা বাংলাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধযুদ্ধ।

এদের সাহায্য করে, জামাআত। 'জামাআত ই ইসলামী' একটি আন্তর্জাতিক গোঁড়াপন্থি সুন্নি মুসলিম ধর্মীয় সংগঠন যার জন্ম ১৯৪১ সালে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে লাহোরে (বর্তমানে পাকিস্তানে) এবং জন্মদাতা সৈয়দ আবুল আলা মউদুদী।

এই সংগঠনটির সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য—

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের ভূমিকা শূন্য, কিন্তু ভারত ভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টিতে এদের বিশাল ভূমিকা। এই সংগঠনটি তৈরি করা হয় রাজনৈতিক ইসলামের প্রচার করতে। রাজনৈতিক ইসলামের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের

ইসলামী-করণ। অর্থাৎ এরা যে রাষ্ট্রেই থাকুক না কেন এদের উদ্দেশ্য একটাই - রাষ্ট্রটিকে মধ্যযুগীয় আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। ইসলামের সমালোচনা এরা সহ্য করে না, কেউ ইসলামের বিরোধিতা করলে কিম্বা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী জীবনযাপন না করলে এরা তাদের শত্রু গণ্য করে।

এরা ধর্মের নামে "রাজাকার" হয়ে সাহায্য করতে শুরু করে মিলিটারি জুন্টাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই নৃশংস রাজাকারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় গোটা বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ইশতেহার ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা। সে নির্বাচনে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয়ী হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগের একজন সাংসদ ২০০৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তাব পেশ করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ৩৯ বছর পর যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য ২০১০ সালের ২৫শে মার্চ ট্রাইবুনাল, আইনজীবী প্যানেল এবং তদন্ত সংস্থা গঠন করা হয়।

৩০ লক্ষ মানুষের রক্ত এবং প্রচুর নারীর ধর্ষণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। আগেই বলেছি - বাংলাদেশেরই কিছু মানুষ জামাআত নাম নিয়ে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করে, গণহত্যা, ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদি চালিয়ে যায়। যুদ্ধকালীন এই সব সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে একটি আইন তৈরি করা হয়। ২০০৯ সালে কিছুটা সংশোধন করা হয়। এ আইনের আওতায় ২০১০ সালের ২৫শে মার্চ এ সকল অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ২০১৩ সালের ২১শে জানুয়ারি ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ে আবুল কালাম আযাদ (বাচ্চু রাজাকার)-কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

সারা দেশ উল্লাসে ফেটে পড়লেও বাচ্চু রাজাকার বাংলাদেশের জেল থেকে পালিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে ততদিনে ।

এরপর ৫ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় রায়ে কাদের মোল্লাকে ৩টি অপরাধের জন্য ১৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ২টির জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু এতো বড় সব অপরাধের শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে যারা মেনে নিতে পারেননি, তাদের মধ্যে ১৭ জন ব্লগার, আহমেদ রাজীব হায়দারের (থাবা বাবা) উদ্যোগে শাহবাগে অহিংস বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করার কথা বলেন। সেই সমাবেশ জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভে রূপ নেয়। প্রথম শহীদ হন রাজীব।

দেশের অন্য যেসব স্থানে উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, চট্টগ্রামের প্রেসক্লাব চত্বর, রাজশাহীর আলুপট্টি মোড়, খুলনার শিববাড়ি মোড়, বরিশালের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বগুড়ার সাতমাথা, যশোরের চিত্রা মোড়, কুমিল্লার কান্দিরপাড়া, কুষ্টিয়ার থানা মোড় ইত্যাদি। শাহবাগের

প্রজন্ম চত্ত্বরের শপথ - কাদের মোল্লা সহ প্রত্যেক রাজাকারদের মৃত্যুদণ্ডের রায় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চত্বর ছেড়ে যাবই না।

তাই বিক্ষোভ এখনও চলছে। আরও হত্যা চালাচ্ছে এই রাজাকারের চেলারা। সংখালঘুদের নিপীড়ন, তাদের উপাসনা স্থল ভাঙা - যতই বাড়ছে রাজাকারদের, ততই শক্ত হচ্ছে নবীন প্রজন্মদের চোয়াল।

৪৪ বছরের স্বাধীনতার সময়ে তাদের অঙ্গীকার - ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।

জয় বাংলা।

সুখ কারে কয়?

তনুশ্রী

নভেম্বর ৭, ২০১৩

এ বাড়িতে কেউ চোখে চোখ রাখে না আজকাল, পাছে আবজে ওঠা হাসি আড়াল না করতে পারে চোখের কোণায় জমা হওয়া টুকরো হিরের কুচিগুলো। এ বাড়িতে শুধু দেখা যায় হাসির রকমফের। ভাইবোনেদের হুল্লোড়ে হাসি, আত্মীয়-স্বজনের শুভেচ্ছার হাসি, মা বাপের ঠোঁটে গর্বে-আনন্দে মাখানো চাপা হাসি। এ বাড়ির একমাত্র মেয়েটির বিয়ে আগামী শীতে। ঘরের মেয়ে পরের কাছে চলে যাওয়ার আগে এই শেষ শরত, শেষবার পুজোর গন্ধ মেখে নেওয়া।

‘ওরে ও নাতনি লো, বলি বিয়ের দিন তো এগিয়ে এলো রে। বুকের ভেতরটা কতটা ধুকপুক করছে বল দেখি।’

‘ওফ দিদা কি যে বলো না! এ কি আর তোমাদের প্রথমভাগ কোলে করে বিয়ের পিড়িতে বসার যুগ? সাত বছর ধরে ওর সাথে সম্পর্ক, ধুকপুকুনি আবার কিসের?’

এক চিমটি ছাঁচি পান গালে ঠেসে, পিঠের বালিশটা একটু ঠিক করে নিয়ে দিদা বললেন ‘হুহ তাও যদি না দুদিন বাদে বাদে দেখতুম চোখ রাঙ্গা করে, নাকের জল টানতে টানতে জানলার ধরে বসে উদাস হয়ে বসে আছ। বলি বিয়ে করতে যাচ্ছ দুদিন বাদে, এখনো কথায় কথায় এতো ঠোঁট ফোলালে চলবে?’

দোপাট্টা উড়িয়ে ভুরু বাঁকিয়ে ঋতি জিগ্গেস করলো ‘আচ্ছা তাহলে কি চলবে শুনি? কি কি চলবে বিয়েতে একটু বুঝিয়ে দাও দেখি। মেয়েদেরই সব মানিয়ে নিতে হয় বললে কিন্তু আমি চললাম এই।’

‘ও নাতনি রে, বিয়ে কি তোর একার জিনিস? দুজনের যদি মিলই না হলো তো সুখের বাসাখানি গড়বি কিসে? সুখ কিরকম জানিস.....এই যেমন ধর যজ্ঞির ছ্যাঁচড়া। না না হেসে ফেললে হবে নাকো দিদিমনি। বলি ছ্যাঁচড়া বানাতে দেখেছ কখনো? তবে শোনো। প্রথমে নাও একটা আস্ত মাছের মাথা। ভেঙ্গে দুভাগ করো। এক ভাগ হলে তুমি আর এক ভাগ হলো আমার আদরের নাতজামাই। এবারে গরম তেলে কড়া করে ভাজ দেখি। সংসারে কত ঝড় ঝাপটা আসবে, কত উথাল পাথাল। যত খারাপ সময় একে অপরের সঙ্গে একসাথে, পাশাপাশি কাটাবে ততই দেখবে সম্পর্ক আরো মুচমুচে হচ্ছে, আরো স্বাদু। যেই মাছের মাথাদুটি কড়কড়ে ভাজা হলো খুন্তি দিয়ে দাও তো দুটিকে ভেঙ্গে, মিলে মিশে একাকার হয়ে যাক দুজনের মন দুটি। এবারে মাছের মাথার টুকরোগুলি ভালো করে ভেজে তুলে রাখো আর জড়ো করে আনো রান্নাঘরের ফেলাছড়ানো কুটি কুটি সবজি। সংসারের ছোটো ছোট দুঃখ হাসি এরা. কুটি কুটি করে কাটো একটু আলু, বেগুন, কুমড়ো, ঝিঙে, কচু, শাক.....যা পাও হাতের কাছে। এবারে ওই মাছ ভাজার তেলেই আর খানিক তেল দাও দেখি হাত খুলে। তেল গরম হলে ওতে দাও পাঁচ ফোড়ন, শুকনো

লংকা আর তেজপাতা দুটি। এবারে ওতে ঢেলে দাও কাটা সবজিগুলো। এবারে শুধু খুন্তি ধরে উলটপালট করো আর মাঝে মাঝে থেমে একটু কষতে দাও। বলি বুঝলে কিছু নাতনি সুন্দরী? রোগা হওয়ার দোহাই দিয়ে তেল ঢালতে কসুর করেছ কি গেছ। ওই তেলটুকু হলো ভালোবাসা, সংসারের যত হাসিকান্না ডুবিয়ে রাখো ওই ভালোবাসাটুকুতে। যত ইচ্ছে ওলটপালট খাও না কেন জীবনের খুন্তি নাড়ায় দেখবে রস মরবে না, শুধু জমে আসবে। আর তারই মাঝে একটু চমকের জায়গা রেখো নাতনি ওই ফোড়ন দেওয়ার মতো। ওতে পিরিত আরো জমে। এবারে দাও দেখি চাট্টি মশলা.. হলুদ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, শুকনো লংকা গুঁড়ো। আর দেবে কি? নুন আর চিনি অল্প অল্প করে স্বাদ বুঝে। আর দিও একটু জিভ সুলোনো কাসুন্দি বা সর্ষে বাটা। এবারে ওই তুলে রাখা মাছের কাঁটা চোকড়াগুলো মিশিয়ে দাও দেখি। আমার বাবা বলতেন 'ছ্যাঁচড়া মজে তেলে কষে আর ভালোবাসা জমে ধৈর্যর বশে'। যতই দুঃখ আসুক, অভিমান হোক এমনকি রাগারাগিও, ওই ভালোবাসার আঁচলটি দুজনে ধরে থেকো শক্ত করে.....ওই দেখো আবার কাঁদে...

কেন! আয় তো ধন বুকে আয়। আর কটাই বা দিন পাবো তোকে?'

বদ-ওব্বেস

শঙ্খ

এপ্রিল ৩০, ২০১৩

সেজমামা বল্লেন, "বুঝলি বুবান, বেলেল্লাপনারও একটা লিমিট আছে। এই ধর যেমন তুই যেখানে সেখানে যা খুশি বলতে পারিস না, কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে হ্যাংলার মতো গিলতে পারিস না, পটি করে হাতটা না ধুয়ে বেরিয়ে আসতে পারিস না। ঠিক সেই রকম-ই এক ঘর সাংবাদিক এর সামনে কিছুতেই বিড়ি খাওয়া প্রোমোট করা যায় না।"

আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিক ঠিক"।

শুভেন্দুদা বলল, "ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো আর টেঁকা যাচ্ছে না মাইরি, রেগুলার শালা নতুন খেউর, ভাবছি পাতা ফেলে বম্বে টম্বে চলে যাব। অ্যাট লিস্ট কিছু ওয়ার্ক কালচার পাওয়া যাবে"।

আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিক ঠিক"।

বাড়িতে শুনি তুমুল চিৎকার। দিদির ম্যাও সামলাতে না পেরে মা-ও ক্রমশ মাওবাদী হয়ে উঠছেন (দিদি বলতে আমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কেই রেফার করছি, বলাই বাহুল্য)। চুয়াল্লিশ ডেসিবল এ মার তরফে দিদির উদ্দেশ্যে কিছু অভিযোগ ছুটে এল। দুমদ্দাম আওয়াজ তুলে দিদি আমার আর দিদির কমন সাম্রাজ্যে ঢুকে মা কে যে রিপ্লাই দিল, তার ফ্রিকোয়েন্সি আমার কান আর মাপতে না পেরে শুধু একটা দীর্ঘস্থায়ী কুউউউউউউউ অনুরণন রেখে ইস্তফা দিল। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় দিদি আমার দিকে ঘুরে সাপোর্ট চাইলো, "কিরে, ঠিক বলিনি?"

আমি দ্বিরুক্তি না করে মাথা নাড়লাম, "ঠিক ঠিক"।

দিদির ওয়ার্ড্রোব হাতড়ে গোটা আষ্টেক খুচরো টাকা আবিস্কার করা গেল। নির্বিকারে পকেটে পুরে গুটি গুটি বাইরের দরজার দিকে এগুচ্চি, একটা চিরতা ভেজানো কাফসিরাপ-ক্যান্সেল গলা শুনে তাকিয়ে দেখি বাড়িউলি মিনুজেঠি সাউন্ড পল্যুশনের রুট ক্যউজ খুঁজতে সাত সকালে কুড়িটা সিঁড়ি ভেঙে ধরাধামে অবতীর্ণা।

চায়ের দোকানে এক কোণে নিবিষ্ট চিত্তে বসে খুঁটে খুঁটে লেড়ে বিস্কুট খাচ্ছি, "অনেক তো হোলো, এবার কি করবে কিছু ঠিক করলে?", তাকিয়ে দেখি বিকাশ কাকু। "জয়েন্ট দিয়েছিলে না? রেসাল্ট কবে? এক কাজ করতে পারো বুঝলে, কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে কোনো কলেজে ঢুকে পড়ো। যা দিনকাল পড়েছে, ইঞ্জিনিয়ার টিয়ারদের আর তেমন দাম নেই, চাকরি বাক্রির খুবই আকাল তো"।

আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিক ঠিক"।

ভয়ে ভয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে একলাফে রাস্তায়। উদাস উদাস মুখ করে হাঁটতে থাকলাম পার্কের দিকটায়। এই বেলা বেশ নিরিবিলি পাওয়া যাবে, মেঘলা আকাশ, ফুরফুরে হাওয়া, গাছের পাতা টাতা ঝরবে। যে কোনো সময়ই বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পকেটে এম্পিথ্রি প্লেয়ার আর হেডফোন জাতীয় নেসিসিটি গুলো পুরতে ভুল করিনা। এখনো সেগুলো সঙ্গেই আছে। কাজেই কানে বাজবে ঝম্পর ঝাঁই, আর আমি সত্য সাঁই মার্কা মুখ করে, লেকচারের মুখ ছাই দিয়ে, ইয়ে, কি বলে যেন, মেঘদূতম টুতমের সারি সারি সব পার্ট টু লিখে ফেলব মনে মনে। এমন সুন্দর একটা সকাল কি আর প্রতিদিন আসে? আজ আমিই লিখব, আমিই পড়ব, আমিই হাততালি দেব।

হঠাৎ খেয়াল করি নিজের অজান্তেই মাথাটা কখন নেড়ে ফেলেছি, "ঠিক ঠিক"।

বদ-ওব্বেস আর যাবে কোথায়??

উপোসী ঈশ্বর

কিন্ডল হাতে কলির মানুষ

জুলাই ৬, ২০১৩

বাস হইতে নামিয়া রাস্তা ক্রস করিয়া শিবমন্দিরটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল পটল। গত কাল রাতে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই।

গোপালের নকুলদানা ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়া কাল রাতে মা পটলকে অনেক বকাবকি করিয়াছেন। শুধু ভক্তরাই কি চিরকাল উপোস করে যাবে? ইশ্বরেরও তো মাঝে মাঝে উপোস করা উচিত। পটলের যুক্তি মা শোনেন নাই।

হেই বস...নকুলদানার টাকা দিয়ে ডুরেক্স কিনেছি বলে তুমি কি সিরিয়াসলি রাগ কল্লে? দুপুরের রোদে তেতে ওঠা মহাদেবের ছবিটার দিকে তাকাইয়া মনে মনে বলিয়া ওঠে পটল। গ্রু...তুমি তো সবই জানো। সবই তো য়্যাটমের মাস্তি – তাই না? যা স্যাকারাইড তাই পলিমার।

ওদিকে উপরে ঈশ্বরের রাত সবে শুরু হইয়াছে। ইংলিশ ছাড়া তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক সম্পূর্ণ হয় না এবং তিনি ইংলিশ খাইয়া বাংলা বকেন। রক্তাভ চোখ তিনটিকে কোন রকমে খুলিয়া ইশ্বর বিশুকে খুঁজিতে লাগিলেন।

বিশ্বকর্মা কাজের ছেলে। ইশ্বরের নিজস্ব গবেষণাগার শেরপা-য় (স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান অ্যান' এক্সোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি) কাজ করিবার পূর্বে Craig Venter এর সহকর্মী ছিলেন।

বিশ্বকর্মা অমৃতবৃক্ষের একখানি ডাল ধরিয়া ঝুলিতেছিলেন। স্বর্গীয় টেলিপ্যাথিক ক্ষুদ্রচৌম্বকীয় তরঙ্গ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেই সুড়সুড় করিয়া নামিয়া আসিলেন।

দুর বোকা! ঝুলে থাকলেই লম্বা হয়? ঈশ্বর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন।

না – আপনারা যাহা ভাবিতেছেন তাহা নহে। ঈশ্বর আমার-আপনার মতো বোকা নহেন, তাঁহার ল্যাস্ট নেইম হইল আম্বানি অর্থাৎ জাতে গুজরাতি, তিনি কিন্তু আসলেই হিসাবী – যদি কোল বলিয়া কোলকাতা বুঝাইয়া দেওয়া যায় তবে কেন অকারণে শক্তি ক্ষয়?

এর পরেও যদি আমার কথা ক'খানি বিশ্বাস না হয়, গুনিয়া দেখুন, বোকার পরে দুয়ের পরিবর্তে তিন খানি বিন্দু – তাহা (মনুষ্যের হিসাবে) তিন সেকেন্ডব্যাপী ঐশ্বরিক ভেঙচির নির্দেশক মাত্র।

কেম ছে বিশুভাই? মেঙ্কা বলে যে বুলগেরিয়ান মেয়েটা এসেচে ওর সঙ্গে আজকাল ডেটে যাচ্চিস শুনলুম।

আমাদের ঈশ্বর কিন্তু ফ্লুয়েন্টলি বাংলাও বলিতে পারেন, ধান্দার কারণে শিখিয়া লইতে হইয়াছে, চৈনিক চেয়ারম্যানের বাঙালী ধামাধরাদের মনের খবরাখবর জানিবার জন্যে।

বিশ্বকর্মা মিটিমিটি চাহিয়া রহিলেন ঈশ্বরের দিকে।

ডেটে যাওয়ার আগে Kegel-শিষ্য ধন্বন্তরীর কাছে যেতে ভুলিস না বিশুভাই। লম্বা হো হো হো! ঈশ্বর উরু চাপড়াইয়া মহানন্দে গান ধরিলেন।

ওদিকে নিচে পটল তখন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া মনে মনে বলিতেছে – ঠাকুর গো তোমার ভক্তই সেদিন খুব জোর উপোসী ছিল। খাওয়ার সময় যদি বিষম লাগত, তাই রেকিট-বেনকিসারের ন্যাপকিন কিনে নিয়ে গেছিলাম আর কি, ঠিক করি নি?

দেশ হইতে টরেটক্কা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশুর ন্যায় জেনেটিক এঞ্জিনিয়ার থাকিতে ঈশ্বরের ভাবনা কি? হস্তসঙ্কেত পাইবা মাত্র বিশ্বকর্মা তাহার নবতম আবিষ্কার Hemidactylus frenatus এর মাথায় একটি চাঁটি মারিলেন। বিশেষ যাণ্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহার চিৎকারটি নিচে প্রেরিত হইল। কিভাবে হইল জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না – Haroche আর Wineland সাহেব থাকিতে আমার মতো মূর্খকে লইয়া টানাটানি কেন? সালমান খানের Judwaa বইখানি দেখিয়াছেন তো? ঐ সাহেবরা দেখেন নাই, বিস্তর অঙ্কটঙ্ক কষিয়া অ্যাদ্দিন বাদে কোয়ার্কীয় যমজের গপ্পো জুড়িয়া দিয়াছিলেন গত বৎসর, আর তাহা শুনিয়া নোবেল কমিটিও "জলিয়া গল" হইয়া পুরষ্কারখানি দিয়া দিয়াছেন। কেসটা বুঝিলেন শেষমেষ? মানে, মারিবেন এখানে, কিন্তু লাশ পড়িবে দু' জায়গাতেই।

শিবের ফটোর পেছন থেকে একটা টিকটিকি পটলের উদ্দেশ্য বলিল – ঠিক ঠিক ঠিক। ব্যালকনি হইতে ঈশ্বর সবই দেখিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার নেশা ক্রমশ কাটিয়া যাইতেছিল। হাত তুলিয়া পটলকে আশীর্বাদ করিয়া পাক্কা কুইন্স ইংলিশে বলিয়া উঠিলেন – য়্যু গ্যান...!

কে যেন কানের কাছে ইউ ক্যান্ডু বলে উঠল না? ভর দুপুরেও পটলের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল এবং অচ্ছোদ-পটলটি বিস্ফারিত হইয়া খরমুজাকার ধারণ করিবার উপক্রম হইল। কোন রকমে ঢিপ করিয়া এক বার মাথা ঠুকিয়া দ্রুত পায়ে উল্টো দিকে হাঁটা দিল সে – একটু খুশি খুশি মনেই। স্বয়ং বিগ বস তাহাকে অনুমতি দিয়া দিয়াছেন। ড্রিমাম ওয়েকাপাম ক্রিটিকাল কন্ডিশানাম! মেলাবেন, তিনি মেলাবেন, চাবি আর তালাটাকে তিনি মেলাবেন!!

ব্রিগেড-ভর্তি ক্ষুধার্ত মানুষ যখন বছরের পর বছর দালালদের মুখনিঃসৃত মার্ক্সবাদকে মাছভাত ভাবিয়া আসিয়াছে, তখন গ-এর গিয়ারবিশিষ্ট দৈববাণীকে যদি উপোসী পটল you can do শুনিয়াই থাকে, তাহাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না বোধ হয়।

হুতোম

অতনু

জুলাই ২৪, ২০১৩

তার নাম হুতোম। আমার খুব বন্ধু, যাকে বলে বেস্ট ফ্রেন্ড।

- "সে কি তোমার ইস্কুলে পড়ে?"

- "না"

- "তোমার বাড়ির পাশে থাকে বুঝি? বিকেলবেলায় তার সঙ্গে খেলো?"

- "উঁহু"

- "তাহলে নিশ্চই তোমার আত্মীয় হয়?"

- "একেবারেই না"।

আরে বন্ধু হলেই কেমন করে হয়েছে বলতে হবে না কি! সে যে আমার বন্ধু, এটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। কোথায় থাকে? এই ধরে নাও পটলতলা। কি বলছ? পটলতলা কোনও জায়গার নাম হতে পারে না? কেন? তালতলা হতে পারে, আমতলা হতে পারে আর পটলতলা হতে পারে না? আর না পারে তো বয়েই গেল, ধরে নিতে দোষ কি? হুতোম সবসময় আমাকে সাহায্য করে। পড়ার সময়, খেলার সময়, ইস্কুল যাবার সময়, টিভি দেখার সময়। আমি ডাকলেই সে চলে আসে। তবে সাবধান, তোমাদের বিশ্বাস করে বলছি কিন্তু, কাউকে বলে দিওনা যেন, বিশেষ করে আমার বাবা মা কে। ওরা জানেই না হুতোমের কথা। জানেনা বললে অবশ্যি একটু ভুল হবে, জানতে চায় না, মানে বিশ্বাসই করে না।

এই তো সেদিন হুতোমের সঙ্গে পাঙ্খাটুলি গিয়েছিলাম, বাবার বন্ধু দেবেশকাকু দেখে ফেলেছে আর বাবাকে এসে রিপোর্ট করেছে। বাবা চোখ পাকিয়ে বলল, "অতদূরে গিয়েছিলে কেন একা একা?"

- "একা কোথায়! হুতোম ছিল তো সঙ্গে।"

- "হুতোম আবার কে? কতবার বলেছি, ঐ সব বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না?"

বোঝো কথা!! হুতোম না কি খারাপ ছেলে!! তাহলে ভালো ছেলে কারা? যারা সারাদিন বইমুখে বসে থাকে, সকাল বিকেল সেজেগুজে পড়তে যায়, বাসে বুড়োলোকেদের সিট ছেড়ে দেয়না, রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তারা? এসব কথা অবশ্যি বাবাকে বলিনি। বলে কোন লাভ নেই। বয়স হলে বুদ্ধিটা যে কেন কমে যায় কে জানে!

একদিন বাবা-মার সঙ্গে বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম ট্রেনে চেপে। ফেরার সময় কি ভীষণ ঝড়বৃষ্টি। ট্রেন থেকে নেমে তো মাথায় হাত। বাস, অটো, রিকশো, কিচ্ছু নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাবা বলল, "বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই, আর কিছু পাওয়া যাবে না। এবার হাঁটা লাগাতে হবে।" ঠিক সেই সময় একটা অটো এসে দাঁড়াল। তখন আর দরদাম করার সময় নেই, হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। সে অটো কোথায় যাব কিছু না শুনেই রাস্তায়

নেমে পাঁইপাই করে ছুটতে লাগল। মা তো ভয়ে সিটিঁয়ে গেছে। বাবা যত বলে আস্তে চালাতে সে তত জোরে চালাতে থাকে। আধঘন্টার রাস্তা দশ মিনিটে পার করে পয়সা দেওয়ার আগেই আমাদের নামিয়ে দিয়ে হুউউস করে বেরিয়ে গেল। বাবা-মা তো অবাক। আমি অবশ্য অবাক হইনি, কারণ আগেই বুঝতে পেরেছিলাম কে অটো চালাচ্ছে, কিন্তু সে চোখ দিয়ে ইশারা করাতে কিছু বলিনি। তবে হুতোম যে অটো চালাতে পারে তা আগে জানতাম না।

পরে হুতোমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি অটো কিনলে না কি?"

- "দ্যুৎ, তোমার যেমন বুদ্ধি! ওটা তো সামিরের অটো। সে ব্যাটা তো আর বেরোবে না, তাই আমিই নিয়ে এলাম। ও কিছু জানতেই পারেনি, কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছিল তো।"

- "অ্যাঁ! তাহলে নিলে কিকরে? চুরি করেছ না কি?"

- "চুরি করতে যাব কেন? আমি তো আবার রেখে এসেছি। তাছাড়া সামির আমার খুব ভালো বন্ধু, তোমার মতই।"

এই হল হুতোম। হুতোম পারেনা এমন কাজ বোধহয় নেই। কিন্তু সে যে কোন ক্লাসে পড়ে সেটা কিছুতেই বলবে না। তবে আমি যখনই ইস্কুলে যাই, তখন দেখি হুতোম জানলা দিয়ে বা গাছের ডাল থেকে উঁকি মারছে, কখনও বা আমার পাশে এসেও বসে পড়ে। কেবল আমিই ওকে দেখতে পাই, আর কেউ পায়না। তবে কোনোদিন আমার হোমটাস্ক করে দেয়নি। যদিও আমি জানি ও অঙ্ক খুব ভালো পারে। কিন্তু সেকথা বললেই দুদিকে ঘাড় নেড়ে বলবে, "ওটি হচ্ছেনা, তোমার অঙ্ক তোমাকেই করতে হবে।"

আমাদের ইংরেজি স্যার সাংঘাতিক লোক। ছাত্রদের পেটাতেই তাঁর আনন্দ। তিনি ইচ্ছে করেই ভয়ংকর সব ট্রান্সলেশন দেন, বিচ্ছিরি সব শব্দের মানে জিজ্ঞেস করেন আর উত্তর অনুযায়ী বিভিন্ন রকম শাস্তি দেন। যারা মার খেল তাদের তবু ভাগ্য ভালো। কাউকে হয়ত বললেন চেয়ার, ব্যাস ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত শূন্যে চেয়ার হয়ে বসে থাকতে হবে। কাউকে যদি বলেন এক পা, অমনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। একদিন তিনি ভবানীকে ধরেছেন, "বলত ফুলিজিনাস মানে কি?" ভবানী অনেকটা ভেবেচিন্তে, খানিকটা কানটান চুলকে বলল, "ফুলিজিনাস মানে ফুলিশ মানে বোকা কিন্তু জিনিয়াস।"

- "বেশ বলেছিস, ঠিক তোর মতই। আয় জিনিয়াসগিরি কাকে বলে দেখিয়ে দিই", স্যার ভবানীর কানের দিকে হাত বাড়াতেই হুতোম স্যারের কানটাকেই পাকড়ে ধরল। স্যারের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। এদিকে হুতোমকে আমি ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সবাই তাজ্জব। হুতোম স্যারের কানে কি একটা বলে ছেড়ে দিল। ভবানী সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে স্যার?" স্যার কিছু না বলে পেনটাকে পকেটে পুরে রোলকলের খাতাটা টেবিলেই ফেলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। হুতোমকে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যারকে কানে কানে কি বললে তখন?",

"কিছু না, বললাম আপনি আসার সময় যে দুধটা না খেয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছেন, তা কিন্তু আপনার স্ত্রী দেখে ফেলেছেন!"

এই যে এতক্ষণ হুতোমকে নিয়ে আবোল তাবোল বকলাম, তোমরা নিশ্চই ভাবছ, হুতোমটা আসলে কে? মানুষ? ভূত? রোবট? নাকি অন্য গ্রহের জীব? তোমরা ভাবতে থাকো, আমি যাই, হুতোম ডাকছে।

[এটা কবে লিখেছিলাম মনে নেই, পুরনো খাতাপত্তর ঘাঁটাঘাটি করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল। লেখাটা পাতে দেওয়ার মত হয়নি জানি, কিন্তু ছোটবেলার লেখার প্রতি সবারই তো একটা দুর্বলতা থাকে, তাই চর্যাপদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আর এটা যে খুব মৌলিক তাও আমি দাবী করছিনা। তবে কি না একজায়গা থেকে টুকলে সেটা হয় চুরি করা, আর অনেক জায়গা থেকে টুকলে গবেষণা। তাই কাঠগড়ায় তুললে আমি বলতেই পারি, ধর্মাবতার, আমি চোর নই, গবেষক হতে পারি বড্ডজোর।]

‘মানুষের ঘরবাড়ি’ সংক্রান্ত কিছু সংশয়

হস্তিমূর্খ

জুন ২২, ২০১৩

বনফুল লিখেছিলেন ‘পাঠকের মৃত্যু’। কিন্তু পাঠকের শুধু মৃত্যু হয় না, জন্মও হয়। ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয় একজন অপরিণত পাঠকের হাতে পড়ে কি হাল হতে পারে কোনও কালজয়ী সাহিত্যের। আমার নিজের কথা বলছি। সবাই পড়ে ফেলেছেন আমি পড়িনি, খানিকটা এই রকম একটা মনোভাব থেকেই পড়তে শুরু করেছিলাম শ্রী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’। সত্যি কথা বলতে কি মোটেই ভাল লাগেনি। খালি একটা জায়গা পেজমার্ক করেছিলাম “জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্তানে চলিয়া গিয়াছি, ইতি সোনা”।

বেশ কিছুদিন পরে অন্য একটি বই হাতে এল। শ্রী অশ্রুকুমার শিকদারের লেখা ‘ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য’। বইটির অন্তর্গত দুটি প্রবন্ধ ‘ভাঙা দেশ, ভাঙা মানুষ, বোবা বাংলা সাহিত্য’ ও ‘ভাঙা বাংলার আখ্যানে ‘আমরা’ আর ‘ওরা’ ’ । মূল প্রতিপাদ্য দেশভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য আসলে দেশভাগ সংক্রান্ত যন্ত্রণার বিষয়ে নীরব। এই নীরবতা পীড়িত করেছে প্রাবন্ধিককে। গভীর বেদনার সঙ্গে লেখকের উপলব্ধি, অত্যন্ত স্বল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ পরবর্তী অধ্যায় যেটুকু স্থান পেয়েছে তা মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দুরবস্থার কথা, সঙ্গে কি হয়েছে নয়, কি হওয়া উচিত ছিল তার কথা এবং খুব সঙ্গত কারণেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে সেই সময় এই বিষয় খুব একটা স্থান পায়নি, কারণ সাময়িকভাবে হলেও এই খণ্ডিত ভূখণ্ড আসলে তাদের কাছে এক জয়। যাই হোক, এই সময়েই খানিকটা বাধ্য হয়ে আবার হাতে তুলে নিতে হল ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’। বলতে গেলে সেই প্রথম ঠিকঠাক পড়া গেল বইটিকে। সংশ্লিষ্ট অনুভব আগেই জানিয়েছি।

এরপর প্রথমেই পড়লাম ‘অলৌকিক জলযান’। জানা ছিল এইটিই পূর্বোক্ত উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব। ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ বইটির শেষে সেই রকমই তথ্য দেওয়া ছিল। খটকা লাগল উপন্যাস শেষ করে। শেষ পাতায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এটি তৃতীয় পর্ব। ইচ্ছে ছিল প্রতিটি পর্ব ধারাবাহিক ভাবে পড়ব। বাধা পড়ল। যাই হোক, হাতে নিলাম ‘মানুষের ঘরবাড়ি’। লেখক নিজেই যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে।

পড়া শেষ করেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লাম। বারবার প্রশ্ন জাগতে শুরু করল লেখকের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও ‘মানুষের ঘরবাড়ি’ উপন্যাসটিকে ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব আদৌ বলা চলে কিনা।

আসুন আপনাদের একবার জানাই আমার এই সংশয়ের কারণ কি। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে জানিয়ে রাখি আমার ব্যবহৃত বইগুলির সংস্করণ।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে – পঞ্চম অখণ্ড সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০২

অলৌকিক জলযান – ষষ্ঠ অখণ্ড সংস্করণ, অক্টোবর ২০১০
মানুষের ঘরবাড়ি – দ্বিতীয় অখণ্ড সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'পঞ্চম অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারী, ২০০২ সালে (প্রথম অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ পায় জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে)। প্রকাশক - করুণা প্রকাশনী। এই সংস্করণের শেষে 'অলৌকিক জলযান'–কে উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই প্রকাশকের প্রকাশিত 'মানুষের ঘরবাড়ি'–র অখণ্ড সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে। এই বইটিতে প্রকাশিত লেখকের একটি বিবৃতি আছে। যার একটি অংশ- "....পাঠকেরও অভিজ্ঞতা 'মানুষের ঘরবাড়ি' আসলে সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব। সুতরাং এখন থেকে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' দ্বিতীয় পর্ব বলেই চিহ্নিত করা গেল"। বিবৃতির তারিখ ০৫-০৯-২০০১। এই বইটির দ্বিতীয় অখণ্ড সংস্করণের (এপ্রিল ২০১০) শেষে উল্লেখিত আছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'–র সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত, তৃতীয় পর্ব - অলৌকিক জলযান,চতুর্থ পর্ব - ঈশ্বরের বাগান। 'অলৌকিক জলযান'-এর প্রথম অখন্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারী, ২০০১ সালে। আর অক্টোবর, ২০১০ ষষ্ঠ অখণ্ড সংস্করণের শেষে উল্লেখ দেখা যায় যে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'– ৩য় পর্ব সমাপ্ত। বলে রাখা ভাল যে এই বইটির প্রকাশকও করুণা প্রকাশনী।

অর্থাৎ সামান্য কিছু বিভ্রান্তি যা দেখা যাচ্ছে সেটাকে আপাত দৃষ্টিতে মুদ্রণপ্রমাদ বলেই মনে হয়। সেটা বাংলা প্রকাশনা জগতে নেহাত দুর্লভ নয়। কিন্তু না, প্রাথমিকভাবে এটি মুদ্রণপ্রমাদ নয়। অন্তত 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' –র প্রথম অখণ্ড সংস্করণের জন্য তো নয়ই। খেয়াল করে দেখুন, 'মানুষের ঘরবাড়ি'-র লেখককৃত স্বীকৃতি তো 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দুই বছর পরে। এমনকি 'অলৌকিক জলযান'-এর প্রথম অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ারও কয়েক মাস পরে। বোধহয় তার পরবর্তী মুদ্রণগুলিতে বিষয়টি শুধরে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'- র ক্ষেত্রে হয়নি। খুব নিশ্চিত নই, তবু যদি এই রকম কিছু ঘটে থাকে, সেটি অবশ্যই মুদ্রণপ্রমাদ।

আরও একটি জিনিস লক্ষ করার আছে। পূর্বে উল্লেখিত বিবৃতিতে লেখক জানিয়েছেন "...১৯৭৬ সালে আমার পিতার মৃত্যু হয়। আর তখনই মনে হয় আসল পর্ব 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজ থেকে বাদ গেছে।" 'মানুষের ঘরবাড়ি' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। তারপর 'অবাঞ্ছিত' নামে একটি উপন্যাস এবং আরও অন্যান্য কিছু প্রকাশিত লেখা জুড়ে নিয়ে উপন্যাসটির আজকের রূপ পেতে বেশ কিছু সময় লাগে। যদিও বর্তমান অখণ্ড সংস্করণে 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'মৃন্ময়ী' ও 'অন্নভোগ' যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খন্ড হিসেবে নামাঙ্কিত হয়েছে। খুব সম্ভবত এই কারণেই বোধহয় সম্পূর্ণ উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকাল সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না, বা হয়ত প্রথম অখণ্ড সংস্করণেই বইটি পূর্ণরূপ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও এ প্রশ্ন তোলা যায় - এত দেরি কেন? কোথাও কি কোন ধন্ধ কাজ করেছিল? 'মানুষের ঘরবাড়ি'–র মত উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যে যার অস্তিত্ব অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল হতে পারেনা, তাকে নিজের মত থাকতে না দিতে কিছুটা হলেও কি লেখক কুণ্ঠিত ছিলেন?

আমার মনে হয়, লেখকের স্বীকৃতি সত্ত্বেও 'মানুষের ঘরবাড়ি'–কে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'–র দ্বিতীয় পর্ব বলে মেনে নিতে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান' এবং 'মানুষের

ঘরবাড়ি' এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যেই। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'–র শেষে এসে দেখা যায় সোনা ভারতে এসে জাহাজে ভর্তি হয়ে জাহাজী হওয়ার ট্রেনিং নেয় আর 'অলৌকিক জলযান'-এর শুরুতে দেখা যায় সোনা ট্রেনিং শেষে জাহাজের খোঁজে রোজ বন্দরে হাজিরা দেয়। একটা সেতু তৈরি হয়েই যায় উপন্যাস দুটির মধ্যে।

অথচ 'মানুষের ঘরবাড়ি' সম্পূর্ণ এসবের বাইরে একটি উপন্যাস। দেশভাগের পরে একটি ছিন্নমূল পরিবার কি করে নতুন করে সব কিছু গড়ে তুলল তারই এক অসাধারণ চিত্রকল্প, অনন্য এক দলিল। ব্যক্তিগত ভাবে আমার ধারণা যে 'মানুষের ঘরবাড়ি' অবশ্যই 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'–র ভেতরকার একটা ফাঁক চমৎকার ভাবে পূর্ণ করে দেয়, কারণ 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সোনার দেশ ছেড়ে চলে আসা এবং জাহাজে ট্রেনিং নিতে শুরু করার মধ্যবর্তী সময় সম্বন্ধে নীরব থাকে। 'মানুষের ঘরবাড়ি' তাহলে কি? একান্তই যদি উপন্যাসটিকে এই সিরিজের অংশভুক্ত করতে হয় সেক্ষেত্রে তাকে কোথায় স্থান দেব? 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-এর দ্বিতীয় পর্বে নাকি তার অন্তর্বর্তী অবিচ্ছেদ্য এক অংশ হিসেবে উপন্যাসের ভেতরেই?

যদিও সিরিজের প্রত্যেকটি উপন্যাস স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবু বিষয়টি নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

রূপকুন্ড

প্রোজ্জ্বল

জুন ২৮, ২০১৩

দুপুরবেলা যখন হামাগুড়ি দিয়ে কালু-বিনায়ক পৌঁছলাম, তখন শরীরে আর শক্তি বলে কিছু বাকি নেই। প্রবল ঠাণ্ডা, তুমুল বৃষ্টি, হাওয়া দিচ্ছে, খিদে পেয়েছে, তার ওপর আবার ওই চড়াই।

কালু-বিনায়কে খানিক হেদিয়ে নিয়ে ভাগুবাসাতে পৌঁছে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। পাথুরে একটা জায়গা, চারদিকে বরফ পড়ে আছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিকে খালি কালচে বাদামী আর খয়েরী রঙ। কোথাও কোথাও ধূসর অথবা সাদা রঙের বরফ। কেমন একটা বিষণ্ণ জায়গা। গিয়েই মনে হল জায়গাটা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

একটা পাথুরে চাতালের ওপর আমাদের তাঁবু খাটানো হল। চাতালটা এতটাই পাথুরে যে তাঁবুতে যেভাবেই শোওয়ার চেষ্টা করি না কেন, মনে হয় শরীরটা একটা আঁকাবাঁকা লাইন হয়ে গেছে। সন্ধে হতে না হতেই নেগেটিভ টেম্পারেচার। তাঁবুর চেন খুললে তাঁবুর মধ্যে মেঘ ঢুকে পড়ে, এরকম অবস্থা। হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি হচ্ছে।

কোথাও কিছু দেখা যায়না। তার ওপর উচ্চতার জন্য শুরু হল মাথা যন্ত্রণা। সব মিলিয়ে এক তুমুল কিতিবিচ্ছিরি অবস্থা। কোনমতে অর্ধেক জেগে, অর্ধেক ঘুমিয়ে রাতটা কাটল।

ভোরবেলা উঠে রূপকুন্ডের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। তখনো সূর্য ওঠেনি। পূব আকাশটা সবে ফরসা হতে শুরু করেছে। পশ্চিম দিকে রাজকীয় ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ – ভোরের আলোতে আস্তে আস্তে গোলাপী হয়ে উঠছে।

চিড়িয়ানাগে পৌঁছে শুরু হল সত্যিকারের ট্রেকিং। সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। পাথুরে রাস্তা ভিজে পিছল হয়ে আছে। পা ফেললেই হড়কে যাচ্ছি, তার ওপর আবার বরফ। গাইডরা বরফের মধ্যে গর্ত করতে করতে চলেছে। সেই গর্তের মধ্যে পা ফেলে চলতে হবে। তার বাইরে পা রাখলে হড়কানোর সম্ভাবনা একদম সেন্ট পারসেন্ট, আর হড়কালে কোথায় গিয়ে যে পড়ব কোন ঠিক নেই। একটু করে যাই, জিভ বের করে হাঁপাই আর ওপরদিকে তাকিয়ে দেখি, উই তো, উই গাম্বাট পাথরটার পেছনেই রূপকুন্ড।

একটা সময় এল যখন রাস্তা বলে আর কিছুই নেই। চড়াই পাহাড়, কোথাও বরফ, কোথাও আলগা নুড়ি-পাথর। প্রত্যেকবার পা রাখবার সাথে সাথেই একটু একটু করে নুড়ি-পাথর নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, এত আলগা। যে যেখান দিয়ে পারো, ওঠো – গো অ্যাজ ইউ লাইক!

ততক্ষণে আমি বেঁচে ফেরার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। এমন সময় দেখতে পেলাম সামনে বেশ খানিকটা বরফে ঢাকা জায়গা, তারপর জমিটা ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। সেখানটা দেখা যাচ্ছেনা, ঢালু জায়গাটার ওপারে একটা পাহাড় খাড়া দেওয়ালের মত সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে। অনেক উঁচুতে যেখানে পাহাড়টা শেষ হয়েছে, সেখানে ঘন নীল রঙের আকাশে ঝকঝক করছে সূর্য। কি তার তেজ! বরফ ঢাকা জায়গাটার পরে যেখানে জমিটা ঢালু হয়ে গেছে ঐখানেই রূপকুন্ড।

ওপরে উঠে কেমন একটা ভেবলে গেলাম। মনে হল পৃথিবী থেকে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। সামনে বরফ ঢাকা একটা লেক। যেদিকে পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেদিকে আমাদের থেকে অনেক নিচে মেঘের একটা স্তর। আর মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশ। আমরা বাঙালীরা, যারা গাঙ্গেয় সমভূমিতে বড় হয়েছি, আমাদের আশেপাশে যেরকম সৌন্দর্য দেখতে পাই, তা যেন কেমন কোমল, স্নেহ মাখানো। কিন্তু এ একেবারে দুর্ধর্ষ সুন্দর।

অনেকক্ষণ পরে যখন বরফ গলতে শুরু করল সূর্যের তাপে, আমরাও নিচে নামা শুরু করলাম। বরফ আর নুড়ি-পাথরের মধ্যে দিয়ে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে নামার ফাঁকে কতকগুলো গোড়ার কথা (পড়ুন গ্যানের কচকচি) জানিয়ে রাখি।

রূপকুন্ড উত্তরাখন্ড রাজ্যে হিমালয়ে ত্রিশুল পাহাড়ের কোলে প্রায় ১৬৫০০, ফুট উঁচুতে অবস্থিত একটা গ্লেসিয়াল লেক। ট্রেকিং শুরু হয় লোহাজং নামে একটা জায়গা থেকে। তিনদিনের একটু বেশি লাগে পৌঁছাতে। প্রথম দিন লোহাজং থেকে দিদনা নামে একটা গ্রাম, তারপরের দিন দিদনা থেকে বেদনী বুগিয়াল, তার পরের দিন বেদনী থেকে ভাগুবাসা। তার পরের দিন আলো ফোটার আগে ভাগুবাসা থেকে বেরিয়ে রূপকুন্ড দেখে একদম বেদনী তে ফেরত। তার পরের দিন বেদনী থেকে ওয়ান গ্রাম। সেখানেই শেষ হয় এই ট্রেক। আমরা তিনজনে মিলে এই রূপকুন্ড ট্রেকে গিয়েছিলাম। আমাদের গাইড ছিল মোহন সিং। মোহন সিং আরো একটা গ্রুপকে আমাদের সাথেই গাইড করছিল। এই দ্বিতীয় গ্রুপটা এসেছিল পুনে থেকে।

যখন নিচে ভাগুবাসাতে ফিরে এলাম, তখন একটা অদ্ভুত আনন্দ এল মনে – এবার বাড়ি ফেরার পালা! ফিরে চটপট স্যাক প্যাক করতে লাগলাম। এদিকে সকাল থেকে প্রায় কিছুই পেটে পড়েনি, তখন বেলা এগারোটা বাজে, কিন্তু তখন কিছু খাবারের নামগন্ধ পাওয়া যাচ্ছেনা।

কি ব্যাপার? খোঁজ করে জানা গেল ওই গ্রুপটার একটা ছেলের রূপকুন্ড ওঠার সময় শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। মোহন সিং তাকে রাস্তায় বসিয়ে খাবার, জল দিয়ে ওপরে গেছিল, আর বলে গেছিল সে যেন কোথাও না যায়। মোহন সিং ফেরার সময় তাকে নিয়ে নিচে নামবে। ফেরার রাস্তায় মোহন সিং তাকে দেখতে পায়নি। তাঁবুতে ফিরে এসেও দেখা গেছে সে নেই। গেল কই? নির্ঘাত রাস্তায় কোথাও বসেছিল। ফেরার তাড়াহুড়োতে কেউ খেয়াল করেনি। মোহন সিং তাই কিচেন টেন্ট এর ছেলেটাকে নিয়ে আবার গেছে তাকে খুঁজতে। অগত্যা থাকো বসে, যতক্ষণ না তারা ফেরে। এদিকে ভাগুবাসা থেকে বাকি টীমগুলো এক এক করে ফিরে যেতে লাগল। প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল। তাও কেউ ফেরেনা। আস্তে আস্তে বাকি সবাই ফিরে গেল, জায়গাটাতে শুধু আমরাই পড়ে রইলাম। কি অদ্ভুত চুপচাপ হয়ে গেল ভাগুবাসা। সময় যায়, বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই, কখন কেউ আসবে! মাঝে মাঝেই তাঁবুর পরদা সরিয়ে দেখি কেউ আসছে কিনা। যত সময় যায়, মাথায় তত উল্টোপাল্টা চিন্তা এসে জাঁকিয়ে বসে। এরকম করেই কেটে যায় আরো ঘন্টাখানেক। হঠাৎ দেখা যায় কিচেন টেন্ট এর ছেলেটা আসছে। এসে বলে, "বাবুজি, উ ফিসল গয়া। উসকা বডি মিলা হ্যায়। বহুত নিচে। ম্যায় আয়া গোড়া লে জানে কে লিয়ে।"

হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে। কেমন অদ্ভুত একটা ভয় এসে চেপে বসল মনের ওপর। ওদের গ্রুপটায় একটা মেয়ে ছিল। হঠাৎ পাশের তাঁবু থেকে মেয়েটি চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আগেই বলেছি, ভাগুবাসা মনের মধ্যে একটা ঈরি ফীলিং নিয়ে আসে। জনশূন্য ভাগুবাসাতে বসে একটা মেয়ের চিৎকার করে কান্নার আওয়াজ –

মনে পড়লে আজো শিউরে উঠি। আবার শুরু হয় অপেক্ষা। কখন মোহন সিং ফিরবে। কোথাও কোন আওয়াজ হয়, আর আমাদের মনে হয় ওই বুঝি আসছে। এইবার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে হবে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, ঠায় বসে থাকি, মোহন সিং আর ফেরেনা।

বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ তাঁবুর পর্দা সরিয়ে কিচেন টেন্ট এর ছেলেটা উঁকি মারে। জানায় ওরা বডিটা নিয়ে ফিরে এসেছে। আজকের মধ্যেই আমাদের বেদনী ফিরতে হবে, নাহলে বডিটা পচতে শুরু করবে। আমাদের কিছু খেয়ে নেবার জন্য ডাকল। ঘড়িতে দেখি বিকেল সাড়ে চারটে বাজে। এখন বেদনী!! চটপট স্যাক গুছিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই। মোহন সিং প্রত্যেককে খাবারের থালা ধরিয়ে দেয়। পাশেই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। পিঠে মৃতদেহটা। তাকাতে সাহস হয়না, তবু চোখ চলেই যায়। চারটে হাত-পা কি ভয়ঙ্করভাবে ঝুলছে। মাথার কাছটা একটা চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা, বস্তাটা চুইয়ে রক্ত পড়ছে পাথরের ওপর। ঘোড়াটা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। কিছুই খেতে পারিনা। ইতিমধ্যে ওদের গ্রুপটা বেরিয়ে পড়েছে। তাদের পেছন পেছন মোহন সিং মৃতদেহ সমেত ঘোড়াটা নিয়ে চলল। তার খানিক পরে আমরা তিনজন। কিচেন টেন্ট এর লোকেরা রয়ে গেছে, গোছগাছ করে তারপর আসবে।

তিনজনে যখন ভাগুবাসা থেকে হাঁটা শুরু করলাম তখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। সাতটায় সূর্যাস্ত হবে। হিসেব করে ঠিক বুঝতে পারলাম না ততক্ষণে আমরা ঠিক কতদূর যেতে পারব। হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। কোথাও একটা আওয়াজ নেই, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আমরা তিনজনে চুপচাপ কোন কথা না বলে যত জোরে যাওয়া যায়, চলেছি। মাঝে মধ্যেই রাস্তায় পাথরের ওপর পড়ে রয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত!

দুদ্দাড়িয়ে যখন পাথরনাচুনি এসে পৌঁছলাম, তখন বাকি দুটো দলকে পেরিয়ে গেছি, সবার আগে হাঁটছি। আরো জোরে পা চালালাম – দিনের আলো থাকতে থাকতে যতখানি যাওয়া যায়। ঘোড়ালোটানি যখন পৌঁছলাম, ঠিক তক্ষুনি সূর্য ডুবল। ঘড়িতে তখন সন্ধে সাতটা। আমাদের ধারণা হয়েছিল ঘোড়ালোটানি থেকে বেদনী খুব বেশি দূর না। কাজেই দিনের আলো থাকতে থাকতে ঘোড়ালোটানি পৌঁছতে পেরে আমরা ভারি খুশি হলাম। এটা যে কতবড় ভুল ধারণা ছিল, সেটা পরে বুঝতে পেরেছিলাম!

কোথাও একটা জনপ্রাণী দেখা যায়না। আমরা তিনজনে মিলে হাঁটছি। দিনের আলো দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিটাও ক্রমশ বাড়ছে। ঠিক সওয়া সাতটা নাগাদ দিনের সব আলো শেষ হয়ে গেল – ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। আমাদের তিনজনের কাছে একটাই টর্চ। সেটা নিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছি তিনজনে। বৃষ্টিটা বাড়তে বাড়তে মুষলধারে এল। বৃষ্টিতে পথের পাথরগুলো পিছল হয়ে আছে, পা রাখামাত্র হড়কে যাচ্ছে। পায়ে চলা পথ, খুব বেশি হলে তিন ফুট চওড়া, বাঁদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে, আর ডানদিকে খাদ। সেই সময় কোথা থেকে এল কুয়াশা। সে এমন কুয়াশা যে টর্চের আলো রাস্তা পর্যন্ত ভালো করে পৌঁছায় না। ঠিক করে বুঝতে পারিনা কোথায় পা রাখছি, পাথরে না মাটিতে। ভিজে চুপ্পুড় হয়ে গেছি। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে চলেছি। বেদনী যাবার জন্য এই রাস্তা থেকে একটা বাঁক নিতে হয়, কিন্তু এই কুয়াশার মধ্যে সে বাঁক চেনা যে আমাদের কম্ম নয় তা

আগেই বুঝেছি। কিন্তু তখন পেছনে ফিরে যাবারও সাহস নেই। একবার ঠিক করলাম দাঁড়িয়ে পড়ি, মোহন সিং এলে তারপর যাব। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াবার পরও কেউ আসেনা। এদিকে ঠান্ডায়, বৃষ্টিতে ভিজে জামাকাপড় পরে আমরা জমে জাওয়ার অবস্থা। হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। তখন আমরা আবার চলাই ঠিক করলাম। ততক্ষণে আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের পরিনামও ওই ছেলেটার মতই হতে চলেছে। এমন সময় পেছন থেকে যেন একটা আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। আবার! কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মনে হয় যেন বহু দূরে কেউ কোথাও একটা আলো নাড়াচ্ছে!

আমরা প্রবল জোরে চিৎকার শুরু করি। টর্চের আলোটা নাড়তে থাকি। উত্তরে ওদিকেও আওয়াজটা খানিক বাড়ে। খানিক পরে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটা অবয়ব আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে – ছাতা মাথায় একটা লোক। এসে বললে, "মোহন সিং নে মুঝে ভেজা।" তারপর সমস্ত কিছু কেমন অস্পষ্ট হয়ে আসে। খালি মনে পড়ে আমার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে একটা লম্বামতন লোক, গায়ে একটা জোব্বা, একহাতে মাথায় ছাতা ধরে আছে। কুয়াশায় তাকে স্পষ্ট দেখা যায়না। বৃষ্টির মধ্যে টর্চের আলোয় তাকে কেমন নীলচে একটা মূর্তির মত দেখায়। সে তার দেশের নানান গল্প করতে করতে আমার আগে আগে চলেছে আর আমি কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করছি। কখন যেন বাকি দলদুটোও পেছনে এসে হাজির হয়। এখনো মনে আছে, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেই একটু আস্তে হচ্ছি, সেই ঘোড়াটা কাঁধের কাছে এসে নিঃশ্বাস ফেলছে। অমনি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করছি। খানিক পরে আবার যে কে সেই। এভাবে কতক্ষণ হেঁটেছিলাম মনে নেই। যখন বেদনী পৌঁছলাম, তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা।

ঠিক হয়েছিল আমরা বেদনীতে থেকে যাব। আর অন্য গ্রুপটা সেই রাতেই ওয়ান গ্রামে ফিরে যাবে। কিন্তু আমাদের টেন্ট তখনো এসে পৌঁছায়নি। আমাদের জন্য একটা ট্রেকার্স হাট খুলে দিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা। একটা কাঠের ঘর, ভেতরে আগুন জ্বালা হল। আমরা তিনজনে ভেতরে ঢুকে বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। স্যাক ঘেঁটে সব থেকে শুকনো যে জামা-কাপড়গুলো পাওয়া গেল, সেগুলোও আদ্দেক ভেজা। আমাদের টেন্ট, স্লীপিং ব্যাগ কিছুই এসে পৌঁছায়নি। তাই সেই ভিজে জামাকাপড় পরে বসে বসে কাঁপছি। ঘরে আগুন জ্বলছে, কিন্তু তাও যেন ঠান্ডা যায়না। এমন সময় অন্য গ্রুপটা এসে ঢুকল ওই ট্রেকার্স হাটে। কি ব্যাপার! জানা গেল, আমরা সবাই এলেও মোহন সিং তখনো এসে পৌঁছায়নি। ফরেস্ট অফিসার জানিয়েছে মোহন সিং না আসা পর্যন্ত সে বাকিদের যেতে দিতে পারবেনা। সবাই মিলে ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন মোহন সিং আসবে, কখন স্লীপিং ব্যাগগুলো এসে পৌঁছাবে, এই ঠান্ডায় আর পারা যাচ্ছেনা। অন্ধকার কাঠের ঘরটা কেমন স্যাঁতস্যাঁতে আর চুপচাপ। শুধু মাঝে মাঝে মেয়েটার ফোঁপানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। থেকে থেকে আগুনটা নিবু-নিবু হয়ে আসছে। তখন কেউ একটা উঠে গিয়ে খানিকটা কেরোসিন ঢেলে দিচ্ছে, আগুনটা আবার দপ করে জ্বলে উঠছে। সারা ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে উঠছে, চোখ জ্বালা করছে। দরজার বাইরেটায় শোয়ানো হয়েছে ছেলেটাকে। সবাই ঠান্ডায় জড়সড় হয়ে বসে বসে ঢুলছে। ফরেস্ট অফিসার এসে বসেছে। সে আমাদের এক এক করে জেরা করছে কি হয়েছিল, আর তারপর গম্ভীর মুখ করে মাথা নেড়ে তার খাতাতে কিসব জানি লিখে রাখছে। এদিকে মোহন সিং আর ফেরেনা!

বেগতিক দেখে ফরেস্ট অফিসার একদল লোককে পাঠাল মোহন সিংকে খোঁজার জন্য। ঘন্টাখানেকের মধ্যে সেই দলটি ওপরে পাথরনাচুনিতে পৌঁছে ফোন করে জানাল যে পথে কোথাও তারা মোহন সিংকে দেখতে পায়নি। এদিকে পাথরনাচুনিতে একজন জানিয়েছে যে সে মোহন সিংকে নিচে যেতে দেখেছে ঘন্টা তিনেক আগে। তাহলে সে গেল কোথায়? ফরেস্ট অফিসার গম্ভীর মুখ করে মাথা নেড়ে স্বগতোক্তি করে, "লাগতা হ্যায়, মোহন সিং ভি গয়া। ইয়ে বারিষ নে সব গড়বড় কর দিয়া..." আমরা বুঝতে পারিনা ঠিক কি হচ্ছে! চিন্তা করার শক্তিটাও যেন হারিয়ে ফেলেছি। এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে থাকি। আগুনটা আবার আস্তে হয়ে আসে।

বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। হঠাৎ দড়াম করে ট্রেকার্স হাট এর দরজাটা খুলে গেল। একঝলক বরফ ঠান্ডা হাওয়া ঘরটায় ঢুকে পড়ল। হাওয়া পেয়ে আগুনটাও আবার দপ করে জ্বলে উঠলো। ধড়মড় করে উঠে বসি আমরা সবাই। আধো আলো আধো অন্ধকারে স্বপ্নের মত দেখা যায় একটা লোক, আগাগোড়া বর্ষাতিতে মোড়া, ঘরের মধ্যে ঢুকে আসে, মাথার টুপিটা খুলে ফেলে – মোহন সিং! ঘুমভাঙ্গা চোখে ওই আলো আঁধারিতে যেন মসীহার মত দেখতে লেগেছিল সেদিন মোহন সিংকে।

অন্য গ্রুপটা তাড়াতাড়ি আসার জন্য ওদের স্যাকগুলো ওপরে ভাগুবাসাতে ফেলে এসেছিল। কথা হয়েছিল ঘোড়াগুলো ওদের স্যাকগুলো বয়ে আনবে। কিন্তু একটা ঘোড়া কমে যাওয়ায় এতগুলো স্যাক ঘোড়ার পিঠে চাপানো সম্ভব হয়নি। ঘোড়াওয়ালা তাই নিচে নেমে এসে মাঝরাস্তায় মোহন সিংকে ধরে একথা জানায়। মোহন সিং তখন আবার ফিরে যায় ভাগুবাসাতে। তারপর স্যাকগুলোকে কাঁধে চাপিয়ে বাকি ঘোড়া, টেন্ট,পিং ব্যাগস্লী , সমস্ত নিয়ে এই মাঝরাতে বেদনী পৌঁছেছে। সব কিছু শোনার পর সন্দেহ হয় এ কি সত্যি মানুষ?

বাকি রাতটা সেদিন ওরকমভাবে বসে বসেই কেটেছিল কারণ আমাদের স্লীপিং ব্যাগগুলো আনার সময় বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল। সকাল ছ'টার সময় উঠে মোহন সিং আমাদের ম্যাগি করে খাওয়াল। আগের দিন খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হবার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইল। আমরা জানতাম না কি বলা উচিত। আবার শুরু হল হাঁটা, এবার দিনের আলোয়, নিশ্চিন্ত মনে। ঘন্টা দুয়েক উৎরাই ভাঙ্গার পর যখন আমরা নীলগঙ্গা নদীর পুলটাতে পৌঁছলাম তখন সকালের উজ্জ্বল রোদ ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীপারের একচিলতে ঘাসে ছাওয়া জমিতে। ঘন সবুজ ঘাসের ওপর সাদা, হলুদ নানা রঙের ফুলগুলো দুলছে। চারদিকে পাখি ডাকছে, কতকগুলো মেয়ে শুকনো পাতা কুড়িয়ে গ্রামে ফিরছে। life is so magnificently beautiful..

কাকাবাবু, সাবা কাব্বানি আর সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ

অতনু

সেপ্টেম্বর ৯, ২০১৩

কেমন আছেন কাকাবাবু? সন্তু, জোজো, দেবলীনা, ওরা সবাই ভালো আছে? এবারই প্রথম পুজোয় আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। নতুন কোন অভিযানে যাচ্ছেন না কি? গেলেও আমরা তো আর জানতে পারব না। তাই পুরনো কথাগুলো ভাবছিলাম।

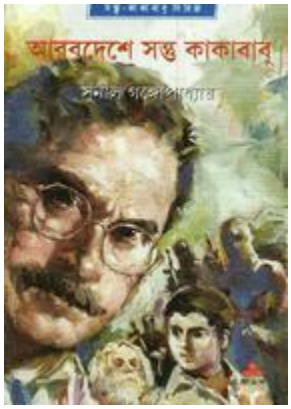

আচ্ছা আপনার সাবা কাব্বানির কথা মনে আছে? আপনি আর সন্তু যখন ক্রাক দ্য শ্যাটেলিয়র দুর্গে বন্দি ছিলেন, তখন কাব্বানি আপনাদের পাহারা দিত। আপনি বলেছিলেন জেলখানার পাহারাদারের এমন ব্যবহার কোন গল্পের বইয়েও দেখা যায়না। তার ছেলে যখন মারা যায় সে ছিল সন্তুরই বয়সী। প্রচণ্ড শীতে সন্তুকে কাঁপতে দেখে সে ছেলের একটা কোট এনে জোর করে পরিয়ে দিয়েছিল। তার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, "সিরিয়া দেশটা বেশ শান্তিপূর্ণ, যুদ্ধটুদ্ধ হয়না। তবে মানুষই তো মানুষের শত্রু।" কিম্বা বাঙালি ব্যবাসায়ী প্রোজ্জ্বল রায়? সেও তো বলেছিল "এ দেশের মানুষগুলো সত্যি ভালো। পাশের দেষগুলোতে কত যুদ্ধবিগ্রহ আর মারামারি চলছে। এ দেশটা কিন্তু শান্তিপুর্ণ। আপনাদের ভালো লাগবে।" বেশিদিন নয়, আমি এই বছর তিনেক আগের কথা বলছি। আপনারা যেবার ধনকুবের আবু-আল-ফিদা সালাদিনের আমন্ত্রণে সিরিয়া তারতুফ শহরে গিয়েছিলেন।[১] এখন নিশ্চয়ই ওই কথাগুলো এক একটা নির্মম রসিকতা বলে মনে হয় আপনার? আপনারা ফিরে আসার এক বছরও কাটেনি, ওই দেশে যে অশান্তি শুরু হল তা এখনো থামার তো কোন লক্ষণই নেই বরং তার ভয়াবহতা রোজই বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক মানুষ মারা গেছেন, কুড়ি লাখ মানুষ, সীমানা পেরিয়ে আশেপাশের দেশগুলোর উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। সব মিলিয়ে প্রায় ষাট লাখ মানুষ অর্থাৎ সিরিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ঘরছাড়া।[২]

এগুলো অবশ্য নেহাতই স্ট্যাটিস্টিক্স। একটা লেভেলের পর তো আর সংখ্যার কোন অর্থ হয় না। কাকাবাবু আপনি নিশ্চয়ই গত ২১শে আগষ্ট খবরের কাগজে দেখেছেন, সেই সারি দিয়ে শুয়ে থাকা বাচ্ছাগুলোর ছবি? ঘুমের মধ্যেই তাদের ঘরে হানা দেয় বর্ণহীন, গন্ধহীন সারিন গ্যাস। ছটফট করতে করতে দমবন্ধ হয়ে তারা মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে।[৩] ঐ ছবিগুলো দেখতে দেখতে আপনার কি রবের কথা মনে পড়ছিল? সেই ফুটফুটে বাচ্ছাটা, যে আপনাকে আর সন্তুকে কমলালেবু দিয়েছিল? আপনি শিখিয়ে দেওয়ার পর সুন্দর উচ্চারণে ন-ম-স-কা-র বলে হাত নেড়েছিল? তার মায়ের নাম ছিল জেনোবিয়া। আপনি যখন বললেন জেনোবিয়া নামে সিরিয়ার এক রাণী ছিলেন, যিনি রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তখন ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হয়ে বলেছিলেন, "আপনি আমাদের দেশের ইতিহাস জানেন দেখছি! আপনি কি অধ্যাপক?" আসুন ছোট্ট করে একবার এই দেশটার ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে নিই।

পৃথিবির প্রাচীনতম সভ্যতা যেখানে গড়ে উঠেছিল সেই উর্বর হাঁসুলির (Fertile Crescent) অন্তর্ভূক্ত ছিল আজকের সিরিয়া।

পশ্চিমে মিশর থেকে শুরু করে, ভূমধ্যসাগরকে ঘিরে, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, লেবানন হয়ে ইরান, তুরস্কের খানিকটা অংশ আর পূর্বদিকে ইরাক, ম্যাপের দিকে তাকালে দেখা যাবে এই অঞ্চলটার চেহারা অনেকটা হাঁসুলি বা কাস্তের মত। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস আর নীলনদের জলে উর্বর মাটি এই হাঁসুলিতে সভ্যতা পত্তনের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় দশহাজার বছর আগের মানুষের বসতির প্রমাণ পাওয়া গেছে এখানে। চাকার ব্যবহার, নব্য প্রস্তরযুগে চাষবাস ও পশুপালন এমনকি বর্ণমালার উদ্ভবও হয়েছিল সিরিয়ায়। নীলনদের দান মিশর আর টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের মাঝে মেসোপটেমিয়া (ইরাক), দুই বিখ্যাত প্রাচীন সভ্যতার সেতু ছিল সিরিয়া। হাজার হাজার বছর ধরে দুই সভ্যতার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সংস্কৃতির আদান প্রদান সমৃদ্ধ করেছে সিরিয়াকে। দলে দলে এসেছে মেসোপটেমিয়া থেকে সুমেরীয়, আসারীয়, আক্কাদরা, মিশর থেকে মিশরীয়রা, এশিয়া মাইনর থেকে হিটাইটরা। ঠিক আমাদের দেশের মতই "দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা"।[৪,৫]

ভারতবর্ষের মতই সিরিয়াকেও বারবার বহিরাগতদের হাতে আক্রান্ত হতে হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পারস্য সাম্রাজ্য, আলেক্সান্ডারের গ্রীক সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য, ইসলামিক আরব সাম্রাজ্য ও অটমান তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সিরিয়া। আরব মুসলমানদের অধিকারের সময় থেকেই আরবি সিরিয়ার প্রধান ভাষা হয়ে ওঠে। পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে ভারতবর্ষের সীমান্তে হিন্দুকুশ পর্বতমালা, বিশাল ইসলামিক সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে দামাস্কাস নগরীর রমরমা বেড়ে যায়। খ্রিস্টধর্মের সঙ্গেও সিরিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত পুরনো। সেন্ট পল নাকি দামাস্কাসের পথে যিশুখ্রিস্টের দেখা পেয়ে ইহুদি মতবাদ ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং দামাস্কাস থেকেই তাঁর নতুন ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। নানা জাতিধর্মের সমাহার ঘটলেও আরব সুন্নীরাই ক্রমশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠল। তবে তারা শিয়া, ইহুদী, মেরোনাইট ও আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের সঙ্গে মোটামুটি শান্তিতেই সহাবস্থান করত।[৬]

সালাদিন আপনাকে সম্ভবত ভেড়ার চামড়ার ওপর লেখা কয়েকটা নথি দিয়েছিলেন। আরামাইক ভাষায় লেখা ঐ নথিগুলোতে স্বয়ং যিশুখ্রিস্টের হাতের লেখা ছিল বলে সালাদিনের অনুমান। প্রায় তিনহাজার বছরের পুরনো এই আরামাইক ভাষাতেই নাকি যিশু কথা বলতেন। দীর্ঘ বিবর্তনের ফলে এই ভাষা নানা উপভাষায় ভেঙে গেছে। এখনও খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মাবলম্বী পশ্চিম এশিয়ার অনেক বিচ্ছিন্ন জনজাতি এইসমস্ত উপভাষায় কথা বললেও আরামাইক ভাষাকে বিপন্ন বলেই ধরা হয়। ঐ নথির পাঠোদ্ধার করার আশায় আপনারা মম আলুলা গ্রামে গেলেন। দামাস্কাস থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের খাঁজে গড়ে ওঠা এই গ্রামটির বৈশিষ্ট হল এখানকার হাজার দুয়েক অধিবাসী সকলেই পশ্চিমী আরামাইক ভাষায় কথা বলেন।[৭] এত জায়গা থাকতে এরা পাহাড়ের মধ্যে থাকে কেন এ ব্যাপারে সন্তু কৌতূহল প্রকাশ করতে আপনি বললেন, "একসময় খ্রিস্টানরা ইহুদি আর রোমানদের ভয়ে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াত, লুকিয়ে থাকত। সেই রকমই একটা গোষ্ঠী এই পাহাড়ের গুহাগুলোয় আশ্রয় নিয়েছিল। এরা তাদেরই বংশধর। এখনও সেই সময়ের ভাষা বলে। তবে এখন নিশ্চয়ই এদের অনেকে চাকরিবাকরি করে। অন্য ভাষাও শিখেছে, তবু নিজেদের পুরনো ধারাটা বজায় রেখেছে"। ভাগ্যিস রেখেছিল, তাই চলতি সংঘর্ষের আঁচ থেকে এরা অনেকদিন অবধি নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে সিরিয়ার ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতীক মম্ আলুলা আজ অস্তিত্বের সঙ্কটে। কদিন আগেই আল কায়দার উগ্রপন্থীরা ৮ জন নিরাপত্তারক্ষীকে খুন করে গ্রামটি দখল করে। পাল্টা অভিযান চালাচ্ছে সরকারি বাহিনীও।[৮] আরামাইক ভাষা আর কদিন টিকে থাকবে বলা যাচ্ছেনা, কাকাবাবু। ভাগ্যিস সালাদিন ঐ দলিলটা আপনাকে দিয়ে দিয়েছিলেন, নাহলে এই অশান্তির মধ্যে ওটার কথা আর কে মাথায় রাখত!

শুধু মম্ আলুলা নয়, আড়াই বছরের গৃহযুদ্ধের শিকার হয়েছে প্রাচীন সভ্যতার বহু ঐতিহ্য। আল কাশিম ওরফে ইব্রাহিম আপনাদের যে ক্রাক দ্য শ্যাটেলিয়র দুর্গে আটকে রেখেছিল, সেটা তৈরী করেছিল কুর্দরা, একাদশ শতাব্দীতে। পরে তা ক্রুসেডারদের হাতে যায়। ইতিহাসের বহু ঘটনার সাক্ষী এই কেল্লার একটা টাওয়ার ভেঙে পড়েছে সেনাবাহিনীর বিমান হানায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সৈদনেয়ার কনভেন্ট অফ আওয়ার লেডি চার্চ, আলেপ্পোর বিরাট মসজিদ, বিখ্যাত আল মানার বাজার, প্রাচীন আসিরীয় মন্দির ও আরো অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন। হজরত মহম্মদের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিজির আল কিন্দীর সমাধিও রেহাই পায়নি ইসলামের ধ্বজাধারী বিদ্রোহীদের হাত থেকে।[৯]

যাকে সিরিয়া বলছি সেই অঞ্চলের মধ্যে আজকের প্যালেস্তাইন, জর্ডন, লেবানন, এবং ইরাক ও তুরস্কের খানিকটা অংশও পড়ছে। আধুনিক সিরিয়ার পত্তন বলা যেতে পারে ফরাসী ম্যানডেটের মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ ও ফরাসীরা আরবভূমিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ইরাক, প্যালেস্তাইন, জর্ডন বৃটিশরা দখলে নেয় আর ফরাসীদের ভাগে পড়ে সিরিয়া, লেবানন।[৬] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে সিরিয়া স্বাধীন হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় ও তা শেষ হওয়ার পরেও পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা, যাকে মধ্যপ্রাচ্য বলা হয়, বিশ্বরাজনীতির নানা তৎপরতার সাক্ষী। মিশরের আরব জাতীয়তাবাদী নায়ক আবদুল গামাল নাসেরের ডাকে সাড়া দিয়ে সিরিয়া মিশরের সঙ্গে জোট বেঁধে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলে, কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যেই আবার দুই দেশ পৃথক হয়ে যায়। এদিকে তেলসমৃদ্ধ এবং রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা চলে যাওয়ার আগে প্যালেস্তাইনের মাটিতে ইজরায়েল নামে ইহুদীদের জন্য একটা রাষ্ট্র খাড়া করে গেল। প্রসঙ্গতঃ ইহুদীরা ঐ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই ছিল, আরবদের সঙ্গেই। তার ওপর হিটলারের উত্থানের পর ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদীরা দলে দলে চলে এলেন প্যালেস্তাইনে। তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের হয়ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্যালেস্তাইনের মধ্যে ইজরায়েলের প্রতিষ্ঠায় মধ্যপ্রাচ্যে যে সঙ্ঘাতের সূত্রপাত হল তা মেটার কোন সম্ভাবনা আজও দেখা যাচ্ছেনা। পশ্চিমীদের সমর্থনপুষ্ট ও উচ্চ সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ইজরায়েল ছুতোনাতায় আরব দেশগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে নিজের জমি বাড়িয়ে নিয়েছে। নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকছেন প্যালেস্তিনীয়রা।

১৯৪৭ সালে সিরিয়ায় মাইকেল আফলাকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় আরব স্যোসালিস্ট বাথ পার্টি। আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদী আদর্শ নিয়ে এবং অনেকটা লেনিনীয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কাঠামো নিয়ে বাথ পার্টি দ্রুত ইরাক, লেবানন, জর্ডন, সুদান ইত্যাদি দেশে সংগঠন বিস্তৃত করে। ১৯৬৩তে বাথ পার্টি সিরিয়ায় ক্ষমতা দখল করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট জাহিদ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশ গড়তে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে গোলান হাইট খোয়ানোর পর বাথ পার্টির আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব চরমে উঠল। অবশেষে আবার একটা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাফেজ আল আসাদ পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করলেন। ১৯৭২ সালে গণভোটে আসাদ সাত বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি হন। পরের বছর সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সিরিয়া নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। সিরিয়াকে মুসলিম জনবহুল ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষনা করা হয়। কয়েকটা কমিউনিস্ট, বামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠন কে নিয়ে বাথ পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে জাতীয় দেশপ্রেমিক মোর্চা। এই মোর্চাই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।[১০]

সিরিয়ার পাশাপাশি ইরাকেও বাথ পার্টি ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু ভাগাভাগির চিরাচরিত নিয়ম মেনে বাথ আন্দোলন সিরিয়া ও ইরাকপন্থী অংশে ভেঙ্গে যায়। দুই গোষ্ঠির তিক্ততা এমন চরমে ওঠে যে ইরাক ইরান যুদ্ধ ও উপসাগরীয় যুদ্ধে সিরিয়া ইরাকের বিপক্ষে যোগ দেয়। ২০০৩ এ ইরাকে মার্কিন আক্রমণ ও ফাঁসির নামে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যার বিরোধিতা অবশ্য সিরিয়া করেছিল।

প্রেসিডেন্ট আসাদ ছিলেন আলাওইট সম্প্রদায়ভুক্ত, যা আসলে শিয়া ইসলামেরই একটা শাখা, অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষ সুন্নী মুসলমান। তাই একটা দ্বন্দ্ব ছিলই, কিন্তু ইসলামিক সাম্রাজ্য ও অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের

ঐতিহ্য মেনে সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠী সুন্নী আরব, আলাওইট, খ্রিস্টান, কুর্দ সকলকে নিয়েই সহিষ্ণুতার বাতাবরণ বজায় রেখেছিলেন। আটের দশকের প্রথমদিকে মৌলবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম ব্রাদারহুড হোমস, হামা ও আলেপ্পো শহরে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করে। সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে দশ থেকে পঁচিশ হাজার মানুষ নিহত হন। এর পর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়। বাথ পার্টির ক্ষমতা দখলের সময় থেকেই সিরিয়ায় জরুরী অবস্থা বলবৎ ছিল।[১১]

হাফেজ আল আসাদ তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে বড়ছেলে বাসেলকে ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি পথদুর্ঘটনায় নিহত হলে ছোট ছেলে বাসারের ভাগ্য খুলে গেল। বাবার ডাকে স্নাতকোত্তর পাঠ অসমাপ্ত রেখেই তিনি তড়িঘড়ি দেশে ফিরলেন। আপনি কি এর সঙ্গে অন্য কোন ঘটনার মিল খুঁজে পাচ্ছেন? ঠিক ধরেছেন, সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু না হলে তো রাজীবের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ত না! কে বলতে পারে, তাহলে হয়ত আজ বরুণ গান্ধীকেই নরেন্দ্র মোদীর উল্টোদিকে দেখা যেত!

২০০০ সালে হাফেজের মৃত্যুর পর মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট হলেন বাসার আল আসাদ। পেশায় সামরিক চক্ষু চিকিৎসক, বিলেতফেরত তরুণ প্রেসিডেন্টকে ঘিরে সিরিয়াবাসীর মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। ২০০৭ এর গণভোটে ৯৭% ভোট পেয়ে আসাদ বিপুলভাবে জয়ী হলেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। ওপর ওপর কিছু সংস্কার হলেও জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার, গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসার বা বহুদলীয় নির্বাচনের কোন প্রক্রিয়াই শুরু হল না। তার সঙ্গে দুর্নীতি ও আসাদ পরিবারের স্বজনপোষণ তো ছিলই। সোভিয়েতের পতনের পর সিরিয়ার অর্থনীতিতে ধাক্কা আসে। সমাজবাদী পথ ছেড়ে মুক্ত অর্থনীতি বেছে নেওয়ার অবধারিত ফল হিসেবে আয়বৈষম্য বাড়তে লাগল। বহুদিন ধরে বজায় রাখা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও টাল খেল। বিশেষ করে আরব ও কুর্দ সুন্নীরা নিজেদের বঞ্চিত ও শোষিত মনে করতে লাগলেন।[১২]

আপনারা সিরিয়া থেকে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই তিউনিশিয়া ও মিশরে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হল এবং দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল গোটা আরব দুনিয়ায়, যাকে সাধারণভাবে আরব বসন্ত বলা হয়ে থাকে। ২০১১

সালের ১৫ই মার্চ সিরিয়ার দারা শহরে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, দুর্নীতি প্রতিরোধ, জলসংকট নিরসন ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীতে বিশাল বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হল। ক্রমশ এই আন্দোলন দেশের অন্যত্র প্রসার পেল এবং আর সব দাবীকে পিছনে ফেলে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীটাই মুখ্য হয়ে উঠল। গঠিত হল ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর ডেমোক্রাটিক চেঞ্জ। প্রথমদিকে দমন পীড়নের রাস্তা ধরলেও অচিরেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝল সরকার। ২৬শে মার্চ ২০০ জন বন্দী মুক্তি পেল। ২১শে এপ্রিল জরুরী অবস্থা উঠে গেল, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যক্রমের অধিকার স্বীকৃত হল। এক বছরের মধ্যে বহুদলীয় নির্বাচনের সংস্থান রেখে নতুন সংবিধান রচিত হল। তুমুল অশান্তির মধ্যেই ভোট হল এবং সংসদের ৬০% শতাংশ আসনে জিতল বাথ পার্টি। অবশ্য বিদ্রোহীরা এই ভোট বয়কট করেছিল।[১৩]

কিন্তু এরমধ্যে ছবিটা বদলে গেছে। একইসঙ্গে মৌলবাদী সন্ত্রাস ও জায়নবাদী আগ্রাসনের প্রতিরোধ করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পতাকা তুলে ধরে সিরিয়া নিজেকে আঞ্চলিক ও বহুজাতিক কায়েমী স্বার্থগুলোর শত্রু করে তুলেছিল।

তারা এ সুযোগ ছাড়তে চাইবে কেন? তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগাতে শুরু করল অশান্তিতে। সিরিয়ার সেনাবাহিনী থেকে একদল অফিসার ও সেনা বেরিয়ে গিয়ে তৈরী করল ফ্রি সিরিয়ান আর্মি। দেশের বিভিন্ন এলাকায় নাশকতা, সরকারি দপ্তর, স্কুল, হাসপাতাল, জনপদের ওপর হামলা চালিয়ে দেশের বেশ কিছু এলাকা দখল করল তারা। দেশের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র আলেপ্পো সরকারি বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। পাল্টা আক্রমণে গেল সিরিয়ার নিরাপত্তাবাহিনী। সরকারের হয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ল অনেক আঞ্চলিক মিলিশিয়াও।

ইজয়ায়েলি দখলদারির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত লেবাননের হেজবোল্লা এবং প্যালেস্তাইনের পপুলার ফ্রন্টও সিরিয়া সরকারের পাশে দাঁড়াল। দুপক্ষের গোলাগুলিতে দুর্বিষহ হয়ে পড়ল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। ২০১২-র গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হল আল নুসরা ফ্রন্ট। আল কায়দার এই শাখা গোষ্ঠীটি আপাতত আসাদের বিরুদ্ধে লড়লেও তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সিরিয়ায় শরিয়তি কানুন ও কট্টর সুন্নী ওয়াহাবী শাসন কায়েম করা। সরকারি বাহিনী ও বাথ পার্টির সমর্থকদের পাশাপাশি তাদের লক্ষ্য হয়ে উঠল দেশের খ্রিস্টান ও আলাওইট অধিবাসীরা। গণতন্ত্রের দাবীতে যাঁরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁরা হারিয়ে গেলেন, অনেকে খুন হলেন উগ্রপন্থীদের হাতে।

কাকাবাবু, আপনার সঙ্গে তো হানি আলকাদির আলাপ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত এই বিপ্লবীটি আপনাকে বলেছিল, "যারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে জানেনা তারা কী করে বিপ্লবী হবে?"[১৪] আপনি যদি সিরিয়ার "বিদ্রোহীদের" হানি আলকাদির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে থাকেন তবে আপনাকে মহম্মদ তাতার কথা বলি শুনুন। গৃহযুদ্ধের ধাক্কায় ১৪ বছরের এই ছেলেটার আর পড়াশোনা এগোয়নি। সে আলেপ্পো শহরে একটা চায়ের দোকান চালাত। এক সকালে একজন খদ্দের তাকে ফ্রিতে এককাপ চা খাওয়াতে বললে সে বলে "স্বয়ং নবী এলেও বিনা পয়সায় চা দেবনা।" কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল সশস্ত্র লোক এসে তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং "নবীকে অবমাননা"র অপরাধে অভিযুক্ত করে গুলি করে মারে। এরা সকলেই ছিল ইসলামের স্বঘোষিত রক্ষক নুসরা ফ্রন্টের ক্যাডার এবং আলেপ্পো তখন বিদ্রোহীদেরই দখলে ছিল।[১৫] আপনি যদি মনে করেন এরকম কিছু উগ্রপন্থী থাকলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ অংশও আছে, তাহলে এই ভিডিওটা দেখুন। এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির যোদ্ধা আবু সকর একজন সিরিয়ান সেনার পেট কেটে তার হৃৎপিণ্ড বের করে কামড় দিচ্ছে। পরে বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সে বলে, শত্রুদের সন্ত্রস্ত করতেই তার এই কাজ এবং আমেরিকা শিগগির অস্ত্রশস্ত্র না পাঠালে সে এরকম কাণ্ড আরো করবে। সে এটাও উল্লেখ করতে ভোলেনা যে ঐ সেনা ছিল আলাওইট এবং তাদের মতে আলাওইটরা ঠিকঠাক মুসলমান নয়।[১৬] আল নুসরা এবং ফ্রি সিরিয়ান আর্মি উভয়েই বর্বরতা, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। যুদ্ধবন্দী সেনা, সাংবাদিক, ধর্মযাজক, ইমাম, বুদ্ধিজীবি ও অজস্র সাধারণ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। একথা বলার অর্থ অবশ্য সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে সার্টিফিকেট দেওয়া নয়। তারাও বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে মেরেছে।[২]

কাকাবাবু, আপনি জানেন আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত প্রভাবকে খর্ব করার জন্য আল কায়দা ও তালিবানকে তৈরী করেছিল আমেরিকাই।[১৭] সোভিয়েতের পতন হলে দুপক্ষের স্বার্থের সঙ্ঘাত তীব্র হয়। তারপর এল ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ। কিন্তু ২০১১-র লিবিয়া ও সিরিয়া দেখিয়ে দিল তারা এখনও কমরেড ইন আর্মস। লিবিয়াতেও একই কৌশল, প্রথমে জেহাদিদের হাতে অস্ত্র দিয়ে লেলিয়ে দাও, তারপর সরকার প্রত্যাঘাত করলে "গণতন্ত্র বিপন্ন" ছুতো দেখিয়ে সরাসরি আগ্রাসন চালাও। রাশিয়া-চীন নিষ্ক্রিয় থাকায় লিবিয়ায় তাদের কৌশল সফল হল। ভোটের মুখে গদ্দাফির সঙ্গে তাঁর গোপন আঁতাত ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারকোজি গুপ্তচর পাঠিয়ে খুন করলেন গদ্দাফিকে।[১৮] তবে পাপ যে তার বাপকেও ছাড়েনা তা

আবার প্রমাণ হল যখন "মুক্ত" লিবিয়ায় আল কায়দার জঙ্গিদের হাতে নিজের দপ্তরেই খুন হলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।[১৯]

বিদেশী যোদ্ধাদের সিরিয়ায় ক্রমবর্ধমান তৎপরতা সিরিয়াকে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইরাক, জর্ডন, মিশর এমনকি তাজিকিস্তান, চেচানিয়া থেকেও ওয়াহাবি জঙ্গিরা সিরিয়ার বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে।[২০] পাকিস্তান থেকে তালিবানদের একটা দলও সিরিয়ায় গেছে আসাদ হঠানোর লক্ষ্যে।[২১] আমেরিকা আল নুসরাকে সন্ত্রাসবাদী তালিকাভুক্ত করলেও তাদের বিরুদ্ধে কার্যত কোন ব্যবস্থা তো নেয়ইনি, বরং জর্ডন ও তুরস্কের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে সিআইএ অফিসাররা নুসরা সমেত সব ধরনের বিদ্রোহীদেরই প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিচ্ছে।[২২] সিরিয়া সরকারের অভিযোগ অনুযায়ী অস্ত্রও সরবরাহ করছে। দামাস্কাসে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ফোর্ড বিদ্রোহীদের সংঘটিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কাকাবাবু, আপনি নিশ্চয়ই সিরিয়াকে নিয়ে আমেরিকার মাথাব্যথায় অবাক হচ্ছেন, কারণ সিরিয়া অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে দুর্বল একটা দেশ, তাদের তেলসম্পদও খুব বেশী নয়। আসলে যত ছোটই হোক, লেবাননের গৃহযুদ্ধ থামিয়ে, প্যালেস্তাইনের মুক্তিসংগ্রামে সবরকমভাবে পাশে দাঁড়িয়ে সিরিয়া আরব দুনিয়ায় সমীহ আদায় করে নিয়েছে এবং আমেরিকা-ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। তাছাড়া ইসলামি বিপ্লবের সময় থেকেই ইরান আমেরিকার ঘোরতর শত্রু, বুশ কথিত শয়তানের অক্ষের অন্তর্ভুক্ত। ইজরায়েলের সামরিক শক্তির সঙ্গে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র ইরানেরই আছে। তাই ইরানকে সমঝে দেওয়াও একটা উদ্দেশ্য।[২৩]

এবছরের মে মাস থেকে থেকেই ছবিটা ঘুরতে শুরু করে। এফএসএ জঙ্গিরা লেবাননে শিয়া বসতির ওপর হামলা চালালে হেজবোল্লা তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হয়। হেজবোল্লা ও সরকারি সেনা যৌথ আক্রমণ চালিয়ে আল কোয়াসার শহরটি পুনরুদ্ধার করে।[২৪] শহরটি রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সরকারের কাছে কোয়াসার

যেমন দামাস্কাস ও হোমস শহরের সংযোগ রক্ষা করছে তেমনি বিদ্রোহীদের কাছে এটা ছিল লেবানন হয়ে অস্ত্রপাচারের পথ। এর পর আরো কয়েকটা জায়গায় সাফল্য পায় সরকারি সেনা, এফএসএ ও নুসরা পিছু হঠতে থাকে। তার সঙ্গে বিদ্রোহীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। ফ্রি সিরিয়ান আর্মির কমান্ডার আবু বসির আল লকদানি খুন হলেন আল কায়দা জঙ্গিদের হাতে।[২৫] কুর্দিশ বিদ্রোহীরা প্রথমদিকে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও পরে তারা ঘোষণা করে গৃহযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন কুর্দরা সিরিয়ার ভেতরেই স্বশাসিত প্রদেশ গঠন করবে।[২৬] এটা মেনে নিতে না পেরে নুসরা ও ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড লেভেন্ট কুর্দিশদের ওপর হামলা চালায়।[২৭]

২১শে আগষ্ট দামাস্কাসের উপকণ্ঠে ঘুটা শহরে রাসায়নিক অস্ত্রের আক্রমণে হাজারের বেশী মানুষের মৃত্যু হয়, যাদের মধ্যে বেশীরভাগই শিশু।[২৮] এটা ঘটেছে এমন একটা সময় যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকরা আগের একটা রাসায়নিক হামলার তদন্তে সিরিয়ায় ছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিরিয়া সরকার পর্যবেক্ষকদের ঘুটায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহের অনুমতি দেয়। কাকাবাবু, আপনি শুনেছেন যে এই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল নার্ভ এজেন্ট সারিন গ্যাস। এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে বিদ্রোহীরা এবং আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্সের মত তাদের পৃষ্ঠপোষকরা সিরিয়া সরকারকেই দায়ী করেছে এবং সিরিয়াকে শাস্তি দেবার জন্য সামরিক অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে। কিন্তু আপনি কি এটা শুনেছেন যে গত মে মাসে তুরস্কের আদনান শহরে পুলিস আল নুসরা ফ্রন্টের ১২ জন সদস্যকে ২ কেজি সারিন গ্যাস সহ গ্রেপ্তার করে?[২৯] পরে অবশ্য তুর্কি সরকার এই ঘটনার কথা অস্বীকার করেছিল। আরো একটা মারাত্মক তথ্য উঠে এসেছে মিন্টপ্রেস সংবাদসংস্থার অনুসন্ধানে। ঘুটায় গ্যাসে আক্রান্ত মানুষ, ডাক্তার, বিদ্রোহী ও তাদের পরিবার এবং সাধারণ নাগরিকদের সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে সৌদি আরবের গোয়েন্দা প্রধান বান্দার বিন সুলতান ঐ অস্ত্রগুলো বিদ্রোহীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তবে চোঙাকৃতি গ্যাসবোতলের মত দেখতে ওগুলো কি ধরনের অস্ত্র বা কিভাবে ওগুলো ব্যবহার করতে হয় তা বিদ্রোহীরা জানত না বলে দাবী করেছেন সেদিনের ঘটনায় নিহত এক বিদ্রোহীর বাবা। একটা টানেলে সেগুলোকে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে তারা বিস্ফোরন ঘটিয়ে ফেলে বলে সহযোদ্ধারা জানিয়েছেন।[৩০]

বছরখানেক আগেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারকে লালদাগ ঘোষণা করে বলেছিলেন ঐ লালদাগ অতিক্রম করলেই তাঁর সরকার সরাসরি সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করবে। কাকাবাবু, আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে সিরিয়ার সরকার যখন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করছে, তখন খামোকা রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ মার্কিন আক্রমণকে নেমন্তন্ন করা তাদের পক্ষে চরম আহাম্মকি? আর আমেরিকার ওপর সৌদি আরবের নির্ভরতার কথা মাথায় রাখলে এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে আমেরিকাকে না জানিয়েই সৌদি সুলতান সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র পাঠিয়েছেন। এই সূত্রগুলো কিন্তু সিরিয়াকে ঘিরে একটা মারাত্মক চক্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি এখন সিরিয়াকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। প্রথম থেকেই সিরিয়ার বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য ও মদত দিয়ে চলেছে সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক, ইজরায়েলের মত আঞ্চলিক শক্তি এবং আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের মত সাম্রাজ্যবাদীরা। এই সমস্ত দেশগুলো সিরিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে

বিদ্রোহীদের জোট সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশানকে সিরিয়ার জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। আরব লীগের আমীর, শেখ, সুলতানরা গণভোটে নির্বাচিত আসাদকে স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে সিরিয়াকে বহিষ্কার করেছে। অন্যদিকে সিরিয়ার পাশে আছে ইরান। সোভিয়েত সঙ্গে সিরিয়ার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা বজায় আছে রাশিয়ার সঙ্গেও। তারা প্রথম থেকেই দুপক্ষের আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের ওপর জোর দিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী কোফি আন্নান এবং পরে লাখদার ব্রাহিমি অবশ্য সে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন।

লালদাগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওবামা এবার নতুন উদ্যমে সিরিয়ায় হামলার ছক কষেছেন। আগে দুবার রাশিয়া চীনের ভেটোয় রাষ্ট্রসংঘকে শিখণ্ডী করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবার তাঁর কথায় "পক্ষাঘাতগ্রস্ত" রাষ্ট্রসঙ্ঘকে পাশ কাটিয়েই যা করার করতে চান তিনি। তবে সম্ভবতঃ রাসায়নিক অস্ত্রের ভয়েই সেনা না নামিয়ে আকাশপথে ষাট দিনের "সীমাবদ্ধ" আক্রমণের প্রস্তাব পেশ হয়েছে মার্কিন সেনেটে। কিন্তু এনিয়ে ওবামা কূটনৈতিকভাবে অনেকটাই ব্যাকফুটে। সিরিয়ার সংকটে দেশকে জড়ানোর প্রস্তাব খারিজ করেছে বৃটিশ পার্লামেন্ট। জার্মানী কোনরকম সামরিক অভিযানে যোগ দেবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে। গ্রীস তাদের সামুদ্রিক ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকার করেছে। ভারত স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমোদন ছাড়া কোনরকম সামরিক তৎপরতার বিরোধিতা করেছে। এমনকি আরব লীগ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেতৃত্ব ছাড়া অভিযানে আপত্তি জানিয়েছে। একমাত্র ফ্রান্স যুদ্ধ করতে এক পায়ে খাড়া। যে ফ্রান্সের রক্ষণশীল প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ইরাক

যুদ্ধের কড়া বিরোধিতা করেছিল, সেই ফ্রান্সের স্যোসালিস্ট প্রেসিডেন্ট হোলান্দে এখন আসাদকে সরাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। রাজনীতি বড় বিষম বস্তু কাকাবাবু! হয়ত সিরিয়া একসময় ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল বলে ঐ দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তাদের কর্তব্য বলে ফ্রান্স মনে করে। ওদিকে ভূমধ্যসাগরের মার্কিন নৌবহর সিরিয়ামুখী হতেই চাপ বাড়াতে রাশিয়াও দুটো রণতরী পাঠিয়েছে। ইরান জানিয়ে দিয়েছে হামলা হলে তারা শেষ অবধি সিরিয়ার পাশে থাকবে।

শেষপর্যন্ত কি হবে, আসাদ কি আত্মসমর্পণ করবেন না কি সাদ্দাম-গদ্দাফির মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবেন, সিরিয়া কতটা প্রতিরোধ করতে পারবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের, রাশিয়া-ইরানের ভূমিকা কি হবে তা ভবিষ্যতই বলবে; কিন্তু সিরিয়ার মানুষের জন্য যে এখনও অসীম দুর্গতি অপেক্ষা করছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা দুবছরে এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের অভ্যস্ত করে নিয়েছেন। মার্কিন হুঙ্কারের বিরুদ্ধে এককাট্টা দামাস্কাসবাসী জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা কোন বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নোয়াবেননা, প্রেসিডেন্ট আসাদের পাশেই থাকবেন।[৩১] এমনকি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সমাজকর্মীও বলছেন, "এ দেশের মানুষ বিদেশের সেনাকে দেশের মাটিতে দেখতে চায়না। স্বাধীনতা নিজেরাই রক্ষা করবে দেশের মানুষ।"[৩]

আমি ভাবছিলাম সাবা কাব্বানির কথা। আপনি যখন সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই দেশের কোন মানুষটাকে আমাদের সারাজীবন মনে থাকবে বল তো?" সে একটুও চিন্তা না করে বলল, "সাবা কাব্বানি"। কাব্বানি একজন কুর্দ, ইরাকে বাড়ি, সেখানকার আর্মিতে কাজ করত। সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর একদিকে আমেরিকার দখলদারি, অন্যদিকে জাতিদাঙ্গায় ইরাক ছারখার হয়ে গেল। সব দেশেই যা হয়, যেকোন সমস্যার আঁচে সব থেকে বেশি পোড়ে কাব্বানির মত সংখ্যালঘুরা। একদিন রাত্রে কারা যেন তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। ছেলের মাথায় বোমা পড়ল, বাকিরা ইরাক ছেড়ে পালিয়ে এল সিরিয়ায়। তার আরো এক মেয়েও হারিয়ে গিয়েছিল ইরাক যুদ্ধের সময়। সে বলেছিল, "জানি না, আল্লা আমাদের কপালে আরো কত কঠিন পরীক্ষার কথা লিখে রেখেছেন"। সাবা কাব্বানি এখন কোথায়? সে কি মাটি কামড়ে পড়ে আছে সিরিয়ায়, না ফিরে গেছে তার নিজের দেশ ইরাকে? নাকি আবার পাড়ি জমিয়েছে অন্য কোথাও, পরের পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার জন্য?

তথ্যসূত্র:

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আরবদেশে সন্তু কাকাবাবু, আনন্দ পাবলিশার্স
[২] Facebook page of Syrian Observatoryfor Human Rights
[৩] নিসান আহমাদো, নিঃশ্বাসে বিষ বিশ্বাসে দ্রোহ, এবেলা, ৩০ আগষ্ট, ২০১৩
[৪] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র, পৃথিবীর ইতিহাস, অনুষ্টুপ
[৫] Fertile Crescent, Wikipedia
[৬] History of Syria, Wikipedia
[৭] Robert Fisc, Maaloula, the past has relevance to Syria's tragic present, The Independent, September 3, 2012
[৮] Syria Islamist rebels take control of historic Christian town of Maaloula, CNN, September 8, 2013

[৯] List of heritage sites damaged during Syrian civil war, Wikipedia, Al-Qaeda Takfiris Destroying World's Heritage, Syrianews, May 2, 2013
[১০] Ba'ath Party, Wikipedia
[১১] Syria Profile: A chronology of key events, BBC
[১২] Bashar al-Assad, Wikipedia
[১৩] Timeline of the Syrian civil war, Wikipedia
[১৪] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মিশর রহস্য, আনন্দ পাবলিশার্স
[১৫] Al-Qa'ida Islamists kill Syrian boy, 15, for "insulting the prophet", The Australian, June 11, 2013
[১৬] Paul Wood, Face-to-face with Abu Sakkar, Syria's 'heart-eating cannibal' BBC, July 5, 2013
[১৭] Norm Dixon, How the CIA created Osama bin Laden, Green Left Weekly, September 19, 2001,
Noam Chomsky interviewed by David Barsamian, The United States is a Leading Terrorist State, Monthly Review, vol. 53, no. 6, November, 2001
[১৮] French spy shot dead Gaddafi on Nicolas Sarkozy's order, The Indian Express, October 1, 2012
[১৯] Al-Qaeda indicates responsibility for killing US envoy in Libya, urges more attacks, The Times of Israel, September 15, 2012
[২০] As foreign fighters flood Syria, fears of a new terrorist haven, The Times of India, August 8, 2013
[২১] Pakistan Taliban says its fighters in Syria, Al Jazeera, July 16, 2013
[২২] Al-Nusra leader meets CIA officials, Alalam, August 30, 2013
[২৩] দেবাশিস চক্রবর্ত্তী, কার যুদ্ধ সিরিয়ায়, গণশক্তি, ৩১শে আগষ্ট, ২০১৩,
নাজেস আফরোজ, রাসায়নিক অস্ত্রে হঠাৎ এত আপত্তি!, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
[২৪] Battle of al-Qusayr (2013), Wikipedia
[২৫] Key Free Syria Army rebel 'killed by Islamist group', BBC, July 12, 2013
[২৬] War in Syria inspires Kurdish unity, Al Jazeera, July 27 2013
[২৭] Kurds, Islamists clash in north Syria, at least 12 jihadists killed, The Daily Star Lebanon, August 03, 2013
[২৮] 2013 Ghouta attacks, Wikipedia
[২৯] Turkey finds sarin gas in homes of suspected Syrian Islamists, Strategic Culture Foundation, May 31, 2013
[৩০] Dale Gavlak and Yahya Ababneh, Syrians In Ghouta Claim Saudi-Supplied Rebels Behind Chemical Attack, August 29, 2013
[৩১] নিয়তির হাতে ভবিতব্যকে সঁপেছে দামাস্কাস, বর্তমান, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

বিড়ি মাহাত্ম্য

ম্যাক্সিমাস

নভেম্বর ৮, ২০১২

সদ্য ডাক্তারি পাস করেছি। রেজাল্ট বেরিয়েছে। যা আশা করেছিলাম তার থেকে বেশ একটু ভালই নম্বর পেয়েছি। তার ওপরে আবার একটা সাবজেক্ট এ অনার্স মার্কস। একদম যা তা ব্যাপার!! সোনায় সোহাগা আর কাকে বলে.... নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না....

মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং শুরু হলো। চলবে একবছর ধরে। উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এ পিরীয়ডিক্যালি ঘুরে ঘুরে নিজের অভিজ্ঞতা, স্কিল বাড়ানো... সর্বোপরি রোগীদের সাথে ইন্টার‍্যাকশন করা।

এইরকম চলতে চলতে আমার পালা এলো বক্ষরোগ ডিপার্টমেন্টে (Department of Chest and TB) কাজ করার। তো সেইখানকারই এক ঘটনার কথা বলবো আজ...

দিনটা ছিল আমার ওই ডিপার্টমেন্ট এ কাজের প্রথম দিন। আগের দিনই পুরো রাত অন ডিউটি ছিলাম মেডিসিন বিভাগে... এত পেশেন্ট রাশ ছিলো ওই রাতে যে এক মিনিটও বসতে পারিনি.... শোয়া তো দুরের কথা! তো আমি যে স্যারের সঙ্গে কাজ করবো, তাঁকে বললাম আমার কথা। কিন্তু মুস্কিল হলো সেই দিন আবার তাঁর আউটডোর বিভাগে বসার দিন!! স্যার আমাকে বললেন "তুই চল আউটডোরে... একটু কাজ গুলো বুঝে নে। বুঝতে পারছি তোর অবস্থা.. ঠিক আছে আউটডোরের পরের রাউন্ডে তোকে থাকতে হবে না, আবার রাত্তিরে রাউন্ডে আসিস!" যাইহোক, ঢুলুঢুলু চক্ষে চললাম স্যারের পিছন পিছন, গন্তব্য আউটডোর বিল্ডিং।

শুরু হলো পেশেন্ট দেখা, এমনিতেই আমাদের হাসপাতালে প্রচুর রোগী আসেন, সেদিনও প্রচুর এসেছেন। আমরা ইন্টার্নরা স্যারের কথা মতো কাজ করছি, পেশেন্ট দেখছি, প্রেসক্রিপশন লিখছি। এরকমই চলতে চলতে এক বয়স্ক মানুষ এলেন, নাম... না আসল নামটা উহ্যই থাক, ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম অমল। বয়স এই মুহূর্তে একজ্যাক্টলি মনে পড়ছে না... তবে চল্লিশ-উর্ধ্ব তো বটেই, থাকেন বর্দ্ধমানের কাছেই, বাতাসপুর গ্রামে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন?

উনি বললেন: শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, অল্পেই হাঁপিয়ে যাচ্ছি।

জানা গেলো, কষ্টটা প্রায় বছরখানেকের, গ্রামেই একজনকে (অবশ্যই ডাক্তার নয়) দেখিয়ে কিসব ওষুধ পত্র খেয়েছিলেন, কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয় নি! তাই মেডিক্যাল কলেজে আসা।

ক্লিনিক্যালি যা বোঝা গেলো হার্টের ব্যামো নয়, অতিরিক্ত ধূমপানের জন্য শ্বাসনালী ও শ্বাসযন্ত্র, সোজা কথায় ‘ফুসফুস’ গেছে বিগড়ে, ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘ক্রনিক ব্রংকাইটিস’। যাইহোক, কিছু টেস্ট করতে দেওয়া হলো ওনাকে, বুঝিয়ে বলা হলো যে সিগারেট আর একদম নয়, এরপরও যদি ধূম্র সেবন করা হয় তবে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। কটা ওষুধপত্র প্রেসক্রিপশন এ লিখে দেওয়া হলো। বলে রাখি ওষুধের মধ্যে একটা অত্যাবশ্যকীয় হলো ইনহেলার, এই রকম রোগভোগে এটি এখন অন্যতম প্রয়োজনীয়। অনেকেই এখন এর সাথে পরিচিত, যাঁরা জানেননা তাঁদের জন্য একটি ছবি দিলাম।

যাই হোক, এই ড্রাগ ডেলিভারি যন্তরটাও ওনাকে ব্যবহার করতে বলা হলো, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তাও দেখিয়ে দেওয়া হলো আর বলা হলো সপ্তাহদুয়েক বাদে রিপোর্ট নিয়ে এসে আরেকবার চেক-আপ করিয়ে নিতে।

দু’ সপ্তাহ পরে, আমরা যথারীতি আউটডোরে, পেশেন্ট দেখা চলছে। এমনসময় অমলবাবু এলেন। রিপোর্ট দেখা হলো, সব ঠিকঠাক, মানে যেরকমটি ভাবা হয়েছিল সেরকমই... কিন্তু উনি বললেন ওনার কষ্ট একটুও কমেনি! যাব্বাবা... কি হলো ব্যাপারটা? ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম ওই ইনহেলার ঠিকঠাক নেওয়া হচ্ছে কিনা, দিনে ৪বার করে নেওয়ার কথা, বাকি ওষুধ সব কিনেছেন কিনা (আসলে এখনও ভারতীয় বাজারে ইনহেলারের দাম যথেষ্ট বেশি, অর্থাভাবে অনেকেই হয় ইনহেলার কেনেন না, বা ইনহেলার কিনে, অন্যান্য ওষুধ কিনে উঠতে পারেন না), কিন্তু অমল বাবু বললেন, “না না , সবই কিনেছি বাবু, আপনারা যেরম যেরম করতি বয়েছেন, সেরমই করতেছি, কিন্তু কষ্টটা যে এট্টুও কমলনি।”

এই সেরেছে... কি হলো কেসটা? আমি তো হাবুডুবু খাচ্ছি... কি করবো কি করবো ভাবতে ভাবতে হঠাৎ স্যার বললেন, “ও ইনহেলারটা কি ভাবে নিচ্ছে দেখ তো... ঠিকঠাক হাত আর শ্বাস-এর সিনক্রোনাইজেশান হচ্ছে কিনা দেখ। ওটা ঠিক মতো না হলে যতটা ড্রাগ ভিতরে যাওয়ার দরকার, যেতে পারবে না। দরকার হলে আলাদা করে প্র্যাকটিস করিয়ে দিস।”

তা অমলবাবুকে ইনহেলারটা বের করতে বললাম। উনিও বের করে রাখলেন আমার সামনে টেবিলে.... কিন্তু একি?.. ওটা কি? ওটা কি বেরিয়ে আছে ইনহেলারের উপর থেকে? ইনহেলারের উপরে ড্রাগ ক্যানিস্টারের পাস থেকে বেরিয়ে আছেন দুই বিদ্রোহী বীর?... কি জিনিস জানতে চান নিশ্চয়?

কিছুই না স্রেফ ২টি 'রাজু বিড়ি'!! কি কান্ড!! এ পকেট সে পকেট থেকে আরো কিছু পাওয়া গেলো!

কিন্তু..আগের দিন "ধূমপান করবেন না" এতসব বোঝানো, সব বিফলে গেলো? প্রশ্ন করলাম ওনাকে :

-কি ব্যাপার অমল বাবু? আগেরদিন আপানকে বললাম না যে সিগারেট বন্ধ, ধূমপান করবেন না? বলিনি? শোনেন নি কেন? এরকম করলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে আপনার!

-না বাবু, আপনি তো কইছিলেন সিগারেট খাবো না, কিন্তুক বিড়িও খাওয়া যাবে না সেইটে তো বলেন নাই! তাই আমি ভাবলুম বিড়ি খেলে কুনো অসুবিধে নাই!

-কি মুস্কিল, আপনাকে বললাম যে কোনো রকম ধূমপানই চলবে না... বিড়ি কি ধূমপান নয়?

-না বাবু, বিড়িতে আর কইটুন ধুয়ো হয় গো.. ওটা কিস্যু না, ও আমি মানেজ করি ফেলবো!

-মানে? ম্যানেজ করে ফেলবেন মানে?

-আরে বাবু, একবারেই পুরোটা টানি ফেলবো, কুনো ধুয়াই বাইরে আসবেক না গো!

আমার তো তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা, কিছুতেই বোঝাতে পারিনা যে বিড়িও খাওয়া চলবে না তার!! শেষ পর্যন্ত স্যার একটু ধমক-ধামক দিয়ে বোঝালেন ওনাকে। ওনার বাড়ির লোকজনকেও ডেকে বলা হলো ওনাকে চোখে চোখে রাখতে।

যাইহোক, পরের বার দেখা গেলো, পরিস্থিতি অনেকটাই ইমপ্রুভ করেছে। অমলবাবু সিগারেট-বিড়ির নেশা ছেড়েছেন (অবশ্যই বাড়ির লোকের কড়া নজরদারির ফল).... আগের চাইতে বেশ সুস্থ।

সোনাঝুরি

প্রোজ্জ্বল

মার্চ ১১, ২০১৩

শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে বসে ভোর হতে দেখেছিলাম একদিন। কোনদিনও ভুলবো না সে সকাল। কথায় আমি নেহাতই কাঁচা। তাই বর্ণনা করার চেষ্টাও করবনা। রইল কিছু ছবি, আর রইল কিছু কথা। ছবিগুলি আমার কাছে যে অনুভুতি বয়ে আনে, সেই কথা। কথাগুলো সবই ধার করা।

তোমাকে স্বাগত এই বাগানে। এখানে হরেক জংলা।
এখানে লতার পাশে লতার কলমি বোন।
ফুল নামে ছোট ভাই, আরও ছোট কোলেরটা কুঁড়ি।
ওই গাছ দিগম্বর। মাথার ওপরে মেঘে
যথারীতি চাঁদের মা বুড়ি।
ঘাসে আগাছায় হাঁটি। ভাঙ্গা সিঁড়ি, পানা ভরা পুকুরে পদ্মটি।
এ বাগানে ভোরবেলা, স্বচক্ষে দেখেছি
ঘাস থেকে ফুল তুলছে ডানা-ভাঙ্গা পাথরের পরি।
এখানে আমার সাথে কষ্ট করে থেকে যাও,
তোমাকে দেখিয়ে দেব, অঙ্গীকার করি।

প্রত্যেকেরই মনে মনে বোধ হয় অনেক স্বপ্ন থাকে... যেসব স্বপ্ন কোনদিন নিজের জীবনে সত্যি হয়না... কিন্তু তাদের স্বপ্ন অন্যের মধ্যে সত্যি হয়ে দেখা দেয়... জীবনের ধূলিমলিন গেরুয়া একঘেয়েমিতে হঠাৎ হঠাৎ রোদ-পড়া অভ্রর কুচির মতো সেসব স্বপ্ন ঝিকমিক করে ওঠে...

এই শান্ত নির্লিপ্ত, এখানের সবুজ শালীনতার স্নিগ্ধ আশ্চর্য জীবন, জঙ্গলের যাদু – সব মিলিয়ে নিজের বড় ভালো লাগে... এমনকি বাংলো থেকে না বেরোলেও ভালো লাগে। পুরনো বাংলোর শার্সিভাঙ্গা ঘরের চৌপাইয়ে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায় – কতরকম ফুলের গন্ধ নাকে আসে। বাগানের বড় বড় ডালিয়াগুলোর আড়ালে আড়ালে মৌটুসী পাখিরা দুপুরের রোদে লুকোচুরি খেলে। পাশের সেগুন জঙ্গল থেকে মোষের গলায় কাঠের ঘন্টার গম্ভীর ডুংডুঙ্গানি ভেসে আসে...

রুপকথা আনাচ কানাচ...

শেষ রাত্রের নদীর জলে যখন চিকচিকে মিষ্টি জ্যোৎস্না পড়ে, শেওলায় কূলে তাল দেয়, তখন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ নিয়ে ভুরভুরে কচিগন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে যখন নরম হাতদুটি দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, যেন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, Orion যখন পৃথিবীর গতিতে সমস্ত রাত্রির পরে দূরে পশ্চিম আকাশে ঝুলে পড়ে, সেই রুদ্র প্রচন্ড অথচ না-ধরা-দেওয়া গতির বেগে তুমি আছ, জনহীন মাঠের ধরে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে, তখন মনে হয় তাদের সেই সরল প্রাণের প্রাচুর্য – তার মধ্যে তুমি আছ।

শীতের সন্ধ্যায় আমার তোমার কি কোথাও হারিয়ে যাবার কথা? আমার তোমার কি কোথাও লুকিয়ে থাকার কথা? সময় কি আমাদের স্বপ্ন দেখাবে, নাকি নিয়ে যাবে আরো দূরে? চলো ভাবি এই আশায় একসাথে হাত ধরে.. সেই রোদ জ্বলা মিষ্টি শীতে ভোরে, বিকেলে...

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ, তেমনি করে গাও গো..
আজ যেমন করে চাইছে আকাশ, তেমনি করে চাও গো..

কোন ভালোবাসারই ভবিষ্যৎ নেই। ভালোবাসা কেবল বর্তমানের – যা কেবল অতীতেই পৌছে যায় একদিন। ভালোবাসা একমাত্র ভালোবাসাই সৃষ্টি করতে পারে। এক একটি দুর্লভ মুহূর্ত – এক একটি সুগন্ধ ক্ষয়িষ্ণু ক্ষণ – যা আর কেঁদে কেঁদেও পরে ফিরে পাওয়া যায় না।

হোক কলরব..

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা
সেই হাতে হাত ঠেকা সেই আধো চোখে দেখা
চুপি-চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা।

অপূর্ব সে আলো

থাংকমনি

ফেব্রুয়ারী ১৯, ২০১৩

অভ্যেস হয়ে গেছিল রাত্রি হলেই ওয়ার্ড বুক নিয়ে হাঁ করে লণ্ঠন এর আলো দেখা। নিচের দিকটা দিব্য হলদে। ওপরের দিকটা ধীরে ধীরে কলঙ্ক মাখছে গায়ে। ইতি উতি কিছু পোকা প্রেম নিবেদন করে উল্টে পড়ে আছে। শুধু মশা গুলো কাচের গায়ে বসে না। না বসুক গে, লণ্ঠন এর মাথায় গুড নাইট জলছে আর তাছাড়া আমার "হাত হি কাফি হ্যায়"। হাতের তেলোয় মশা মেরে লণ্ঠন এর কাছে ফেলে রাখতাম শিকার এর গর্বে। সেই সব অলৌকিক রাত গুলোতে একটা ঘোর ঘোর ব্যাপার ছিল। চোখ দুটো আধ বোজা করে রাখলে আলোর পলতেটা ঝাপসা আলোর বল হয়ে যেত। তখনও ডি এস এল আর কাঁধে "বোকে" তোলার পেছন পাকামি আসেনি। অন্য ছবি দেখার ইচ্ছে হলে অগুন্তি অপশন ভিড় করে আস্ত একটা জগত তৈরী করে নিতে পারতাম। লণ্ঠন ছিল সেই জগতের একটা প্রপার প্রপ্স। সে আলোর গন্ধ ছিল একটা। মানে আলোর গন্ধটা হয়ত একটু বেসি কাব্যিক হয়ে গেল... কিন্তু আমার কাছে কেরোসিন আর পলতে পোড়ার সেই আলো আর গন্ধ আলাদা করে এগজিস্ট করে না। ততদিনে আমি কনে দেখা আলো উপমা জেনে গেছি রবি বাবুর দৌলতে। কিন্তু সম্যক জ্ঞান নেই। মনে মনে ধারণা করে নিয়েছিলাম হলুদ রং এর গুঁড়ো গুঁড়ো আলোকে। হ্যারিকেন এর আলো উস্কে দিত সেই বিশ্বাস। নতুন কনে বাড়িতে এসেছে... কোন আলোয় দেখবে মুখ? লম্ফো-র নগ্নতায় একটা যৌন আবেদন আছে আর আছে নতুন শাড়ির পাড়ে আগুন লাগার সম্ভাবনা। দিন এর কড়াকড়ি তে আমার কনে আসে না। কেউ বলেনি তবু মনে মনে জেনে গেছিলাম সন্ধ্যে বেলার হ্যারিকেন এর আলোই কনে দেখা আলো। তার সারা গায়ে বচ্ছর ভর "গায়ে হলুদ" লেগে আছে। তার সার্সি তে মাথা কুটে মরছে নায়ক পোকা, ভিলেন পোকা, আর পুটকে পুটকে সাইড রোল এর পোকা গুলো।

এই অভ্যস্ত চোখে আমি দেখতাম নিবিড় হয়ে আসা ঘুমেরা শব্দেরা হলুদ আলোয় ঝিকমিক করছে। সেই সব আলোদের আর দেখি না। যেমনটা দেখতাম পুরুলিয়া-র ইস্কুল বাড়ির ছাদ থেকে দোলগোবিন্দ মাহাতোর বাড়িতে জ্বলছে ষাট পাওয়ার এর। আমার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত নিম্নবিত্তের ম্যাক্সিমাম উদ্ভাসন। তার সাথে ছিল আমার পলাতক পিরিত। স্টাডি আওয়ার এ টুক করে ছাদ থেকে ঘুরে আসার সময় দেখতে পেতাম তাকিয়ে আছে বিন্দু বিন্দু বাল্ব। নিরাসক্ত অবয়বহীন... নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না সেই আলোয়। সে আলো বড় মগ্ন থাকে আমার পরিচয়ে। ধান খেত এর পাশ দিয়ে চলে গেছে ট্রেন লাইন। তার ওপর দিয়ে চলে যায় রূপসী বাংলা ট্রেন। রাত্রি বেলা আওয়াজ হয় আমাদের হোস্টেল এ। কাব্যি করছি না। মাইরি বলছি। সে ধানক্ষেত, ট্রেন আলো.... সবই আছে। সারদা সদন এর ছাদে উঠলেই দেখা যায়। বিশ্বাস করুন, সময় থেমে যাবে। সে হাওয়া যখন কানের লতি ছুয়ে হাস্নুহানার চিঠি দিয়ে যায়। বলে দিতে হয় না.... মানুষ এমনিই আনমনা হয়। সে আমার বড় ছোটবেলার কথা কিন্তু সেই হাওয়া মানুষকে আরো পিছু টানে। সেই হাওয়ায় মানুষ

জাতিস্মর হয়। পাড়ার লোকে যাকে ভাতারখাগী বলে গালাগাল দিত... সে যবে মারা গেল সেও নাকি নিশি ডাকত এই ঔজ্জল্যে। পাড়ার লোকে স্বীকার করে নিল ভাতারখাগী-র নোলা বেড়েছে। আমি দেখতাম দুলুর বাড়ি থেকে সেই ষাট পাওয়ার এর বাল্ব আমার বর্তমানকে ভিজিয়ে নিছে সেপিয়া কালার এ। আর খেলার মাঠে শরৎকালে ঠিক দুক্কুরে সোনা রোদ উঠত। আমাদের বয়সন্ধি কালের ব্রণ গুলোকে অব্দি কি অপূর্ব দেখাত সেই আলোয়। রোববার করে ছেলেদের গার্জেন আসত। সাথে আসত তাদের বোন্ দিদি। সেই সেদিন যেদিন আমার বন্ধুর বোন্ আমায় প্রথম ভাই ফোটা দিল, সেদিন-ও এমনি রোদ ছিল। কি আশ্চর্য তার পরের বছর চিলতে হাসি বিনিময়। এবং প্রেম। কড়ে আঙ্গুলের চন্দন এর থেকে অন্য ঘ্রাণ ভেসে আসে, শরত এর রোদ ঝলমল করে চোখ মটকায়।

আজব গুজবের রঙিন কথা

অর্ক

ফেব্রুয়ারী ১২, ২০১৩

২১ সেপ্টেমর ১৯৯৫।

এই দিনটির কথা আশা করি মনে আছে? কেননা এই দিনটিতেই এক বিশেষ ঘটনার সারা ভারত প্রায় তোলপাড় হয়েছিল। কী সেই ঘটনা? গণেশের মূর্তি নাকি দুধ খাচ্ছেন। দিল্লি থেকে প্রচার হল এই গুজবের আর আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল ভারতের কোনায় কোনায়। প্রত্যেকটা শহর কি গ্রাম-গঞ্জ যেখানেই গণেশের মূর্তিওয়ালা মন্দির আছে সেখানেই কাতারে কাতারে লোক ছুটল "গণেশের দুধ খাওয়া" দেখতে।

ঘটি,বাটি,কাঁসার গেলাস, গামলা যে যাতে পেরেছে দুধ নিয়ে আর হাতে চামচ নিয়ে লাইন দিয়েছে মন্দিরে মন্দিরে, যেন ৭১-র লঙ্গরখানার দৃশ্য। দুধ বাড়ির থেকে না আনতে পারলেও ক্ষতি নেই মন্দিরের সামনে দুধওয়ালাদের রমরমা.... সব গোয়ালারা দুধ ডেলিভারি বন্ধ করে মন্দিরে মন্দিরে বালতি, কলসি নিয়ে বসে গেছেন চড়া দামে দুধ বিক্রিতে।

মন্দির প্রতিনিধিরাও উৎসাহী প্রণামীর থালা এগিয়ে দিয়ে, ঝনঝনিয়ে তাতে খুচরো পয়সা থেকে মাওড়া ব্যবসায়ী-গিন্নিদের বড় নোট পড়ে চলেছে। ভেতরে গণেশের মূর্তি, শুণ্ড উচিয়ে বসে তিনি, চামচে করে দুধ নিয়ে মুখে থুড়ি শুঁড়ে ধরতে হবে... চামচে হেলিয়ে ধরলেই ব্যাস– মিরাক্যল অব দি সেঞ্চুরি । পাথরের মূর্তি দুধ খেয়ে নিল।

শেষে সামাল দিতে বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা ময়দানে নামলেন। মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে হাতে কলমে দেখালেন শুধু গণেশ নয়.... পাথরের কি কাঠের লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী মায় দেবতা ভিনে কাগা-বগার মূর্তিও দুধ খায়। দেখালেন চামচে করে মুখে দুধ ছোয়ানো মাত্র মূর্তিটি দুধ টেনে নিচ্ছে এবং মূর্তির গা বেয়ে দুধ নিচে পড়ে যাচ্ছে..... (ফুলের মালার আতিশয্যে যা লক্ষ্য করা মুশকিল ছিল আসল কেসে)। সকলকে বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা বোঝালেন সারফেস টেনশন এবং সান্দ্রতা বলে তরলের দুটি ধর্ম আছে। এর প্রভাবে পাথর, ইট কি কাঠে দুধ স্পর্শ করলে দেখা যাবে সেগুলি যেন দুধ টানছে। এ ব্যাপার যে শুধু দুধের জন্য প্রযোজ্য তা নয়.... জল, কেরোসিনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। যা হোক এতে পাবলিক কতটা বুঝল কে জানে.... এই বোঝানোর জন্যই হোক বা গুজবের ভ্যালিডিটি বা আকর্ষণ কমে যাবার জন্যেই হোক এই ঘটনাটা ধীরে ধীরে থেমে আসে।

এবার আসি আরেকটি গুজবে যেটি আমাদের শিলিগুড়ি আর আশেপাশের অঞ্চলে দাবানলের মত ছড়িয়ে গিয়েছিল। গুজবটি অত্যন্ত হাস্যকর। এটি ঘটে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ।

সে সময় উত্তরবঙ্গে পানের দোকানে হঠাৎ চুনের দরকার বেড়ে যায়.. কেননা গুজব ছড়ায় পুরুষদের গোপনাঙ্গ নাকি ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে (যাব্বাবা ঢুকে যাবেই বা কোথায় কে জানে)। আর নারীদের স্তন ছোট হয়ে যাচ্ছে। খবরে প্রকাশ মারাত্মক এই গুজবটির প্রচার নাকি ফালাকাটা থেকে ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গে সমস্ত জায়গায়। আর ঐ চুনের ব্যাপারটা, ঐটেই নিদান... কানের পাতার তলায় চুন লাগিয়ে রাখলে নাকি এটা ঠেকানো যায়।

যা হোক, সেই সময় খবরের কাগজে প্রকাশ হওয়া একটি প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি যে এই গুজবটি নতুন কিছু নয়। কয়েক হাজার বছর আগেও সমাজে এই ধরনের কথা জানা ছিল। এসব কথাবার্তা এক ধরণের মানসিক রোগীর খেদোক্তি। ওরা রোগটির নাম দিয়েছিল — "কোরো"।

রোগটি প্রথম ধরা পড়ে চীনে, তিনশো খ্রীষ্টপূর্বে। ভারতের আসামে এই রোগ পরিচিত– "ঝিনঝিনিয়া বিমারী" নামে। ১৮৭৪ সালে ডিকশনারি অফ বিজনেস ল্যাংগুয়েজে "কোরো" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ কুঞ্চিত হওয়া। বিজ্ঞানীরা এর ব্যখ্যা দিয়েছেন এভাবে– "Belief in fatally retracting genitals or a belief in genital theft is usually known as Koro."

কোরো রোগের লক্ষণও তাই বেশ চমকপ্রদ। পুরুষেরা নিজেদের লিঙ্গ ধরে রাখে পাছে কেউ চুরি না করতে পারে। কেউ কেউ চুপচাপ থেকে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। বলেন লিঙ্গ ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। অনেকে আবার প্রস্রাব না হওয়ার কথা বলেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে স্তন ধরে টানতে দেখা যায়।

১৯৬৭ সালে সিঙ্গাপুরের এক মেডিকেল জার্নালে জানা যায় সেখানকার হাসপাতালগুলো ভরে গেছে কোরো রোগীতে। তাদের ধারণা এরা এমন শূকরের মাংস খেয়েছেন যার লিঙ্গ শুকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছিল। তাই তাদেরও লিঙ্গ ছোট হয়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে।

কোরো রোগীরা হলেন মনোরোগী। নানা কারণে হীনম্মন্যতা থেকে জন্ম নেয় কোরো। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই রোগের কথা চারিদিকে আগুনের মত ছড়ায়। সমাজে দেখা দেয় গণহিস্টিরিয়া। তাই যুগে যুগে এই রোগটি মাঝে মাঝে নিজের গুজবকে ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

যা হোক উত্তরবঙ্গে বেশ খানিকটা চুন ধ্বংস করে কোরো রোগের গুজবটি ছয়মাসের মধ্যে বিদায় নেয়। এবং অশিক্ষিত পাবলিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে... তাদের মালপত্র সব ঠিক রেখে রোগটি বিদায় নিয়েছে।

আসুন কষ্ট-কল্পনা করি

স্পন্দন চকোত্তি

জুলাই ৩, ২০১৩

বন্ধুগণ, পাঠ্যবই, খবরের কাগজ, এস এম এস-ঘেঁষে মেশ , লিপ কিস-কিস মিস , ভেজ-নন ভেজ শায়রী , লুকিয়ে লেখা সেন্টিমেন্টাল ডায়েরী – এসব অনেক হয়েছে। মেথড মানা বই-পুঁথির পাহাড়, কাশ্যপ মুনির অফ-বিট স্ক্রিপ্ট বা পরমপিতার গত বাঁধা চোতা মেনে চলা আম জীবন-ভাম জীবনের আগাছা, পাথর হটিয়ে আসুন কিছু আজগুবি কল্পনা করে ফেলি। শুধু শুরুর আগে একটা ছোট্ট শর্ত আছে - বেদো জীবনের এঁদো পুকুর পোস্কার করার সময় আমরা কোনও লজিকের ধার ধারবো না। গল্প এগোলে একবারটির জন্যেও ভাব্বেন না যে কি হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এটা না হয়ে ওটা হলে কেমন হতো - ভেবে নিন যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে। আর দৈবাৎক্রমে আপনি ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে থাকলে মেনে নিন, যা হয় মঙ্গলের জন্যই হয়।

এটুকু সতর্কীকরণের পরে আর বেশী দেরি না করে মূল দৃশ্যে ঢুকে পড়াই উচিত কম্ম হবে।

লাইটস ..... ক্যামেরা রোলিং ..... অ্যাকশন!

দৃশ্য ১ : মনের চোখ দিয়ে দেখতে থাকুন – একপাল মৌমাছি উড়ে আসছে আকাশ অন্ধকার করে। বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে গিয়ে শোনা যাচ্ছে শুধুই মক্ষিকুলের বোঁ বোঁ শব্দ। ওদের কারও পায়ের আগায় লেগে আছে আগুন রঙের পুষ্পরেণু, কেউ বা পায়ে করে উড়িয়ে আনছে তরতাজা শিশিরবিন্দু। জনপদের সবথেকে সাজানো-গোছানো, সব চাইতে বড় বাড়িটার ওপরে এসে থেমে গেল ওরা সবাই; বাড়ির ওপরেই ঝেড়ে ফেললো পদরেণু, বারিবিন্দু।

মুহূর্তেই আপনি জানলেন – ওরা পায়ে করে নিয়ে এসেছিল আগুনের অণু, বিন্দু বিন্দু জ্বালানি। সমষ্টির প্রচেষ্টায় এক প্রকাণ্ড দাবাগ্নি আত্মপ্রকাশ করলো। জ্বলন্ত বাড়িটি ছেড়ে তখন কাতারে কাতারে লোক আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে যাচ্ছে, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। ধোঁয়ার সমুদ্রে ঢেকে রয়েছে চারদিক। মানুষের গোঙানি ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে শেষে মধুমক্ষির বোঁ বোঁ শব্দের মতো শোনালো। মানুষের পাল অনেক অনেক দূরে পালিয়ে যেতে নেমে এলো এক তুরীয় শান্তি, অপূর্ব নিস্তব্ধতা। ভিড় ছেড়ে খানিকটা উঁচুতে উড়ে গিয়ে এই প্রথম গর্বভরে কথা বললেন রানী মৌমাছি; বললেন – "মনে পড়ে, চাকে ধুঁয়ো দিয়ে মধু ছিনিয়ে নেবার দিনগুলো?"

—— জাম্প কাট টু নেক্সট —-

দৃশ্য ২ : এবারে আরেকটি ভিন্ন দৃশ্যে কল্পনা করুন, যে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এক সুবিশাল স্বর্ণখনির সামনে। আপনি জানেন যে এই খনিটি এক অতি পরিচিত উর্বর ধাতুভাণ্ডার। আর আমি জানি যে, আপনি রোজ একটি করে সোনার ডিম প্রসব করা হাঁসের গপ্পোটি অতি উত্তম ভাবে আত্মস্থ করেছেন।

যাই হোক, মনের ভেতর ঠোঁট চেটে ছটফট করে চলা লুটেপুটে খাবার বাড়তি লোভকে সংযত করে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাল তাল সোনার স্বপ্নে বিভোর।

এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ আপনার মনে হল যেন আপনি অস্বাভাবিক হাল্কা বোধ করছেন। এবারে আপনি সামনের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন যে, সোনার খাদানের তলদেশের অমোঘ হাতছানি টেনে নিয়ে চলেছে এক নাম না জানা ভাগ্যান্বেষীকে। তার মাটি মাখা জামার পিঠে সুতো দিয়ে সুন্দর হরফে সেলাই করে লেখা আছে – "দুঃসাহসী"। সে এগিয়ে গিয়ে খনির গভীরে নামলো। বহুক্ষণ ধরে আপনি শুনতে পেলেন পাথরের সাথে সংগ্রামের শব্দ; ধাতু ও পাথরের বাদানুবাদ। হঠাৎই আপনি শুনলেন খাদান গহ্বরে তরল প্রবেশের শব্দ। ভূগর্ভের জলস্তরে আঘাত লেগেছে ভেবে আপনি ছুটে গেলেন এবং দেখলেন তার চাইতে বহুগুণ বেশি ভয়াবহ, সাঙ্ঘাতিক এক দৃশ্য। পরিমিতি বোধ হারিয়ে ফেলে অতি গভীরে গিয়ে লাভা খুঁড়ে তুলে এনেছে সেই দুঃসাহসী মানব। আপনি চিৎকার করে তাকে নিরস্ত করতে চাইলেন, কিন্তু পারলেননা। এমনকি নিজের কান অব্ধিও পৌঁছল না আপনার সেই আর্তি।

ক্রমে দেখলেন যে ক্ষুধার্ত, তপ্ত লাভা গিলে নিচ্ছে দুর্দম স্পর্ধাময় শরীরটাকে। প্রবল আর্তনাদ করে মানুষটি যখন সাহায্যের শেষ আশায় ক্ষণিকের জন্য ওপরের দিকে তাকাল, হাড় হিম করা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আপনি দেখলেন যে খনির ভিতর মরতে বসা মানুষটি আপনি নিজেই। সেই দ্বিপদ অবিকল আপনারই মতো দেখতে। যতক্ষণে আপনি নিজেকে রক্তবীজের বংশধর ইত্যাদি ভেবে বিহ্বল, ততক্ষণে খনির মানুষটির গায়ের শার্ট গলে গিয়েছে। "দুঃসাহসী" লেখাটিকে আত্মসাৎ করে ফেলেছে ম্যাগমা। জান্তব আর্তনাদ করে দেহটা পুরোপুরি অগ্নিজঠরে বিলীন হবার ঠিক আগে আপনি দেখতে পেলেন, শার্টের তলায় লুকনো চামড়ার ওপরে আঁকা চির অদৃশ্য, চিরন্তন উল্কি তাপ পেয়ে প্রকট হয়েছে, লেখা আছে – "অপদার্থ মহালোভী"। এরপরে শাস্তিদান শেষে আদালত মুলতুবি হয়ে গেল, মেসেজ দিয়ে ফিরে গেল ম্যাগমা, কিসসু না বুঝতে পেরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ফিরে এলাম আমি-আপনি।

বারেবারে ভুলে যাই, বারেবারে ভুলে যাই

মুক্তবিহঙ্গ

ডিসেম্বর ১, ২০১২

রাত ১ বেজে ৩৫ মিনিট। পুরো কোলকাতা নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নৈশ-প্রহরীর বাঁশির আওয়াজ। ওঘরে আমার রুমমেট ঘুমের মধ্যে মৃদু নাসিকা গর্জন করছে। এসবের মধ্যেই হঠাৎ ইচ্ছে হল কিছু লেখার।

দিন যায় দিন আসে। রোজই নতুন নতুন অনেক ঘটনা দেখি। কিছু কিছু মনে থাকে আর বেশীরভাগই ভুলে যাই। যত বড় হচ্ছি তত ভুলে যাওয়ার পরিমাণটা বাড়ছে। ছোটবেলায় কিন্তু এরকম ছিলনা। তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসও ঠিক মনে থাকতো। যতই বড় হচ্ছি ততই স্বার্থপর আর ভুলো-মনা হয়ে উঠছি যেন। নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। অথচ ছোটবেলায় যখন কোনো মহাপুরুষের জীবনী পড়তাম অথবা কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগের কথা শুনতাম তখন যেন নিজের অজান্তেই দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য কিছু করার কথা ভাবতাম। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। সময় এগিয়েছে, দেশ এগিয়েছে, আমিও অনেকটাই বড় হয়েছি। আজ স্বাধীন ভাবে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারি আগের থেকে অনেক বেশী। নিজের কাছে করা ছোটবেলার সেই প্রতিজ্ঞাগুলো আজ ভুলতে বসেছি। অবাক হয়ে ভাবি যে স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পন্ন একজন ছেলের সমাজের প্রতি কৃতকর্মের মান শূন্য। শুধুমাত্র ভোটদান ছাড়া আজ পর্যন্ত কিছুই করিনি আমি। সেই ভোটদানের ফলে সাধারণ গরীব লোকেদের ঠিক কি উন্নতি হয়েছে তা আমার চিন্তাজগতের বাইরে। ছোটবেলায় মানুষের যেরকম দুর্দশা দেখে এসেছি এখনো তাই দেখছি। শুধুমাত্র বাইরের জগতের পরিবর্তন হয়েছে। ঝাঁ চকচকে কিছু শপিং মল, রাস্তার উপর কিছু বিদেশী কোম্পানির মোটরগাড়ি আর লোকের হাতে হাতে হরেকরকমের ফোন। কিছু করতে চেয়েও পারছি না । রাস্তার গরীব কোনও ছেলে বা মেয়েকে কয়েকটা টাকা দিয়ে অথবা কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে কিছু সাহায্য কতটাই বা সাহায্য করবে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো কে?

নিজের স্মৃতি থেকে কিছু কিছু ঘটনা তুলে ধরছি -

ঘটনা ১ – উত্তরবঙ্গের একটি অখ্যাত গ্রাম। গ্রামের লোক ইলেকট্রিকের মুখ তখনো দেখেনি। গ্রামের মধ্যে একটি বাড়ী – পাটকাঠির বেড়া, ছনের ছাউনি, ২ টো ঘর। বাড়ীর উঠোনে ৪ টি ছোট ছেলে মেয়ে একটি বাটি থেকে হাপুস-হুপুস করে পান্তাভাত খাচ্ছে। কারণ তারা জানে এইবেলাই তাদের দিনের একমাত্র খাওয়া এরপর সারা দিনে কিছু নাও জুটতে পারে।

ঘটনা ২ – দুজন বাচ্চা ছেলে হাতে প্লাস্টিক নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। অনুসন্ধিৎসা-বশত আমি ওদের ডেকে প্লাস্টিকের ভেতর কি বই আছে দেখার চেষ্টা করছি। দেখি শুধু একটা থালা আর জলের বোতল। বই নেই কেন কারণ

জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পেলাম ওরা স্কুলে শুধু মিড ডে মিল খেতেই যায়। তারপর বাড়ীতে ফিরে আবার মাঠে কাজে যেতে হয়। ভালো লাগলো এটা ভেবে যে একবেলা পেট-পুরে খেতে পারছে অন্তত ছেলেগুলো।

ঘটনা ৩ – অনেক অভাব অনটন সত্ত্বেও ভালোভাবে এইচ এস পাশ করে ছেলেটি ভর্তি হল শহরের ভালো একটি কলেজে, গ্রাজুয়েশনের পর ইচ্ছে ছিল মাষ্টার ডিগ্রী করার। কিন্তু অপ্রতুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা। তাই মোটামুটি রেজাল্ট থাকা সত্ত্বেও ছেলেটিকে ইচ্ছা পূরণের জন্য যেতে হল ভিনরাজ্যে। ছেলেটির একবারের যাতায়াতের একটা নমুনা দেওয়া যাক বাড়ী থেকে ১ ক্রোশ হেঁটে বা সাইকেলে নদী। নৌকায় নদী পার হয়ে আরো কিছুটা দূর হেঁটে ট্রেকার স্ট্যান্ড। খুব কম সংখ্যক ট্রেকার চলে তাই অনিশ্চিত অপেক্ষা। এরপর ট্রেকারে চেপে ৩০ মিনিট। তারপর বাসে চেপে ১ ঘণ্টা ও আরেকটি বাস-স্ট্যান্ড। সেখান থেকে আবার বাসে চেপে ১ ঘণ্টা। এরপর অটোতে চেপে রেলস্টেশন। তারপর ট্রেনে চেপে গন্তব্যস্থল। এতো কষ্ট করেও ছেলেটি নিজের ইচ্ছাপূরণ করতে পারেনি। পিতামাতার অসুস্থতার কারণে অথবা আর্থিক দৈন্যের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এখন জমিতে চাষ করা ও চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হল তার দৈনন্দিন রোজনামচা।

ঘটনা ৪ – ট্রেন চলছে খুব জোরে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের দেশের কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাদামের খোসা, ঝালমুড়ির প্যাকেট, চায়ের কাপ যেখানে সেখানে ফেলে নোংরা করে চলেছে ট্রেনের কামরা। হঠাৎ একটি বাচ্চা ছেলের আগমন, পরনে নোংরা প্যান্ট, হাতে একটি ঝাঁটা। নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করে পরিষ্কার করে ফেলল কামরাটি। ইতিমধ্যে একটি বৃহন্নলার আগমন। নিজেদের মানসম্মান বাঁচাতে লোকজন তখন যা পারছে দিয়ে দিচ্ছে মানিব্যাগ থেকে। এরপর যখন বাচ্চা ছেলেটি এসে কিছু সাহায্য চাইল তখন লোকগুলো এমন ভাব দেখালো যেন বাচ্চাটা পরিষ্কার করে অন্যায় কিছু করে ফেলেছে।

ঘটনা ৫ – রাত ৩ টে। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের সামনের রাস্তা। ছেলেরা খিদে মেটাতে বিস্কুট, ডিম, গজা খাচ্ছে ইচ্ছেমত। হয়তো খেয়েছিল ১০০ টাকার, ফেরার সময় দামটা দিল ৮৫ টাকা। অতো ছেলের ভিড়ের মধ্যে দোকানিও বুঝে উঠতে পারেনি কে কি নিয়েছে। তাই ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। এটা হল পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত ভালো শিক্ষিত ছাত্রদের একটা রূপ।

ঘটনা ৬ – কোলকাতার একটি জনবহুল রাস্তা। আমি আর আমার বন্ধু আইসক্রিমের দোকানের সামনে আইসক্রিম কিনবো বলে দাঁড়িয়েছি। সেইসময় একটা বাচ্চা ছেলে এসে সাহায্য চাইছিল। আমি পকেট থেকে টাকা বের করবো কিনা ভাবছি, দেখি আমার বন্ধু একটা আইসক্রিম কিনে বাচ্চাটার হাতে তুলে দিয়েছে। বাচ্চাটার চোখের সেই দৃষ্টি আমার মনকে যে আনন্দ দিয়েছিল তা কোনোদিন ভুলবো না। আর আমার সেই মহানুভব বন্ধুকেও যতদিন বাঁচবো ততদিন মনে রাখবো... যে আমায় সেদিন এক নতুন পথ দেখিয়েছিল।

অনেক ঘটনাই বলে ফেললাম। সব ঘটনাই সত্যি। এছাড়াও অনেক ঘটনা আছে যা আমার মনে পড়ছে না। যা নিজে ভাবি সেগুলো এই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে বোঝাতে চাইলাম। জানি না পারলাম কি না। তবুও স্পষ্ট করে

বলে দিতে হয়না সমাজের এই অবস্থার জন্য দায়ী কে। আমি জানি আমি দায়ী। আমি জানি তুমিও দায়ী ঠিক আমার মতোই।

মুখে আমরা সাম্যবাদের কথা বলি আর সুযোগ পেলেই নিজেদের আখের গোছাবার চেষ্টা করি। সকালে বিকেলে চায়ের দোকানে বসে সমাজের দুর্দশা সম্পর্কে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে খুব ভালোবাসি। ফেসবুকে সমাজের বিভিন্ন জিনিসের সুফল অথবা কুফল সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করি আর জ্ঞান জাহির করি। আমরাই পত্র পত্রিকায় বেশ রক্ত গরম করা প্রবন্ধ লিখি। আমরাই রাজনীতির নামে বিপক্ষের মানুষের উপর হামলা করি। আমরাই সেই স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধিজী, ক্ষুদিরাম, সুভাষচন্দ্র বসু। আমরাই সেই শিক্ষিত ছাত্রসমাজের অংশ যে ছাত্রসমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কর্তব্য, দ্বায়িত্ব, লক্ষ্য, মানবিকতা, প্রতিজ্ঞা – বারেবারে ভুলে যাই, বারেবারে ভুলে যাই।

পয়লা মে – এক অজানা কাহিনী

ঘনাদা

মে ১, ২০১৩

আমরা সবাই জানি, এখন থেকে ১২৭ বৎসর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার অধিকার কায়েম করতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তারই রক্তাক্ত পরিণতি ঘটে পুলিশের গুলিতে, ১লা মে ১৮৮৬ সালে। রক্তাক্ত আত্মত্যাগের ভেতর দিয়েই তারা অর্জন করে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমদানের অধিকার। এই আত্মত্যাগকে চিরস্মরণীয় ও মহিমান্বিত করার লক্ষ্যে 'বিশ্ব শ্রম দিবস' পালনের রেওয়াজ চালু হয় ১৮৯০ সাল থেকে। এটাও জানি, ১৮৫৪ সালের ১৫ অগাস্ট হাওড়া ও হুগলীর মধ্যে চলেছিল প্রথম ট্রেনটি। সকাল সাড়ে আটটায় হাওড়া স্টেশন ছেড়ে ৯১ মিনিটে হুগলী পৌঁছেছিল ট্রেনটি। কিন্তু, এটা জানি কি, শ্রমিকের অধিকার অর্জনের লড়াই শুরু হয়েছিল এই পশ্চিম বঙ্গের হাওড়ায়? সেটা ১৮৫২ সাল! পুরাদস্তর কাজ চলছে রেল লাইন পাতার। কোম্পানি খাটিয়ে নিচ্ছে শ্রমিকদের অমানুষিক ভাবে। কোনো সময় নেই কাজ করার। বিশ্রাম নামে মাত্র। খাবার অপর্যাপ্ত। অসুস্থ হয়ে পড়লেন অনেক শ্রমিক। অবস্থা দেখে বিদ্রোহ করলেন এদের সুপারভাইজার গণেশ ভট্টাচার্য। অমানুষিক অত্যাচার নামিয়ে আনলো কোম্পানি। তবু অদম্য গণেশ ভট্টাচার্য। অবস্থা বেগতিক দেখে, গুলি চালিয়ে হত্যা করল ৫ জন শ্রমিককে, "চার্লস" (পুরো নাম পাওয়া যায় নি) নামের এক ইংরেজ। তাদের রক্তমাখা মেরজাই তুলে ধরে গণেশ ভট্টাচার্য এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেষে, অবস্থা বেগতিক দেখে, ইংরেজরা কিছুটা নমনীয় হয়। অধিকার আদায়ের প্রথম শহীদ এই পাঁচ জন। এদের নাম নেই ইতিহাসে। গণেশ ভট্টাচার্যের নামও নেই। সেই দিনটিও ছিল পয়লা মে, ১৮৫২। চোদ্দ বছর পর শিকাগোর ঘটনা ইতিহাসে আছে, কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টিকারী এরা এখনও অজ্ঞাত এবং অবহেলিত। আজকের দিনে, লাল সেলাম এই শহীদের প্রতিও।

সূত্র: ছোট্ট একটা চটি বই নাম: অজানা শহীদ। প্রকাশকাল, যতদূর মনে পড়ছে ১৯৬২ সাল। বইটা আমার কাছেও নেই। পড়েছিলাম, ১৯৭২ সালে। বইটা তাড়াহুড়োতে ফেরত দিতে হয়েছিল ইতিহাসটা পড়েই। পরে অনেক খুঁজেছি, কোথাও পাই নি। স্মৃতি থেকে লিখলাম, এই অজানা ঘটনা। তথ্য সব সঠিক, তবে তারিখটা পয়লা মে, এটা আমি নিশ্চিত।

হরিহরেশ্বর –দিব্যাগড়

সন্ধ্যাতারা

মার্চ ৯, ২০১৩

হঠাৎ-ই দিন তিনেকের একটা মিষ্টি ছুটি পাওয়া গেল সেবার। এমনিতে সপ্তাহান্তগুলো সংসারের জমে থাকা জট ছাড়াতেই কেটে যায়; আমার আর আমার কর্তার ছুটিও কিছু আমাদের দুজনের মত হাত ধরাধরি করে চলে না, তাই হুট করে বেড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য তেমন একটা ঘটে ওঠে না। যাই হক, সে বারের 'মিষ্টি' ছুটিটাতে দুজনের মনটাই সমুদ্দুর-এর বায়না করাতে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম; গন্তব্য হরিহরেশ্বর –দিব্যাগড়। পুণে থেকে দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। সাধারণতঃ লোকে গাড়ি নিয়েই যায়, তবে আমাদের আবার ট্যাঁকের জোর একটু কম হওয়ায় আমরা জন-পরিবহণ বেশি পছন্দ করি। যথারীতি এবারেও মহারাষ্ট্র সরকারের বাস-এ চেপে রওয়ানা দিলাম শ্রীবর্ধন-এর পথে। শ্রীবর্ধন হরিহরেশ্বরের সবথেকে কাছের মফস্বল শহর। দুপুর বেলা ২-১৫ র বাস। দেখতে দেখতে বাস ভরে উঠল নানা রঙের, নানা আকৃতির মানুষে, আর আমাদের ব্যাগ ভরে উঠল বড়াপাও, হাওয়াই মিঠাই, লজেন্স, চিকির নানা রঙের নানা আকৃতির প্যাকেটে। শহর ছেড়ে হাইওয়ে-তে উঠতেই বাস চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। তামহিনি হ্রদের ধারে প্রথম বিরতি। বাস থেকে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করলাম হ্রদের ধারে, বেশ সুন্দর দৃশ্য; পাহাড়ের কোলে শান্ত নীল জল, একটু ঠান্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। ২০ মিনিটের বিরতিতে পাশের ধাবার খাদ্যভারাক্রান্ত শোকেসটিকে দেখে আমার আবার একটু শোকেসটির ভার আলগা করার ঝোঁক চাপল। ধাবার 'পাও-ভাজি' আর 'মিশেল পাও' এর সদগতি করতে না করতেই বেরসিক চালকের প্যাঁ প্যাঁ হর্ন। অগত্যা আমার সাথে 'পাও-ভাজিও'।

বিকেল ৫-৩০ নাগাদ বাস পৌঁছল মানগাঁও । আর মাত্র ৪৫ কিমি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছব নিশ্চয়। ঘন্টা খানেক বাদে পৌঁছলাম অবিশ্যি, তবে শ্রীবর্ধনের ধারে কাছে নয়, এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে বাসে উঠল প্রচুর প্রচুর লোক। খাড়াই পথে বাস উঠছে, ঠিকমত বসে থাকাই দায়, সেখানে অত লোক দিব্যি গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। রোজ ঘন্টা দেড়েক করে বাসে লড়াই করে লবনহ্রদ থেকে শিবপুর ফেরার সাথে মনে মনে একটা তুলনা করেও ঐ মানুষগুলোকে কুর্নিশ করলাম মনে মনে। এদিকে পথ তো দেখি শেষ আর হয় না। দেখতে দেখতে বাস আবার খালি হয়ে গেল। বাইরে নিকষ কালো। নির্জন পথে, অন্ধকার রাতে আমরাই মনে হয় একমাত্র যাত্রী। বরকে ২বার ঠেলা দিলাম 'কন্ডাক্টর- দাকে গিয়ে একবার ভাল করে বল না, আমরা ভ্রমণার্থী'। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দিল - "বলার কি আছে, এস টি বাস স্ট্যান্ড এলে আমাদের ঠিক নামিয়ে দেবে।" আবার চুপচাপ বসে। এবার সত্যি বাস ফাঁকা । বরের উপর আর ভরসা করা যায় না। নিজেই দৌড়লাম পরিচালকের দিকে।

- "দাদা, আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে, হোটেল ভাড়াও করা নেই, একটু ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবেন?'

গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করে বললেন - "তা আগে বলতে হয় তো মামনি। আমরা তো বাজার এলাকা ফেলে এলাম, ওখানেই সব হোটেল পাওয়া যায়। যাকগে বাস স্ট্যান্ড-এ নেমে হোটেল না পেলে অটো ধরে বাজার চলে যেও বরং।"

ঘড়িতে ৮-১০। নামলাম শ্রীবর্ধন শহরের শেষ প্রান্তে। দূরে একটা টিমটিম আলো জ্বলছে, মনে হয় রাতের আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে। ঠিক-ই বুঝেছি বাবা, এই তো দিব্য মাথার উপরে লেখা 'সুবিধা লজ'। কর্তার এতক্ষণের পাংশু মুখটা আলোতে ভরে উঠলো। আমিও লাজুক হাসলাম, সেই শুভদৃষ্টির মত করে। যাই হোক এভারেষ্ট বিজয়ী-র মত আমরা এগোলাম সুবিধা লজের দিকে। ভদ্রলোক লাল চোখ তুলে জিগালেন "ফোন করবেন বুঝি?" ঘাবড়ে গিয়ে বলি, "না তো, থাকব বলেই এসেছি, থাকা যাবে না?" এমন করে তাকালেন, যেন সুবিধা লজের মালিক এমন অসুবিধার কথা জীবনে শোনেনি। তারপর হঠাৎ করেই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন "ও মা, কেন পাওয়া যাবে না? এটা ত থাকারই হোটেল। এই তো এই ঘরটা দেখে নিন। তা গরম জল লাগবে তো আপনাদের?"

আমরাও বিনয়ের অবতার – "ঘর আর দেখার কি আছে, আপনি ভালো বলছেন, এই যথেষ্ট। তা গরম জল কি এখন পাওয়া যাবে?"

- "না, কাল সকালে পাওয়া যাবে। কখন লাগবে বলে দিন?"

- "ঠিক আছে, তাহলে সকাল ৭টা নাগাদ?"

- "সকাল ৭টায় তো আমি উঠি না ঘুম থেকে, আমি বরং ৮টা নাগাদ দিয়ে যাব।"

তাই সই বাবা। এখন কিছু খেয়ে নিয়ে ঘুমোতে পারলে হয়। আর যাই হোক, এই অবেলায় বাইরে খাবার খুঁজতে যাওয়ার আহাম্মকি করার তেমন মানে নেই। নিজেদের ব্যাগের বোঝাই হাল্কা করা যাক বরং। তা ঘরটা নিতান্ত ভালো। তবে বিছানা টা বদলে দেওয়ার তেমন কোন চেষ্টা দেখলাম না। তা না দিক, আমার ঝুলি থেকে চাদর বের করে নিজেই বিছিয়ে নিলাম। দিব্য লাগছে এখন। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ। বহুকাল বাদে কোন হোটেলে এরকম লোহার কড়া দেখছি। তৃপ্ত মুখে দরজা খুলে দেখলাম পানীয় জল এনেছেন ভদ্রলোক। মোলায়েম গলায় বললেন "আপনাদের আর কোন দরকার নেই তো, আমি তাহলে দরজা টা তালাবন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছি।"

- "দরজা বন্ধ করবেন, কিন্তু কেন?"

- "আরে আপনাদের ঘর থেকে বেরিয়েই তো আমার অফিস-ঘর, আমি ত রোজই বাইরের বারান্দা টায় তালা দিয়ে যাই। পাসেই আমার বাড়ি। কোন চিন্তা নেই।"

চিন্তা করার অবসর-ই বা আমাদের কোথায়। আমরা পাড়ি জমালাম ঘুমের দেশে।

রবীন্দ্রনাথের দাড়ি এবং...

কৌশিক মজুমদার

আগস্ট ৩১, ২০১৩

ছোটবেলা থেকে আমরা যাই শিখি বা না-শিখি কেন, লজিকের একটি সূত্র সব্বাই মুখস্থ ক'রে রাখি। কি? না, রবীন্দ্রনাথের দাড়ি আছে, আবার রামছাগলেরও দাড়ি আছে। অতএব লজিক্যালি নাকি রবীন্দ্রনাথ রামছাগল ছিলেন। আবার দেখুন, পাড়ার উঠতি কবি, হঠাৎ ল্যাং খাওয়া প্রেমিক কিংবা নিদেনপক্ষে বেকার ছোকরা একগাল দাড়ি রাখলে একটা প্রশ্ন বাতাসে আসবেই – "কি রে? রবীন্দ্রনাথের মত দাড়ি রেখেছিস কেন?" ভেবে দেখুন, রবীন্দ্রনাথ ভাবতেই চোখ, মুখ, নাক, কান বাদ দিয়ে চোখের সামনে এক ঢাল সাদা ঢেউ খেলানো দাড়ির ছবিই ভেসে ওঠে। আর্টের ভাষায় বলতে গেলে, কবিগুরু যেন দাড়িকে স্টাইলাইজ করেছেন – যেমন জিরাফ তার লম্বা গলাকে, জেব্রা তার সাদা কালো ডোরাকে কিংবা গণ্ডার তার নাকের খড়্গকে। আমাদের চিন্তা চেতনায়, মন ও মননে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর দাড়ি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আগে কোনদিনও ভাবিনি, কিন্তু এই লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দাড়ি বিষয়ে অধিক চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ইতিহাস ঘেঁটে যা পেলাম তাতে দেখি প্রাচীন কালে দাড়ির দারুণ যত্ন করত মিশরীয়রা। চিবুক থেকে নেমে আসা ছুঁচলো দাড়িতে হেনা মাখিয়ে লাল করা, সোনার সুতো দিয়ে দাড়ি সেলাই, কিছুই বাদ রাখত না। এমন কি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৫৮০ অব্দ পর্যন্ত মিশরের রানীরাও চিবুকে সোনার তৈরী নকল দাড়ি (বা Postiche) বেঁধে ঘুরতেন। সুদূর মেসোপটেমিয়ার মেসোরাও নাকি দাড়ির ভয়ানক যত্ন করতেন। রীতিমত তেল মাখিয়ে, লোহার তৈরী Curling Iron দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে সে দাড়ি বানানো হ'ত। পারসিকরা ছিলেন দাড়ির সুরসিক। লম্বা লম্বা দাড়িকে তাঁরা চরমতম ফ্যাশন বানিয়ে ফেলেছিলেন। শুনেছি তাঁদের দাড়ি নিয়ে নাকি শায়েরী রচনা হ'ত। দরকার মত গুটিয়ে মাথার পাগড়ীও বানানো যেত সেই দাড়িতে। সত্যি মিথ্যে জানি নে, একবার নাকি পারস্যের রাজা তাঁর সেনাপতিকে কোতল করার আদেশ দেন। কাটা মাথা তাঁর সামনে নিয়ে আসা হ'লে তিনি বিহ্বল দৃষ্টি চেয়ে বলেন "লোকটার এত সুন্দর দাড়ি, আর তাকেই কিনা আমি কোতল করলাম!" বুঝুন অবস্থা। পারসিক যোদ্ধারা নাকি নানা সোনাদানা দিয়ে তাঁদের দাড়ি সাজাতেন। প্রাচীন ভারতেও ঋষি-মুনিরা দাড়ির একটা ট্রাডিশান করে গেছিলেন। তখন নাকি পরকীয়া করতে গিয়ে ধরা পড়লে 'পাবলিক্‌লি' তার দাড়ি কেটে নেওয়া হ'ত। দাড়ির এত মহান মর্যাদা ছিল, যে ধারে কর্জে ব্যক্তি দাড়ি বিক্রি বা বন্ধকও রাখতে পারতেন। এমন কি প্রাচীন গ্রীসেও পুরুষত্বের প্রতীক হিসেবে দাড়িকে গণ্য করা হত। দাড়িহীন পুরুষ ছিল গ্রীকদের চোখে হিজড়ার সামিল। সত্যি বলতে কি এই 'জিলেট' কোম্পানির আজকে বাড়বাড়ন্তের পিছনে আছেন ম্যাসিডনের আলকেজাণ্ডার দ্য গ্রেট। তিনি নিজে তো 'ক্লিন শেভড্' ছিলেনই, তিনি তাঁর যোদ্ধাদের ও দাড়ি গোঁফ কামানো অপরিহার্য করে দেন। তাঁর ভয় ছিল দাড়ি ধ'রে টেনে যদি শত্রুপক্ষ যোদ্ধাদের কাবু করে! স্বয়ং অ্যারিস্টটলও 'ইম্প্রেস্‌ড' হয়ে দাড়ি কামিয়ে ফেলেন (আর তাই বোধহয় তিনিই প্রাচীনকালের একমাত্র দাড়ি গোঁফহীন দার্শনিক)। এত জায়গায় কথা হ'ল তো

রোমই বা বাদ যায় কেন? প্রাচীন রোমে নাকি নাপিত ছিল না (এমন কি সেই নাপিতও না যে তাদেরই দাড়ি কাটে যারা নিজেদের দাড়ি নিজেরা কাটে না। তবে নাপিতের দাড়ি কে কাটে?) ২৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট টিসিনিয়াস নাকি এক নাপিতকে ভাড়া করে নিয়ে আসেন। সিপিও আফ্রিকানাস নামে এক রোমান প্রথম নিজের দাড়ি কামায়! এত জনপ্রিয় হয় সে ফ্যাশান, যে খুব দ্রুত প্রায় গোটা রোমান সাম্রাজ্যই দাড়ি কামিয়ে ফেলে। আস্তে আস্তে রাজারাজরারা প্রথমবার দাড়ি কামানোটাকে একটা উৎসবের পর্যায়ে নিয়ে যান। সম্রাট অগাস্টাস চব্বিশে, নিরো কুড়িতে নিজের দাড়িকর্তন উৎসব করেন। নিরো আবার সেই দাড়ি মুক্তোখচিত স্বর্ণবাক্সে রেখেও দেন। গোটা মধ্যযুগে নাইটদের সাহস ও পরুষত্বের প্রতীক ছিল দাড়ি। অর্থাৎ দাড়ি কালচার আবার ফিরে আসে। ইতিহাসে লেখা আছে, সে সময় কারও দাড়িতে হাত দেওয়া ছিল "শখত্ বেইজ্জতি" এবং তাতে ডুয়েল লড়াইতে প্রাণ-নাশের সম্ভাবনাও থাকত।

খ্রীষ্টিয় ১৫শতকে ইউরোপে দাড়ি কালচার উঠে গেলেও তা আবার প্রবল ভাবে ফিরে আসে ১৬শতকে। জন নক্স, বিশপ গার্ডিনারদের প্রায় আজানুলম্বিত শশ্রুই তার প্রমাণ। দাড়ি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। স্পেনীয়দের কোদালে দাড়ি, ইংরেজদের চৌকো-কাটিং দাড়ি। দু-ভাগে ভাগ দাড়ি, ছুঁচলো দাড়ি – দাড়ির সে কি বৈচিত্র্য। ১৭দশকে অবশ্য একটু বিশিষ্টজনরা বাদ দিয়ে বাকিরা দাড়ি রাখতেন না। রাশিয়ার পিটার দ্য গ্রেট তো ১৭০৫ সালে দাড়ির উপর রীতিমত কর ধার্য করেন! আবার মজা দেখুন উনবিংশ শতাব্দীতেই সমাজের মাথারা মাথায় চুল রাখলেও মুখে দাড়ি রাখতে রাজি হলেন না। যদিও মাত্র পঞ্চাশ বছরে, ১৮৫০ নাগাদ আবার 'ট্রেণ্ড' বদলাল। দাড়ি আবার স্বমহিমায় ফিরে এল। বেঞ্জামিন ডিসরেলি, চার্লস ডিকেন্স, কার্ল মার্ক্স দাড়ির জয়জয়কার শুরু করলেন। আমেরিকাতেও গৃহযুদ্ধ পরবর্তীযুগে আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন আমেরিকার প্রথম দাড়িওয়ালা রাষ্ট্রপতি।

এবার বাংলায় ফিরে আসি। রাজা রামমোহনের দাড়ি না থাকলেও মোটা গোঁফ ছিল। তবে দাড়ির আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতেন রেঁনেসাঁস বাংলার আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুররা। এরই তো পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের রবি ঠাকুর। ছোটবেলায় বিলেতযাত্রা কালে বেশ ক্লীন শেভড্ই ছিলেন। বাল্মীকি প্রতিভায় গালে হাল্কা দাড়ি। বিয়ের ঠিক পরপর গোঁফ আছে, দাড়ি নেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পর তাঁর সেই দাড়িগোঁফবিহীন মুখই বা ক'জন দেখেছি? মোটামুটি ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুকুমার রায়ের তোলা ছবিতেই কবির মুখে চাপ দাড়ির আভাস। সে দাড়ি আর ছোট হয়নি, বেড়েই চলেছে। তার সাথে বেড়েছে তাঁর দাড়ি নিয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনা। দাড়ি না থাকলে রবীন্দ্রনাথ আদপে রবীন্দ্রনাথ হতেন কিনা অথবা নোবলেতলাতেও যেতেন কি না, তা নিয়ে শিব্রাম চক্কোত্তি গল্প লিখেছেন। ঠিক তেমনই দাড়ি থাকলেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় কিনা তা ও তর্কাতীত নয়। আসলে গুরুপূজায় নির্ভর আমরা 'হিরোর' পুরোটা না ধরতে পারলেও যতটা সাধ্য ততটাই করি। যদি তাঁর একটু কাছে যাওয়া যায়। একটু নেওয়া যায় সেই অমৃতের রস। তাই টিকি, জুলপি, দাড়ি কোন কিছুকেই বাদ দিই না। অন্ধের হস্তি দর্শনের মত দাড়ির প্রতীকেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। বেঁচে থাকলে তিনি হয়ত এই সময়ে একটু অন্যভাবে গান বাঁধতেন, "দাড়ি-য়ে আছ তুমি আমার মনের এপারে..."

প্রচ্ছদ ও সাজসজ্জা
শাক্যমুনি

বিশেষ ধন্যবাদ
শর্মিলা ব্যানার্জি
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ধন্যবাদ
অতনু
সঞ্জিত
হস্তিমূর্খ

ভাবনা ও সম্পাদনা
প্রত্যয়

এই অব্যবসায়িক প্রচেষ্টাটি কে সহযোগিতা করতে এখানে ক্লিক করুন

all rights reserved © www.chorjapod.com